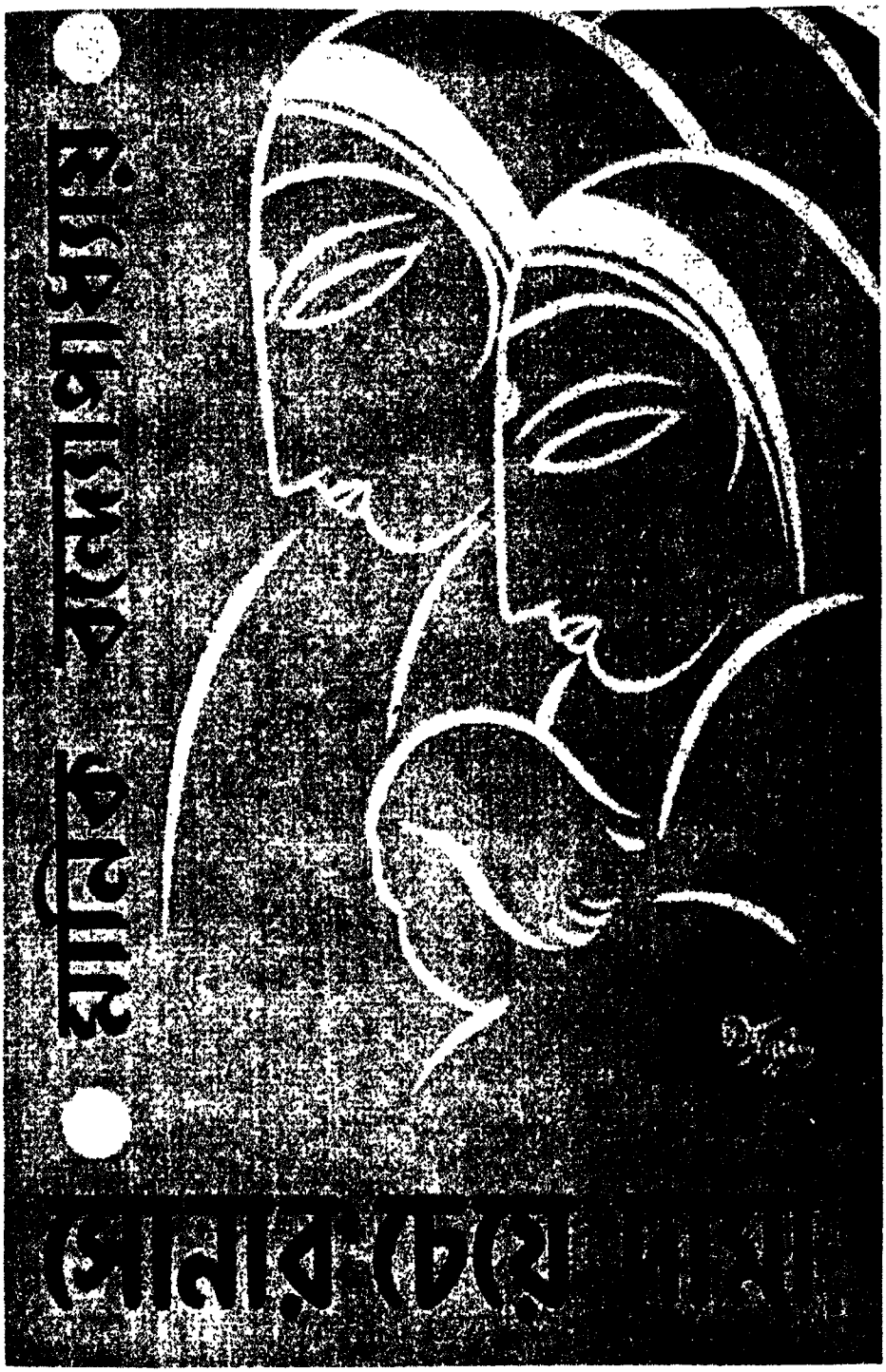

সোনার চেয়ে দামি প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

বেকার

১

মাসখানেক গলাটা খালি সাধনার।

সোনার হারটি একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। এখানে ওখানে ছিঁড়ে যেতে আরম্ভ করার পরেও টিপিটুপে নিয়ে আর সুতো দিয়ে বেঁধে কিছুকাল গলায় লটকানো গিয়েছিল। তা ওভাবে জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহার করাও অসম্ভব হয়ে যাওয়ায় এখন বাধ্য হয়ে বাক্সে তুলে রাখতে হয়েছে।

ও হার আর গলায় ঝুলানোর মানে হয় না।

পরতে গেলেই ছিঁড়ে যাচ্ছে। হয় সুতোর বাঁধন নয় জোড়ের কোনো মুখ। হারটা শেষে কোথায় গিয়ে হারিয়ে যাবে জন্মের মতো। তার চেয়ে বাক্সে তোলা থাকাই ভালো।

দিনরাত্রি কাটছে একেবারে শূন্য গলায়। ওই যে কথায় বলে গলায় দড়িও জোটে না সেই রকম যেন অবস্থা। সাধনা অবশ্য গলায় দড়ির কথা ভাবেও না, মুখে বলেও না। অত সস্তা মেয়ে সে নয়। কিন্তু অসুবিধাটা সত্যই সে বোধ করেছে নিদারুণভাবে। সর্বদাই কেমন একটা বিশ্রী বেআব্রু ভাব।

রাত্রে অবশ্য কেউ দেখতে আসে না গলায় তার সোনার আবরণের প্রতীক ওই আভরণটি আছে কি নাই। রাখালের কাছে তার কোনোরকম আব্রু দরকার হয় না এটাও ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ রাত্রির শুরু রাত সাড়ে দশটা এগারোটার পর। ভোর থেকে আত্মীয়বন্ধু পাড়াপড়শি সবার সামনে শূন্য গলায় বার হতে হয়—এই একটানা অস্বস্তিটাই কাবু করেছে সাধনাকে।

সবাই যেন বিশেষ করে বিশেষ দৃষ্টিতে তার গলার দিকেই তাকায় আজকাল।

মুখে কিছু বলে না অনেকেই। কিন্তু মুখের ভাব দেখে বেশ বোঝা যায় মনে মনে তারা আঁচ করে নিয়েছে ব্যাপারটা কী।

বিশেষত সবাই যখন জানে যে রাখাল আজ অনেকদিন বেকার, ছাঁটাই হবার পর এখন পর্যন্ত আর সে কাজ জোটাতে পারেনি।

রাখাল অনেকদিন বেকার আর সাধনার গলাটা একদম খালি। দুটি সহজ সত্যের যোগ করে দিলেই কি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে না অভ্রান্ত ?

সকলের অনুমান যদি সত্য হত, যদি সত্যই বেচে দেওয়া হয়ে থাকত হারটা, এতটা খারাপ লাগত না সাধনার। এ যে একেবারে মিথ্যা অনুমান ! স্বামীর বেকারত্ব তার হারটি গ্রাস করেনি, জলজ্যান্ত জিনিসটা বাক্সে তোলা আছে তবু এ রকম অন্যায় কথা সকলে ভাববে কেন ?

এটাই বড়ো প্রাণে লাগে।

নন্দিতার মতো যারা একনজর তাকিয়েই বলে, এ কী, গলা খালি যে ?

তারা বাঁচিয়ে দেন সাধনাকে।

বলা যায়, আর বলিস কেন ভাই !

গয়নাটার কী হয়েছে শোনানো যায়। শহরের নামকরা মস্ত জুয়েলারি দোকান একগাদা মজুরি নিয়ে কী ছাইয়ের গয়নাই গড়িয়ে দিয়েছিল, তিনটা বছর টিকল না ?

কী দশা হয়েছে দ্যাখ।

বলে, জিনিসটা বার করে দেখানোও যায়। প্রত্যক্ষ অকাট্য প্রমাণ যে স্বামী বেকার বটে তবু হারটা তার বজায় আছে।

কিন্তু সবাই তো এ রকম সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে না।

শোভার মা বারবার গলার দিকে তাকায় কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলে না।

অতিষ্ঠ হয়ে যেচে তাকে গয়নাটা বার করে শোভার মার হাতে দিয়ে বলতে হয়, মাসিমা, দেখুন তো কী জন্য এমন হল ? এত নামকরা দোকানের জিনিস এমনভাবে খসে খসে গেল কেন ? প্যাটার্নটার জন্যে না সোনাই খারাপ?

বেলা আসে। ছেলেবেলার বন্ধু বেলা। গলার দিকে চেয়ে বলে, পাঁচটা টাকা চাইব ভেবেছিলাম। তা বুঝতেই পারছি তোকে কে দেয় ঠিক নেই।

সাধনা ম্লান হেসে বলে, এ আর বোঝা কঠিন কী ?

সাধনা অপেক্ষা করে। বেলা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে কীভাবে কেন হারটা গেল কী বৃত্তান্ত। ভদ্রতা বাঁচিয়ে কথাটা এড়িয়ে যাবার সম্পর্ক তার সঙ্গে বেলার নয়।

কিন্তু বেলাও এড়িয়ে যেতে চায় কথাটা !

অগত্যা তাকেই যেচে বলতে হয়, গলার হারটা—

বেলা সঙ্গে সঙ্গে বলে, থাক না ভাই, শুনতে চাই না। আমি জানি।

শোন না কথাটা।

না না, আমি শুনব না। জানা কথা আবার শুনব কী ? তোকে বলতে হবে না।

একটা পরামর্শ চাইছি।

পরামর্শ ?

সাধনা হারটা বার করে। বলে, মেরামত করব, না নতুন করে গড়াব ? কোথায় দেব বল তো ? ওই বড়ো দোকানেই দেব, না সাধারণ স্যাকরার কাছে দেব ? বড়ো দোকানে সত্যি আর আমার বিশ্বাস নেই।

বেলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, হারটা তবে বেচিসনি !

সাধনাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, না।

কিন্তু এ ভাবে মুখ রাখা যায় কতজনের কাছে ? যেচে যেচে কতজনকে কৈফিয়ত দেওয়া যায় ? তার কি আর কাজ নেই, ঝঞ্ঝাট নেই, দুর্ভাবনা নেই ! এর চেয়ে একটা কাগজে লিখে গায়ে এঁটে রাখাই সোজা—গয়না আমার বিক্রি হয়নি গো, তোমরা যা ভাবছ সত্যি নয় !

কিন্তু কেন এই অস্বস্তি ? এই লজ্জাবোধ ? এত তার খারাপ লাগবে কেন ? এ কথাও সাধনা ভাবে।

গুণহীন অপদার্থ মানুষ তো রাখাল নয়। নিজের খেয়ালখুশিতে সে তো বেকারত্ব বরণ করে ঘরে বসে নেই। বাপের জমিদারি বা নিজের যথাসর্বস্ব বদখেয়ালে উড়িয়ে দিয়ে সে তো এই দুরবস্থা ডেকে আনেনি। খাটতে সে অরাজি নয়। যেমন প্রাণপণে খেটে কলেজে সে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল তেমনি মন দিয়ে প্রাণপণে খেটে সে করে যাচ্ছিল অফিসের কাজ। বিনা দোষে ছাঁটাই হওয়ার জন্য সে তো দায়ি হতে পারে না। অলস হয়ে সে বসেও নেই। কাজের খোঁজে ঘোরাটাই তার দাঁড়িয়ে গেছে প্রাণান্তকর খাটুনিতে, সেই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া তিনটে টিউশনি। এত চেষ্টা করেও কাজ না পেয়ে হারটা যদি নিরুপায় হয়ে বেচেই দিয়ে থাকে রাখাল, দশজন কী ভাবছে ভেবে তার এত খারাপ লাগার কী আছে ?

আজ তো সকলেরই এ রকম দুরবস্থা। নিছক পেটের জন্য আর একবার উলঙ্গ হওয়া ঠেকাবার জন্য কত লোকে শেষ সম্বলটুকুও বেচে দিচ্ছে। তারাও নয় সেই দলে ভিড়েছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক।

হারটা এখনও অভাবের গ্রাসে যায়নি। কিন্তু গেলেও খাপছাড়া ব্যাপার হত না কিছুই। দশজনে যদি ধরেই নেয় যে তাই ঘটেছে, সে কেন এত বিচলিত হয় ?

যা খুশি ভাবুক না দশজনে !

কিন্তু এত ভেবেও মনে জোর পায় না কিছুতেই। কোনোমতেই সে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারে না যে দশজনে মিথ্যা করে তার স্বামীকে তার গলার হারটা বেচে দেবার অপরাধে অপরাধী ভাবছে।

কোথায় যেন বড়ো একটা ফাঁকি রয়ে গেছে জীবনে। শাড়ি গয়না দিয়ে দশজনের কাছে বড়োলোক সাজবে, স্বামী-সোহাগিনি সাজবে—এ চিন্তাটাও আজ হাস্যকর হয়ে গেছে। সকলের সঙ্গে অতল ফাঁকিতে হাবুডুবু খেতে খেতে এ সব ছেলেমানুষি ফাঁকির খেলায় আর মন মজে না, সারা গায়ে গয়না চাপানো বাসন্তীকে দেখলে শুধু হাসি পায় না, গাও যেন ঘিনঘিন করে। অথচ রাখাল তার গলা খালি করে হারটা বেচে দিয়েছে—দশজনের এই ভুল ধারণাটা অসহ্য ঠেকছে তার। খালি গলার দিকে মানুষ নজর দিলে বিশ্রী লাগার সীমা থাকছে না।

হাতে শুধু শাঁখা পরে ভোলার মা পাঁচ বছরের ছেলেকে সাথে নিয়ে ডিম বেচতে আসে, সে নজর দিলে পর্যন্ত !

একতলাটা দুভাগ করা। ও পাশের ভাগটা সম্পূর্ণ বাসন্তীদের দখলে। এ পাশে একখানা ঘরে সাধনা থাকে,—অন্যঘর দুখানা আশাদের। তার স্বামী সঞ্জীব ভালো চাকরি করে।

ছোটোখাটো হলেও এ ভাগের যেটা রান্নাঘর, আগে সাধনাই সেখানে রাঁধত। এখন আশাকে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে তাদের ভাড়া কমেছে সাত টাকা।

ভাগের দেয়ালে লাগানো তার ঘর। টিনের চালার কলঘরটার মধ্যে একটু সরু ফাঁক, ঘরে যাতায়াতের জন্য। এই ফাঁকের কোণটা ঢেকে নিয়ে সাধনা রান্না করে। উনানের ধোঁয়া আর রান্নার ঝাঁঝ জানালা দিয়ে ঘরে যায়, বসে রাঁধতে রাঁধতে মনে হয় ঘরের দেয়াল আর কলঘরের দেয়াল বুঝি গায়ে ঠেকছে দুদিক থেকেই।

বাসন্তী এসে বলে, কী রাঁধছেন ভাই। লাউখোসার ছেঁচকি ? আঃ, কী সুন্দর যে লাগে ! আমি কখনও ফেলি নে। চিংড়ি দিয়ে মুগডাল ভেজে লাউ রাঁধি, তার চেয়ে ভালো লাগে খোসার ছেঁচকি !

সাধনার চেয়ে দু-চারবছর বেশিই হবে বয়স। একটু বেঁটে, সর্বাঙ্গ পুষ্ট ও স্পষ্ট। সেই সর্বাঙ্গে যেখানে আঁটা সম্ভব সেখানেই গয়না।

বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে বিড়ির পাতা আর তামাকের ছোটোখাটো ব্যাবসা করে বউকে এত গয়না দিয়েছে রাজীব।

তাও সে বউ রোজ কোমর বেঁধে ঝগড়া করে ! প্রত্যেক দিন বাসন্তীর গলা দু-একবার তীক্ষ্ণ উঁচুপর্দায় চড়ে যায়, কলহের ধারালো কথাগুলি এ পাশ থেকেও শোনা যায় স্পষ্ট।

এত গয়না গায়ে দিয়ে নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে দেয়ালের ও পাশ থেকে ঘুরে তার সঙ্গে কথা কইতে [illegible]। রাখাল বেকার. সাধনার গলা শূন্য, তবু যেন তার ভাবনা নেই যে ভাব করতে গেলে সাধনা পাছে কিছু চেয়ে বসে।

এক অংশে বাস করেও আশা কিন্তু তাদের এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলে আশ্চর্য কৌশলে। সঞ্জীবও।

মানুষটা আশা যে বাক্‌সংযমী তা [illegible]। রাখালের চেয়েও বড়ো রকমের বেকার ঘরছাড়া দেশছাড়া একটা মানুষের বউ ভোলার মা ডিম বেচতে এলে সে একজোড়া ডিম কিনে দশজোড়া কথা জিজ্ঞেস করে। মানুষ এত নিরুপায় হয়েও টিকে থাকতে পারে ধারণা করা কঠিন, তাই বোধ হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে তার ভালো লাগে। সমানভাবে কথা কইতে হয় না, আলাপ করলে টাকা-পয়সা ধার চেয়ে বসবে এ ভয়ও নেই। শুধু ডিমের দামটা দিলেই চলে। বাসি বাড়তি রুটি থাকলে একখানা একটু চিনি দিয়ে ভোলার হাতে দিলে তো কথাই নেই।

পুরানো ছেঁড়া আর ময়লা হোক, ভোলার মার পরনের কাপড়খানা তাঁতের এবং রঙিন। নতুন হলে আশাও নিশ্চয় পরতে আপত্তি করত না। এই কাপড়খানাই সব সময় ভোলার মার পরনে দেখা যায়। সরকারদের মস্ত বাগানটার প্রাচীরের পাশ দিয়ে তফাতে ফাঁকা জমিতে হোগলার যে খেলাঘরগুলি উঠেছে, তারই একটাতে তারা থাকে। বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে একটি। ওই হতভাগিই এখন নাকি সবার বড়ো দুর্ভাবনা—ভোলার বাপ-মার।

ভোলার মা কাঁদুনি গায় না। দুর্দশার সে স্তর তারা পার হয়ে গেছে। বোধ হয় সেই জন্যই নানা কথা জিজ্ঞাসা করার পরেও দাম দেবার সময় আশা যখন অনায়াসে বলে, তোমার ডিমের দাম বেশি ভোলার মা !

তখন ভোলার মা রাগও করে না, নিজের দুরদৃষ্টিকে শাপও দেয় না, সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় বলে, কী কথা কন ? এক পয়সা বেশি না ! বাজার দরে বেচি। উনি পাইকারি দরে কিনা আনেন, খুচরা দরে বেচনের লাভটুকু থাকে।

সাধনাকে সে জিজ্ঞাসা করে, আপনে নিবেন না ?

সাধনা মাথা নাড়ে।

তার গলার দিকে চেয়েই যেন ভোলার মাও মাথা হেলিয়ে তার ডিম কেনার অক্ষমতায় সায় দেয়, না কেনাকে সমর্থন করে !

গলার কাছটা শিরশির করে সাধনার। বিছাহারের শূন্যতা যেন বিছার মতো হাঁটছে।

রাখাল পাড়ার একটি স্কুলের ছাত্রকে সকালে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত পড়ায়। পড়িয়ে সটান চলে যায় মাইলখানেক দূরে আরেকটি কলেজের ছাত্রকে পড়াতে।

বাড়ি ফিরে নেয়ে খেয়ে বার হয়। সারাদিন ঘোরে চাকরি এবং রোজগারের চেষ্টায়—আরও কীসের ধান্ধায় সাধনা জানে না। সন্ধ্যায় রাখাল একটি ছাত্রীকে পড়ায়—দুঘণ্টা। এই টিশনিটাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মাসান্তে কটা টাকা পাওয়া যায় বলেই নয়, রোজ এখানে সে চা আর কিছু খাবার পায়—অন্তত দুখানা বিস্কুট।

আশ্চর্য যোগাযোগ ! সারাদিনের শ্রান্তি বয়ে নিয়ে গিয়ে শুধু ওই চা খাবারটুকু পেয়ে সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে, প্রভাকে ভালো করে পড়াতে পারে বলে প্রভারাও খুশি হয়ে তাকে রোজ চা-জলখাবার দেয়।

যেদিন বাসে ফেরে রাত প্রায় সাড়ে নটা হয়। হেঁটে ফিরলে দশটা বেজে যায়।

হেঁটে ফিরলে সাধনা বলে, ছটা পয়সা বাঁচালে। দেহের ক্ষয়টা হিসাব করেছ ? যে রোগটা হবে দুশো টাকায় সারাতে পারবে ?

রাখাল মুখ বাঁকায়।—রোগ হলে আর সারাবে কে ? জ্যোৎস্নারাত, বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম। ছ পয়সায় সিগারেট কিনলাম তিনটে।

সাধনা চুপ করে থাকে। গা যখন জ্বলে যায় তখন কথা কওয়া মানেই ঝগড়া করা। তিনটে সিগারেট কিনতে হবে, তার অজুহাত হল জ্যোৎস্নারাত। সিগারেট কেনার দায়ে রাখাল হেঁটে আসে নি, জ্যোৎস্নারাত দেখে শ্রান্তক্লান্ত অভুক্ত দেহটাকে মনের আনন্দে দু মাইল পথ হাঁটিয়েছে।

খেয়ে উঠে সাধনা মাই দিয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়ায়। বড়ো হয়েছে, দস্যুর মতো আধ-শুকনো মাই টানে ছেলেটা, বহুক্ষণ মাই দুটি তার টনটনিয়ে থাকে। পোয়াটেক গোরুর দুধ না বাড়ালে আর চলে না।

হঠাৎ তাই সখেদে বলে, হারটার ব্যবস্থা করবে না ? খালি গলায় থাকতে পারব না আমি। নতুন তো চাইছি না, সে আশা ছেড়ে দিয়েছি। সোনা আছে, শুধু মজুরি দিয়ে গড়িয়ে দেবে, তাও জুটবে না কপালে ? দশজনের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারি না !

রাখাল কথা বলে না। গা যখন জ্বলে যায় তখন কথা কওয়া মানেই ঝগড়া করা। তিনটে সিগারেটের একটি আধখানা টেনে নিভিয়ে রেখেছিল, সকালে খাবে। সেটা নিয়ে রাখাল ধরায়। ঘুম আসছে। ঘুমোলেই একেবারে সকাল। তবু মনে হয় সকালের এখনও অনেক দেরি।

মাঝে মাঝে অসহ্য ঠেকলেও দু-চারজনের কাছে যেচে যেচে কৈফিয়ত দিয়ে আর হারটা যে তার বজায় আছে তার প্রমাণ দেখিয়েই সাধনা দিন কাটিয়ে দিত।

মুশকিল হল হঠাৎ রেবার বিয়েটা ঠিক হয়ে যাওয়ায়।

রেবা রাখালের দিদি অণিমার বড়ো মেয়ে।

বিকালে রেবার বাবা প্রিয়তোষ স্ত্রী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে খবরটা দিতে এবং নিমন্ত্রণ জানাতে আসে।

আচমকা সব ঠিক হয়ে গেছে, আগে থেকে কিছুই জানতে পারেনি, কদিন বাদেই বিয়ে—এত অল্প সময়ের নোটিশে মেয়ের মামা-মামিকে একেবারে বিয়ের নেমন্তন্ন করতে আসার অপরাধটা প্রিয়তোষ যেন কিছুতেই হজম করতে পারছে না। বারবার সে বলে যে আগের দিন না পারলেও বিয়ের দিন সকালবেলাই তাদের যাওয়া চাই, না গেলে চলবে না। তারা তিন ভাই, ভিন্ন হলেও তিন ভায়ের ছেলেমেয়ের মধ্যে এই প্রথম বিয়ে হচ্ছে তার মেয়ের—মেয়ের মামা-মামি না গেলে দশজনের কাছে তারা মুখ দেখাতে পারবে না।

অণিমা বলে, তোমরা না গেলে আমারও কিন্তু মাথা কাটা যাবে ভাই। শুধু রাখালকে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি যেন আবার নিয়ম রক্ষা কোরো না !

অণিমা তার খালি গলার দিকে চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে জেনে জোর করে হেসে সাধনা বলে, কী যে বলেন, রেবার বিয়েতে আমি যাব না ?

পরিতোষ বলে, আমরা বরং একটু বসি। রাখালকে নিজে বলে যাব। ও আবার যে রকম মানী লোক—

ওর ফিরতে রাত দশটা।

তাহলে অবশ্য মহাবিপদ। রাত দশটা পর্যন্ত বসে থাকা তো সম্ভব নয় প্রিয়তোষের পক্ষে। কাল পরশু আবার যে একবার আসবে তাও অসম্ভব। হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়েছে, কতদিকে যে ঝামেলা—

সাধনা হেসে তাকে অভয় দিয়ে বলে, আমায় তো বলে গেলেন, তাতেই হবে।

তার খালি গলার দিকে বিশেষভাবে চেয়ে থেকে প্রিয়তোষ যেন সংশয়ভাবে বলে, হবে তো ? না মরি বাঁচি যে করে পারি—

না না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ওর দেখা পাওয়া মুশকিলের কথা। এমনিই ছুটোছুটির অন্ত নেই, তার ওপর আরেক কাজ জুটল, আমার বিয়ের হারটা ছিঁড়ে পড়ে আছে, দু দিনের মধ্যে সারিয়ে এনে দিতে হবে। আজ করি কাল করি করে অ্যাদ্দিন করেনি, বাক্সে ফেলে রেখেছি হারটা। এবার তো আর গড়িমসি করলে চলবে না। মামি তো আর খালি গলায় হাজির হতে পারবে না প্রথম ভাগনির বিয়েতে !

অণিমার মুখ থেকে ছায়া সরে যায়। প্রিয়তোষ পরম পরিতুষ্ট হয়ে নস্যি নেয়। সাধনার গলা খালি দেখে সেও সত্যি ভড়কে গিয়েছিল। এতক্ষণে সে সিঙাড়ার কোণ ভেঙ্গে মুখে দেয়, ঠান্ডা চায়ে চুমুক দেয়।

একখণ্ড ফেলনা কাগজে রাখালের নাম নিজে সই করে পাড়ার ছেলে নন্দকে দিয়ে শ্রীভারতী থেকে চা ও সিঙাড়া আনিয়ে সাধনা কোনোমতে এদের কাছে মানমর্যাদা রক্ষা করেছে। দোকানটা কাছে, তিনটি বাড়ির পরে বাসচলা বড়ো রাস্তার ধারে পাড়ার রাস্তার মোড়ে—পাকিস্তান থেকে

গোড়ার দিকে যারা এসেছিল তাদের একজন, নাম শ্রীসীতাপতি সাহা, মোড়ে বাড়ি করেছে এবং জয়েন্ট রেস্টুরেন্ট ও ময়রার দোকান খুলেছে। ঘর একটাই, একপাশে কাঁচওয়ালা আলমারিতে রসগোল্লা পান্তুয়া প্রভৃতি সাজানো অন্যপাশে তিনটে ডেস্ক ও বেঞ্চে বসে খাবার বা চা পানাদির ব্যবস্থা। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট মামলেট ভেজিটেবল চপ পাওয়া যায়, তার বেশি কিছু নয়, মাংসাদি অপ্রাপ্য। অনেকেই সিঙাড়া দিয়ে চা খায়—সারাদিন শ-দুই লোক। প্রথম প্রথম রাখালের সঙ্গে সাধনা সিনেমা দেখতে আসা-যাওয়ার সুবিধার জন্য এই দোকানে চা সিঙাড়া খেত।

সে অনেকদিনের কথা। টাকা ত্রিশেক বাকি পড়েছে। তবু এখনও সাধনা তার স্বামীর নাম-সই-করা কাগজের টুকরো পাঠালে দোকান থেকে খাদ্য আসে।

কারবার ছিল সোনার। দোকান দিয়েছে খাবারের। মেয়েবা স্লিপ পাঠালেই সীতাপতি মুখ বুজে খাবার পাঠায়।

চা খাবার খেয়ে আপনজনেরা বিদায় নেয়।

এদিকে সাধনার মনে হয় মাথায় যেন তার বজ্রাঘাত হয়েছে। এমনি না হয় এক রকম চলে যাচ্ছিল, খালি গলায় সে বিয়ে বাড়িতে যাবে কী করে ? আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে সবাই জড়ো হবে সেখানে, কোন মুখে সে গিয়ে সকলেব সামনে দাঁড়াবে ?

অথচ না গেলেও সে হবে আরেকটা কেলেঙ্কারির ব্যাপার। ওরা নিজে এসে এত করে বলে গেছে, আগেরদিন তারা যদি নিজে থেকে না যায়, পরদিন সকালে নিশ্চয় ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হবে প্রিয়তোষ নিজে কিংবা তার ছেলে কিংবা অন্য কেউ।

না যাবার কোনো অজুহাত নেই।

ক্ষোভে দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে সাধনার। এমনভাবে ভিতরটা জ্বালা করে যে সে নিজেই বুঝতে পারে রাখালের উপর এত রাগ আজ পর্যন্ত কখনও তার হয়নি। রাখাল বাড়ি থাকলে আজ এখন বীভৎস কলহ হয়ে যেত। অন্ধ বিদ্বেষে অবুঝের মতোই আঘাত হানত সাধনা।

রাত দশটা পর্যন্ত সময় পাওয়ায় এই মারাত্মক আক্রোশটা তার খানিক জুড়িয়ে আসে। ক্রমে ক্রমে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে সে নিজেই বুঝতে পারে যে এ রকম মবিয়া হয়ে শুধু ঘা দেবাব জন্য আঘাত করার কোনো মানে হয় না। সে রকম সাধ থাকলে এতদিনে রাখালকে সে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারত—নিজেও সেই সঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়ে।

কিন্তু ক্ষোভ যাবার নয়। রেবার বিয়েতে যাওয়া না যাওয়ার সমস্যা মিটে যায়নি।

রাখাল বাড়ি ফেরামাত্র তাকে খরবটা জানিয়েই তিক্তস্বরে না বলে সে পারে না, নতুন কিছু কিনে দেবে সে আশা ত্যাগ করেছি। ভাঙা জিনিসটা শুধু সারিয়ে দেবে, এতদিনে তাও পারলে না, বলে বলে মুখ ব্যথা হয় গেল ! এখন আমি কী উপায় করি ?

আগে যদি তেমন করে বলতে—

সাধনা ঝেঁঝে ওঠে, তেমন করে ? মানুষ আবার কেমন করে বলে ! আমি বলে চুপ করে থাকি, সব সয়ে যাই। অন্য কেউ হলে—

সাধনা অন্য কেউ হলে কী হত তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাখালের নেই, তবে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না। চারিদিকে গাদাগাদি ঘেঁষাঘেঁষি করে তার মতো উপায়হীনদের পাতা সংসার, প্রাণপাত করেও ভাঙন ঠেকানো যাচ্ছে না। মেজাজ আর তিক্ততার অনেক নমুনাই পাওয়া যায়। তার মধ্যে সোনার গয়না নিয়েও দু-চারটা কুৎসিত মর্মান্তিক ঘটনা কী আর ঘটে না।

রাখাল নিশ্বাস ফেলে বলে, জানি, অন্য কেউ হলে আমায় ঝাঁটা মারত। আমিও সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু তাতে আসল ব্যাপারের এতটুকু সুরাহা হত না। তোমার সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি তাই—

তামাশা কোরো না।

তামাশা করিনি। এ রকম সস্তা তামাশা আমি করি ? তুমি জানো ওটা সারানো যাবে না, নতুন করে গড়তে হবে।

তাই তো বলছি আমি। সোনা কিনে নতুন জিনিস গড়িয়ে দিতে বলেছি তোমায় ? শুধু মজুরিটা দিয়ে—

চোখে জল এসে যায় সাধনার। চোখ মুছে বলে, এটুকু অন্তত বুঝবে তো তুমি ? এতটুকু তো তাকাবে আমার দিকে ? কদ্দিন হয়ে গেল খালি গলায় সসংকোচে বেড়াচ্ছি। রেবার বিয়ে এসে গেল, এবার কী উপায় হবে ? শুধু মজুবি দিয়ে জিনিসটা যদি করিয়ে রাখতে, আজ এ বিপদ হত ?

মজুবিও তো সোজা নয়। ওদের দোকানে বেশি মজুরি নেয—পঞ্চাশ টাকার মতো লেগে যাবে। বাজে দোকানে সস্তা হয়, কিন্তু দিতে ভবসা হয না। আমি তাই ভাবছিলাম—

তাই করো তুমি, ভেবেই চলো। আমি এদিকে সং সেজে বিয়ে বাড়ি যাই। অন্য হারটা নিয়েছ মনে আছে ?

মনে আছে ? সাধনা তাকে ঝাঁঝের সঙ্গে নালিশের সুরে জিজ্ঞাসা করছে তার ছোটো হারটি বেচে দেবার কথা রাখালের মনে আছে কিনা—এখনও দু-মাস হয়নি ! বিয়েতে দুটি হার পেয়েছিল সাধনা। চাকরি থেকে আচমকা বেকারত্বে আছড়ে পড়াটা গোড়ার দিকে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলে সাধনাই এক রকম জোর করে তাকে দিয়ে ছোটো হারটি বিক্রি করিয়েছিল। রাখাল নিজেই বরং ইতস্তত করেছিল কয়েকদিন। সাধনা দ্বিধা করেনি। বাড়তি ওই হারটা মানেই যখন কিছু নগদ টাকা, কেন তারা অনর্থক অচল অবস্থায় হিমসিম খাবে, পরদিন কী দিয়ে রেশন আনা বাজার করা হবে ভেবে কূলকিনারা পাবে না ? চাকরি কি আর হবে না রাখালের ? তখন আবার সে তাকে গড়িয়ে দেবে ও রকম একটি সোনার হার। কিছু লোকসান হবে—সোনার কারবারিরা সোনা কেনেও লাভ রেখে বেচেও লাভ রেখে। কিন্তু তার আর উপায় কী !

তখনকার চেয়ে আজ তাদের অবস্থা আবও শোচনীয় হয়েছে, কষ্ট তারা করছে অনেকগুণ বেশি। সেদিন বোধ হয় তারা কল্পনাও কবতে পারত না যে এ রকম অনটন সয়েও জীবন থেকে প্রায় সব কিছুই ছাঁটাই করে দিয়ে আধা উপবাসেও তারা বেঁচে থাকবে। মাসে মাসে চাকরির বাঁধা মাইনে বন্ধ হওয়ামাত্র সবদিক দিয়ে এই চরম কষ্ট যেচে বরণ করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে আবার একটা কিছু জুটে যাবে এই আশাও সেটা সম্ভব করে দেয়নি। সম্ভব হলে তাদেব সামান্য সম্বলটুকু অত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত না।

কিন্তু আজ পর্যন্ত সাধনা সে জন্য কখনও আপশোশ করেনি। যা সম্ভব ছিল না সে জন্য দুঃখ কীসের ? সম্বল খুইয়ে এভাবে একটু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ার বদলে চরম দুর্গতির এই স্তরে একেবারে আছাড় খেয়ে পড়লে হয়তো তারাই শেষ হয়ে যেত ! এখনও তবু তারা টিকে আছে, এখনও লড়াই করছে, এখনও আশা আছে সুদিনের। এটুকু বুঝবার মতো সহজ বুদ্ধি সাধনার আছে।

কিন্তু আজ তার হয়েছে কী ? এমন অবুঝের মতো কথা বলছে কেন ? সাধনা কি জানে না নতুন হার গড়াবার মজুরি দেবার ক্ষমতাও তার নেই ? সারা মাস টুইশনি করে যা পায় অনটন সেটা শুষে নেয় তপ্ত তাওয়ায় জলের ফোঁটার মতো ?

নিছক বেঁচে থাকার জন্য যা না হলে নয় মানুষের সেই প্রয়োজনগুলিও তাদের মেটে না ?

জেনেও আজ এ ভাবে নালিশ জানাচ্ছে, অনুযোগ দিচ্ছে। সেই হারটির কথা তুলে খোঁচা দিতে তার বাধছে না !

সব দিকে সব বিষয়ে এত হিসাব বুদ্ধি বিবেচনা ধৈর্য সাধনার, আজ গয়নার ব্যাপারে সে সম্ভব অসম্ভব ভুলে গেল ?

দুঃখে চোখে জল আসতে পারে। মাঝে মাঝে কাঁদাও দুঃখেরই অঙ্গ। তাতে শুধু ক্ষতি নেই নয়, সেটা ভালোই। কাঁদলে দুঃখের চাপ কমে যায়। সাধনাকে কাঁদতে দেখলে একটা অদ্ভুত অসহ্য কষ্টে সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে যায় রাখালের। কিন্তু তার সহজ বুদ্ধি গুলিয়ে যেতে দেখে কষ্টবোধের সঙ্গে জাগে দারুণ একটা আতঙ্ক।

মনে হয়, সর্বনাশ। তাহলে তো আর বাঁচা যাবে না !

সাধনা যদি ধৈর্য হারায়, অবুঝ হয়ে পড়ে, এ অবস্থায় বাঁচার লড়াই চালাবার সবচেয়ে বড়ো অবলম্বনটাই সে যদি হারায়, দুজনেই তারা শেষ হয়ে যাবে।

ঘুমের মধ্যে খোকা স্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠে। দু বছরের শিশুর স্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠার মধ্যেও কেমন একটা অস্বাভাবিক আর্ত সুর। বিকৃত বিভ্রান্ত নিঃস্ব জীবনের প্রচণ্ড ক্ষোভ আর বিক্ষোভ এতটুকু অবুঝ শিশুর মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভয়ের স্বপ্ন যেন হয়ে দাঁড়ায় আরও বেশি ভয়ংকর কিছু।

ছেলেকে থাপড়ে শান্ত করতে গিয়ে সাধনা নিজেও যেন শান্ত হয়ে যায়। তার স্বাভাবিক হিসেবি সুরে বলে, আমি বলি কী, এটা বেচে দাও। ওই টাকায় কম সোনার তৈরি হার একটা কিনে ফেলি। একটু সরুই নয় হবে।

না।

কেন ? দোষ কী ?

তুমি ভুলে গেছ, আমি ভুলিনি। তোমার ওই হারটা বেচবার সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার গায়ের একরতি সোনা জীবনে কখনও বেচব না।

এতক্ষণে সাধনার মুখে মৃদু একটু হাসি দেখা দেয়। সেই সকালে তেলের অভাবে বেগুন-ভাজার বদলে বেগুন-পোড়া দিয়ে দুটি খুদ মেশানো চালের ভাত খেয়ে উপার্জনের ফিকির খুঁজতে বেরিয়ে রাখাল রাত প্রায় দশটায় বাড়ি ফিরেছে, এটা কি এতক্ষণে তার খেয়াল হয়েছে ? মনে পড়েছে বেকারির খাটুনিতে শ্রান্ত ক্লান্ত আধমরা মানুষটাকে একটু হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করাও দরকার ?

তার হাসি দেখে এই সন্দেহই জাগতে থাকে রাখালের মনে। নিজেকে সে গুটিয়ে নিতে থাকে নিজের মধ্যে। আর সহ্য হয় না। বোমার মতো ফেটে গিয়ে আজ সাধনাকে চরমভাবে বুঝিয়ে দেবে যে তার কাছে এরকম ফাঁকা হাসি আর ন্যাকামির কোনো দাম নেই।

সাধনা শুধু মুখ ফুটে একটা মিষ্টি কথা বলুক ! তাই যথেষ্ট মনে করবে রাখাল।

সাধনা হাসিমুখেই বলে, আমি কিছুই ভুলিনি। গা জ্বলে গিয়েছিল তোমার কথা শুনে।

বোমার মতো ফাটার বদলে রাখাল ঝিমিয়ে যায়—তাই নাকি ! কিছু তো বলোনি !

গা জ্বলে গিয়েছিল বলেই বলিনি। বললে ঝগড়া হত। সেদিন বলিনি, আজ বলছি। হারটা বুঝি বেচেছিলে তুমি ? গয়না আমার, তুমি বেচবে কী রকম ? আমার গয়নারও মালিক নাকি তুমি যে ও রকম প্রতিজ্ঞা কর ? সেবারও আমার গয়না আমি বেচেছিলাম, এবারও আমি বেচব। সেবারের মতো এবারও আমার হয়ে তুমি দোকানে যাবে এইমাত্র।

তাই নাকি !

তা নয় ? তুমি পরামর্শ দিতে পার, বারণ করতে পার, ধমক দিতে পার—একবার কেন, একশোবার ! তুমি জোর করে বললে আমি কি সত্যি সে হারটা বেচতাম, না এটা বেচব ? সে হল আলাদা কথা। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা বললে কিনা। ও রকম প্রতিজ্ঞা তুমি করতেই পার না।

রাখাল আলনায় ঝুলানো জামার পকেট থেকে আধখানা সিগারেট বার করে এনে ধরায়। এই আধখানা সিগারেট তার রাত্রে খাওয়ার পর টানার জন্য বরাদ্দ করা থাকে। তিক্তস্বরে বলে, প্রতিজ্ঞা আমি করতে পারি। তোমার গয়না তুমি বেচবে কি না বেচবে সেটা ভিন্ন কথা। আমার দরকারে মরে গেলেও আমি তোমার গয়না নিয়ে বেচব না, এ প্রতিজ্ঞা আমি করতে পারি।

না, তাও তুমি পার না। দরকার কি তোমার একার ? ফুর্তি করে উড়িয়ে দেবার জন্য মরে গেলেও বউয়ের গয়না নেবে না, তুমি কি এই প্রতিজ্ঞা করার কথা বলছ ? সংসার চালাবার দরকার তোমার যেমন আমারও তেমনি।

সাধনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কার কীসে কতটা দরকার বোঝাবার জন্যই বোধ হয়। এতক্ষণের তর্কবিতর্ক রাগ আর ঝাঁঝালো অভিমান কোথায় উড়ে যায় কে জানে, আতঙ্কে রাখালের বুক ধড়ফড় করে। কোথায় গেল সাধনা ? কিছু করে বসবে না তো ?

একপলকে সে বুঝে গেছে, এ সমস্তই ফাঁকি। দশজনের মতো বউ ছেলে নিয়ে সংসার করতে চায় অথচ সংসার করবার জন্য দরকারি পয়সা উপার্জনের ক্ষমতা তার নেই, নানা প্যাঁচালো কথায় সে তাই সাধনাকে মজিয়ে রাখতে চায়, নিজেকে খাড়া রাখতে চায় সাধনার কাছে।

স্বামী রোজগার করবে আর বউ ঘর সামলাবে এই চিরন্তন রীতির সংসারটা আজও তার কাম্য হয়ে আছে—অচল হয়ে এলেও যে ভাবে হোক চালিয়ে যেতে হবে। ভিত্তিটা সে বজায় রাখতে চায় আগের দিনের—অথচ আসলেই তার ফাঁকি। সংসার আছে, রোজগার নেই। সংসারের মায়া আছে, রোজগারের সামর্থ্য নেই।

সাধনা ফিরে এসে বলে, তবে তাই ঠিক রইল। সকালে আগে এটা করবে, তারপর অন্যকাজ। খাবে এসো।

আমি তো খাব না।

চোখ বড়ো বড়ো করে সাধনা বলে, খাবে না মানে ? ছেলেমানুষি কোরো না !

ছেলেমানুষের মতো সে ভাতের উপর রাগ করতে পারে ভেবে সাধনা যে ভঙ্গি করে তাতে হঠাৎ তাকে ভারী সুন্দর মনে হয় রাখালের। অনেকদিন পরে মনে হয়। এবং সে জন্য এটাও তার খেয়াল হয় যে সাধনার রূপ-লাবণ্যে আজকাল বেশ ভাটা পড়েছে। তাকে আদর করাও আজকাল এক রকম হয়ে ওঠে না। সময়ের অভাবে নয়। শক্তি আর ইচ্ছার অভাবে।

খাব না মানে খেয়ে এসেছি। প্রভাদের বাড়ি খাইয়ে দিল।

সাধনা বলে, এতক্ষণ বলোনি ?

বলবার সময় দিলে কই ? ঘরে পা দেওয়ামাত্র গয়নার কথা আরম্ভ করলে।

আমি তবে খেয়ে আসি।

ঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে রাখালের একটা গুবুতর কথা মনে পড়ে যায়। সাধনাকে কথাটা বলতে তার এক মুহূর্ত দেরি সয় না, তাড়াতাড়ি উঠে যায় রোয়াকের কোণে সাধনা যেখানে খেতে বসেছে।

খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সাধনার।

তুমি তো শুধু নিজের গলার ব্যবস্থা ঠিক করলে। একটা কথা ভেবেছ ?

কী কথা ?

রেবাকে কিছু দিতে হবে না ?

সাধনার হাত অবশ হয়ে ভাতের গ্রাস পড়ে যায়। সুখের বিষয় থালাতেই পড়ে। ভাতের বড়োই টানাটানি আজকাল।

রাখাল চেয়ে দ্যাখে, অ্যালুমিনিয়মের ভাতের হাঁড়িটা শূন্য, সাধনা চেঁছেপুঁছে সব ভাত বেড়ে নিয়েছে। ডালতরকারির পাত্র দুটিও চাঁছামোছা।

অর্থাৎ সে আজ বাইরে থেকে খেয়ে না এলে যে ভাত আর ডালতরকারি দুজনে ভাগ করে খেত, সাধনা একাই তা খেয়েছে। অনেকদিন পরে আজ তাদের পেট ভরেছে দুজনেরই ! তার ভরেছে বড়োলোকের বাড়ির মাংসভাতে, সাধনার ভরেছে স্বামীর ভাগের অন্নটুকু বাড়তি পেয়ে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে হেঁশেল তুলে ঘরে গিয়ে সাধনা বাক্‌সো খোলে। কিনে কিছু দেবার ক্ষমতা নেই, নিজের বিয়েতে পাওয়া কিছু দিয়ে যদি মান রক্ষা করা যায়।

গম্ভীর মুখে হুকুমের সুরে রাখাল বলে, সোনার কিছু দিতে পারবে না।

সাধনা মুখ ফিরিয়ে তাকায়।—কানপাশাটা নতুন আছে। ওটাই দেব।

তোমার কানপাশা যদি তুমি রেবাকে দাও—

কী করবে ? মারবে ? একটা কিনে দাও, আমারটা দেব না। বারোআনি সোনাতেই কানপাশা হবে।

আমরা রেবার বিয়েতে যাব না।

তুমি না যেতে পার, আমি যাব।

আজ রাত্রে তারা অনেকদিন পরে পেট ভরে খেয়েছে।

আজ রাত্রেই অনেকদিন পরে তাদের সোজাসুজি পষ্টাপষ্টি সামনাসামনি সংঘাত বাঁধল।

একেবারে চুপ হয়ে গেল দুজনে। পেটভরা অন্ন আর বুকভরা জ্বালা কি মানুষকে বোবা করে দেয় ?

২

এ কী রকম কলহ ? এতখানি ভদ্র ও মার্জিত ? স্বামী নিষেধ করে দিল, আমার ভাগনির বিয়েতে তোমার বিয়ের গয়না দেওয়া চলবে না। স্ত্রী জানাল, এ হুকুম সে মানবে না। স্বামী বাতিল করে দিল তাদের বিয়েতে যাওয়া। স্ত্রী জানাল, আরেকজন যাক বা না যাক, সে যাবেই।

সেখানেই শেষ।

একটা কটু কথা নয়, রাগারাগি চেঁচামেচি নয়, গলায় দড়ি দিয়ে বা যেদিকে দু চোখ যায় চলে গিয়ে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিজ্ঞা নয়, একপক্ষের কপাল চাপড়ানো আর অন্যপক্ষের কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়া নয়—এ রকম কিছুই নয় !

একটু নীরস রুক্ষ রাগতভাবে পরস্পরের অ-বনিবনাটা যেন শুধু পরস্পরের মধ্যে জানাজানি হল।

তবু দুজনেরই মনে হল বিয়ের পর আজ তারা প্রথম সত্যিকারের কলহ করেছে, একেবারে চরম কলহ, লঘুক্রিয়াতে যা শেষ হবে না।

সংযত ভদ্রভাবেই পরস্পরের বুকে যেন তারা বিষমাখা শেল বিঁধিয়ে দিয়েছে।

যার ফলে হতভম্ব হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকতে হল তাদের।

তারপরেও অবশ্য সাধারণ দরকারি কথা হল সাধারণভাবেই। খানিকটা প্রাণহীন উদাসীনতার সঙ্গে। এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটল দুজনের। প্রাণের জ্বালায় কিছুতে ঘুম না আসায় দুজনের মনে হল ভালোবাসার খেলায় হয়তো বা এই নিষ্ঠুর ব্যবধান খানিকটা ঘুচিয়ে দেওয়া যাবে। অন্তত সামঞ্জস্য ঘটানো যাবে খানিকটা।

কিন্তু চাইলেই যেমন চাকরি মেলে না, শুধু সাধ হলেই তেমনি বিবাদও ঘুচে যায় না মানুষের। সাধের সাধ্য কী বাস্তবকে বাতিল করে দেয় !

সকালে পাড়ার ছেলেটিকে পড়াতে গিয়ে রাখাল ভাবে, তার ছাত্রটির মা-বাবার মতো প্রাণ খুলে কোমর বেঁধে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে তারা যদি ঝগড়া করতে পারত, ওদের মতোই আধঘণ্টার মধ্যে আবার সবে মিটমাট করে নিতে পারত নিজেদের মধ্যে—যেন কিছুই ঘটেনি !

সকালবেলা কলতলায় জলের জন্য দাঁড়িয়ে বাড়ির পাশের অংশের নতুন ভাড়াটে রাজীবের স্ত্রী বাসন্তীর চড়া ঝাঁঝালো সরু গলার আওয়াজ শুনতে শুনতে সাধনা ভাবে, ছোটোবড়ো সব ব্যাপারে সেও যদি এ রকম যখন তখন মেজাজ দেখাত আর রাখাল সেটা সয়ে যেত !

রাখালের সকালের এই ছাত্রটি সতীশ মল্লিক চৌধুরীর ছেলে বিশু। দেবেন ঘোষের দোতলা বাড়িটা কিনে নিয়ে সতীশ সপরিবারে পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে বসবাস করতে এসেছে। বিশু সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে, বুদ্ধি একটু ভোঁতা। কিন্তু মুখস্থ করে পরীক্ষায় বেশ পাশ করে এসেছে বরাবর।

গোড়ায় প্রতিদিন এক ঘণ্টা তাকে পড়া বোঝবার চেষ্টায় রাখাল হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। মাস দুয়েকের মধ্যে নিজের বোকামি বুঝতে পেরে এখন সে বিশুকে যতটুকু তার সহজবোধ্য ততটুকু বুঝিয়ে বাকি পড়া মুখস্থ করতে দেয়।

মাসকাবারে বেতনের টাকা নেবার সময় মনটা একটু খচখচ করে। কিন্তু উপায় কী। একটি ছাত্রের সঙ্গে লড়াই করে সে তো সংসারের একটা ব্যবস্থা পালটে দিতে পারবে না একা।

সতীশ ছেলেমেয়েকে দামি পেস্ট আর দাঁতের বুরুশ কিনে দিয়েছে, নিজের কিন্তু তার দাঁতন ছাড়া চলে না। ছত্রিশ হাজার টাকায় কেনা তার এই বাড়িটাতে যেটা ছিল পৃথক কিন্তু পাকা বাথরুম, সেটাকে সে পরিণত করেছে গোয়ালঘরে। তিনটি গোরুর মধ্যে একটি গাভিন, অন্য দুটি দুধ দেয়।

একটির বাছুর মরে গেছে। দেশে সতীশেরা বাছুর-মরা গোরুর দুধ খেত না। এখানে গয়লা রামেশ্বরের পরামর্শে মরা বাছুরের চামড়া খড়ে জড়িয়ে বাঁশের বাতার ঠ্যাং লাগিয়ে সামনে রেখে গোরুটির দুধ দোয়ানোর ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছে।

তবে এ গোরুর দুধটা ছেলেমেয়েরাই খায়। বাছুরওয়ালা গোরুটির দুধ ভিন্ন দোয়া হয় সতীশের জন্য, জ্বালও দেওয়া হয় ভিন্ন কড়াইয়ে। নিয়ম-ভাঙা অনিয়ম তার চেয়ে ছেলেমেয়েদের পক্ষে মেনে নেওয়া অনেক সহজ।

দোতলায় কোনার ঘরে পড়ানোর ব্যবস্থা। মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। বৈঠকখানা আছে কিন্তু সেখানে সতীশ বসবে নিজে। অন্তঃপুরে নিরিবিলিতেই ছেলেপিলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

ছেলের মাস্টারও খানিকটা গুরুজাতীয় মানুষ। পরের মতো তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখতে মন খুঁতখুঁত করে। শিক্ষাদানের মতো পুণ্যকাজটা তিনি বাড়ির মধ্যে ঠাকুরঘরে করবেন এটাই সঙ্গত।

ভক্তিভাজন পুণ্যকর্মা মানুষ বলেই বাড়ির লোকের সাধারণ চা-খাবারের ভাগ রাখালকে দেওয়া হয় না। বিশু খাবার খায়, একবাটি দুধ খায়, রাখাল জানালা দিয়ে খানিক তফাতে ফাঁকা মাটির মধ্যে ছেলেখেলার ঘরের মতো ছোটো ছোটো কুঁড়ে দিয়ে গড়া উদ্‌বাস্তুদের কলোনিটার দিকে চেয়ে থাকে। ভোলার মা ওই কলোনি থেকে ডিম বেচতে বেরোয় চারিদিকের পাড়ায়।

দেখা যায়, রাস্তার কলটাতে কলোনির দশ-বারোটি মেয়ে বউ ভিড় করেছে।

পূজাপার্বণের প্রসাদ মাঝে মাঝে রাখাল পায়। বিশুর মা অথবা তার বিধবা বোন নির্মলা থালায় সাজিয়ে ফলমূল নাড়ু মোয়া তক্তি সন্দেশ ইত্যাদিতে প্রায় পনেরো-বিশরকমের প্রসাদ এনে দেয়।

বলে, প্রসাদ খান।

বিশুর মার রং কালো। দেহটি যেন সযত্নে কুঁদে গড়া। কে বলবে তার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, বড়ো মেয়ের বয়স সতেরো-আঠারো এবং সম্প্রতি মেয়েটির একটি ছেলে হওয়ায় সে দিদিমা হয়েছে। পয়সারও অভাব নেই—অন্তত এতকাল মোটেই ছিল না—খাটবার লোকেরও অভাব নেই, তবু প্রাণের উল্লাসে বিশুর মা সংসারের পিছনে কী খাটুনি খাটে আর কত নিয়মনীতি মেনে চলে দেখে রাখাল বুঝতে পেরেছে তার দেহের ঠাট কীসে এ রকম বজায় আছে।

শুধু ভালো খাওয়া ভালো থাকার জন্য নয়। দেহ মনের সমস্ত অকারণ ক্ষয়ক্ষতি নির্যাতন বর্জন করার জন্য। সতীশের সঙ্গে যখন তখন ঝগড়া করে কিন্তু মানুষটা সোজা সহজ সংযমী-সংস্কার কুসংস্কার গ্রাম্যতা সভ্যতা নিয়মনীতি সমেত নিজের জীবনে মশগুল। স্বামীর সঙ্গে কলহ তার কাছে সংসারধর্ম ঠিকমতো পালন করারই একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার, তার বেশি কিছু নয় !

ব্রত-পূজাপার্বণের উপলক্ষে বিশুর মার উপবাস লেগেই আছে। আজ বা এ মাসে এটা খেতে নেই, কাল বা ও মাসে ওটা খেতে হয়, এ সব নিয়ম পালনের ব্যাপারেও সে খুব কড়া।

প্রথম প্রথম অবজ্ঞার হাসি ফুটত রাখালের মুখে। ভাবত, ময়রার অরুচি জন্মে মিষ্টান্নে। সব রকমের পুষ্টিকর সুখাদ্য যার এত বেশি জোটে যে শুধু চেখে দেখতে গেলে পেট খারাপ হতে বাধ্য, সে ব্রতপার্বণের অজুহাতে উপোস করবে না তো করবে কে ?

ক্রমে ক্রমে সে বুঝেছে অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কথাটা। বুঝেছে সাধনাকে পেট ভরে খেতে না পেয়ে চোখের সামনে রোগা হতে যেতে দেখে। পুষ্টিকর খাদ্য সে পায় না, আগেও পেত না। সে অতীতকে আজকের তুলনায় তার সুদিন মনে হয়, তখনও তার খাদ্য ছিল সাধারণ ডালভাত। তবে পেটটা তখন দুবেলা ভরত, আজ তাও ভরে না।

বিশুর মা চিরিদিন দুধ ঘি মাছ খেয়েছে, আজও খায়। কিন্তু উপোস আর খাদ্যের এত বাছবিচার তার ভালো জিনিসে অরুচির জন্য নয়। শরীর রক্ষার জন্যই এ সব তাকে পালন করতে হয়। নিয়মিত শাঁসালো খাবার খাওয়ার এটাই হল নিয়ম। বারোমাস মাছ দুধ ক্ষীর সব ঠিক এ ভাবেই খেতে হয়। মাঝে মাঝে উপোস দিয়ে।

কিন্তু এ দেশে বিশুর মার মতো জমিদার গিন্নি হবার ভাগ্য আর কজনে করেছে। বারোমাস যারা পেট ভরে ডালভাতও পায় না তারাও তো এ সব ব্রতপূজার নিয়ম মানে, উপোস করে। এমনিই যাদের কম বেশি নিত্য উপবাস, তাদের বেলাও বাড়তি উপোসের প্রথা কেন ?

বাইরে ঠিকা ঝি মায়ার গলা শোনা যায়, ও বেলা এসবোনি মা, আগে থেকে বলে রাখলুম। দুদিন উপোস আছি।

বিশুর মা বলে, উপাস খালি তুমি করছ নাকি ? আমরা উপাস করি না ? উপাস কইরা কাম করন যায় না ?

তা জানিনে মা। ও বেলা পূজা দিতে যাব।

তাই কও, পূজা দিতে যাইবা।

সেই পুরানো দিন থেকে এ সব উপোসের বিধি চলে আসছে, সবাই যখন পেট ভরে খেতে পেত ? ও রকম দিন কি কখনও ছিল এ দেশে ? কেউ গরিব ছিল না, সবাই মিঠাই মণ্ডা যত খুশি খেত ? রাখাল বিশ্বাস করে না। দরকার মতো অন্ন পেত মানুষ, সাধারণ শাকান্ন। মাঝে মাঝে উপোস দিয়ে খেতে হয় এমনি সব ছাঁকা ছাঁকা খাদ্য সকলের জুটত বারোমাস, এ অবাস্তব কল্পনা।

বাড়ির ঝি মায়ার বয়স সাধনার চেয়ে বেশি হবে না। বারান্দা মুছতে মুছতে সে দরজার সামনে আসে। ঠাকুর ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত তার মুছবার সীমা, চৌকাঠ পার হওয়া বারণ।

গরিবের সাধ করে উপোস দিয়ে লাভ কী বাছা ?

হঠাৎ তার প্রশ্ন শুনে ঘর-মোছা ন্যাতা উঁচু করে ধবে মায়া একটু অবাক হযে চেযে থাকে। কিন্তু আচমকা বলেই কথাটা সে হাল্কা ভাবে নেয় না। এ মানুষটা তার সঙ্গে তামাশাই বা করতে যাবে কেন ?

গরিব বলে ধম্মোকম্মো রইবেনি ?

তা রইবে। এমনি তো খেতে জোটে না, ফের উপোস দিয়ে কী হয় ?

নিয়ম আছে, মানতে হয !

তাই বোধ হয় হবে। রোজ পেট ভরা শুধু শাকান্ন জুটলেও মাঝে মাঝে উপোস দিলে উপকার হয়। একদিন তাই সকলের জন্যই এ নিয়ম হয়েছিল, রাজবানি বা চাকরানির মধ্যে তফাত করা দরকার হয়নি। আজ মায়াদের পেট ভরে না কিন্তু নিয়মটা রয়ে গেছে।

নীচে নেমে বিশুব মাকে দেখে রাখাল আজ অবাক হয়ে যায়। বেনারসি পরেছে দেখে নয়, গায়ে তার গয়নার বহর দেখে। কোনো অঙ্গই বুঝি বাদ যায়নি, মোটা মোটা দামি দামি গয়না চাপিয়েছে নানা প্যাটার্নের। এত সোনাও আঁটে একটা মানুষের গায়ে !

অথচ, আশ্চর্য এই, এতদিন তাব গায়ে গয়নার একান্ত অভাবটাই খাপছাড়া মনে হত বাখালের। হাতে ক-গাছা চুড়ি আর গলায় সাধাবণ একটি হার ছাডা কোথাও সোনা তার চোখে পড়েনি আজ পর্যন্ত !

সতীশের বেশ দেখে বোঝা যায কর্তা-গিন্নি কোথাও যাবে।

বিশুর মা বলে, কুটুমবাড়ি যামু, গাড়ির লেইগা খাড়াইয়া আছি। এমন মানুষ আর সংসারে পাইবা না। সময় মতো খেয়াল কইরা গাড়িটা আনতে দিব—

সতীশ বলে, দেই নাই ? কখন লোক পাঠাইছি। হারামজাদা রসিকটা কোনো কামের না।

যেমন মানুষ তুমি, তোমার লোকও জোট তেমন !

রাস্তায় নামতে নামতে রাখাল ভাবে, কুটুম বাড়ি থেকে ফিরে বিশুর মা কি গয়নাগুলি খুলে রাখবে ? এ রকম কোনো বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া সে গয়না গায়ে চাপায় না কেন ?

এত গয়না আছে অথচ দু-একখানাব বেশি গাযে চাপায না, কে জানে এর মধ্যে কী বহস্য আছে !

ছেলের জন্য সারাদিনে মোটে এক পোয়া দুধ। মাই ছাড়ানো উচিত ছিল ক-মাস আগেই কিন্তু ওই জন্যই সম্ভব হয়নি। এক পোয়া দুধে ওর কী হবে ? কিন্তু এদিকে বুকের দুধও তার শুকিয়ে এসেছে। ক-দিন পরে দুধের বরাদ্দ আরেকটু না বাড়ালে উপায় থাকবে না।

উনান ধরিয়ে সাধনা জল মিশিয়ে দুধটুকু জ্বাল দিচ্ছে, এত সকালে বাসন্তী এল।

ওদিকে বিশুর মার গায়ে রাখাল যেমন দেখেছে তার সঙ্গে তুলনা না হলেও বাসন্তীর গায়েও গয়না কম নয়। সোনাদানা যা কিছু আছে দিনরাত সে গাযে গায়েই রাখে। সকালবেলা এখন ঘরে পরার সাধারণ শাড়ি শেমিজের সঙ্গে গায়ে এত গয়না শুধু বেখাপ্পা ঠেকে না, অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে রাত্রে সে কি এতগুলি গয়না গায়েই শোয় ? অথবা রাত্রে কিছু খুলে রেখে সকালে ঘুম ভেঙ্গে প্রাতঃকৃত্য সারবার মতো আগে গয়নাগুলি গায়ে চাপায় ?

সাধনার চেয়ে কয়েক বছর বয়সে বড়ো। কিন্তু মুখখানা তার চেয়েও কচি দেখায়। তাকে দেখে কল্পনা করাও কঠিন যে মানুষটা সে অতিমাত্রায় ঝগড়াটে আর ঝগড়ার সময় তার গলা দিয়ে অমন বাঁশির মতো সরু আওয়াজ বার হয় !

সাধনা বলে, ঘরে চলুন, এখানে আমারই বসার জায়গা হয় না।

বাসন্তী বলে, না না, বসব না। আপনি কাজ করেন। এখন কথা বলার সময় আপনারও নেই আমারও নেই। আমিও ভাত চাপিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে সে মেঝেতেই বসে পড়ে।

উনি বাজারে গেলেন। আমি ভাবলাম, এই ফাঁকে আপনাকে একটা দবকারি কথা বলে যাই।

তার কাছে দরকারি কথা ? সাধনা একটু আশ্চর্য হয়ে বলে, বলুন না ?

বলি। আগে বলুন রাগ করবেন না ?

রাগ করব ? কী কথা বলবেন যে রাগ করব ?

আগে কথা দিন রাগ করবেন না। নইলে বলব না ?

তার আদুরেপনায় সাধনার হাসি পায়। একটু আহ্লাদি না হলে সব সময় এত গয়না গায়ে চাপিয়ে রাখার সাধ কারও হয় ! সে মৃদু হেসে বলে, বেশ তো কথা দিলাম।

বাসন্তী ইতস্তত করে, অকারণে একবার একটু হাসে, তারপর বলে, আপনাব ভাঙা হারটা আমায় বেচে দিন। বাগ করবেন না বলেছেন কিন্তু।

রাগ করবে না কথা দিলেও মুখ অন্ধকার হয়ে আসে সাধনাব। সে তিক্তস্ববে বলে, আপনি কী করে শুনলেন আমাদের কথা ? আপনাদের ঘব থেকে বুঝি শোনা যায় ?

বাসন্তী যেন আকাশ থেকে পড়ে।

আপনাদের কথা ? কই আপনাদের কথা তো শোনা যায় না কিছু ?

তবে কী করে জানলেন আমি হার বেচব ?

আপনিই তো আমাকে পরশু দিন বললেন ভাই ! বেচবার কথা বলেননি, বলেছেন ওটা আর সারানো যাবে না, নতুন গড়িয়ে নেবেন।

সাধনা লজ্জা পায়। তাই বটে, তার বাকসে তুলে বাখা ভাঙা একটি হাবেব কথা কাউকে বলতে সে কী বাদ রেখেছে। তার একটা ভাঙা হাব আছে, সেটার বদলে সে নতুন হাব গডিযে নেবে এ খবর যে সারা শহরে রটে যায়নি তাই আশ্চর্য।

কিছু মনে করবেন না। আমারই ভুল হয়েছে।

মনে তো করবেন আপনি। আমি কোন স্পর্ধায় আপনার ভাঙা হাব কিনতে চাইব ? তাই জন্যে তো কথা আদায় করেছি, বাগ করবেন না। কাল বুঝি এই নিয়ে কথা হযেছে কর্তার সঙ্গে ? আমি সব শুনে ফেলেছি ভাবছিলেন বুঝি ?

বাসন্তী সজোরে মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে, একটা কথাও শুনিনি। আপনাদের ঘরের কথা শুনতে পেলেও শুনতে যাব কেন ভাই ?

পরক্ষণে মুখের ভাব ও গলার স্বর পালটে বলে, ওমা, ওদিকে ভাত চড়িয়ে এসেছি। আমি বরং খোলাখুলি সব বলি আপনাকে। আপনার কাছে লুকোব না। শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন আমি হারটা কিনতে চাইলে আপনাদের কোনো অপমান নেই। আপনাদের কোনো ক্ষতি নেই, এদিকে আমার যদি একটা উপকার হয়--

সাধনা বলে, তাই ভাবছি। ভাঙা হার কিনবেন কেন ?

সে কথাই বলছি। কথাটা কিন্তু ভাই কাউকে বলবেন না। কাউকে বলবেন না মানে অবিশ্যি আপনার উনিকে বাদ দিয়ে। ওনাকে তো নিশ্চয় বলবেন !

বাসন্তী একগাল হাসে। হাসিটা যতখানি সম্ভব বজায় রেখে বলে, ব্যাপারটা কী জানেন. লুকিয়ে কিছু নগদ টাকা জমিয়েছি। টাকা কি লুকিয়ে রাখা যায় ? তাই ভাবলাম, আপনার ভাঙা হারটা কিনে রাখি, টাকার বদলে সোনা থাক। লুকোচুরিরও দরকার থাকবে না। কে জানছে বাক্সের ভাঙা হারটা

আমার নয় ? মেয়েছেলেদের কোন গয়না আস্ত আছে কোন গয়না ভেঙে গেছে অত খবর কি ব্যাটাছেলে রাখে ?

সাধনা মনে মনে ভাবে, তা এককাঁড়ি গয়না থাকলে আর কী করে খবর রাখবে !

বাসন্তী এবার মুখখানা গম্ভীর করে। বলে, আপনাদের ভাববার কিছু নেই। দোকানে ওজন করিয়ে দর কষে আনবেন, যা দাম হয় আমি তাই দেব। দোকানে বিক্রি করতেন, তার বদলে আমায় করছেন।

সাধনা একটু ভেবে বলে, আপনি নতুন কিনবেন না কেন ?

বাসন্তী মুচকে হাসে। এবারও মুচকি হাসিটা বজায় রেখেই বলে, আসল কথা, টের পেয়ে যাবে। নতুন সোনার গয়না কি লুকানো যায় ? তা ছাড়া, আর গয়না চাই না ভাই, ঢের আছে। টাকার বদলে সোনা রাখব, নিজের জমানো টাকা কেন নষ্ট করব নতুন গড়াবার মজুরি দিয়ে ?

সে উঠে দাঁড়ায়—নাঃ, ভাত আমার পোড়া লাগবে ঠিক। এখন বলবেন, না আরেকজনের সাথে পরামর্শ করে—?

সাধনা বলে, কিনতে চাইলে আপনাকে দেব না কেন ?

বাসন্তী যেন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যায়।

খানিক পরেই রাখাল ফিরে আসে।

বিশুকে পড়িয়ে সে সাধারণত বাড়ি আসে না, সোজা চলে যায় দু-নম্বর ছাত্রটিকে পড়াতে। এ ছাত্রটির বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে, হেঁটে যেতে মিনিট কুড়ি লাগে। আটটা থেকে নটা পর্যন্ত তাকে পড়াবার কথা। সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বিশুকে পড়িয়ে কাছাকাছি হলেও নিজের ঘরে উঁকি দিয়ে যাবার সময় থাকে না।

সাধনা ভাবে, রাখাল কথা তুলবে। নইলে বাড়ি এল কেন ?

রাখাল ভাবে, সাধনা নিশ্চয় বুঝেছে এখন তার ঘরে আসার মানে। সেই নিশ্চয় আগে কথা তুলবে।

ডাল চাপিয়ে সাধনা বলে, রেশন এলে ভাত হবে। কাল ~লে রেখেছি।

রাখাল বলে, কার্ড আর থলি দাও। বিমলকে পড়াতে যাবার পথে কার্ড জমা দিয়ে যাব। এখন বড়ো ভিড়। আসবার সময়—

বরাবরই তাই তো কর। এদিকে আমার উনুন যাবে কামাই। একদিন আগে রেশনটা এনে রাখলে দোষ হয় ? কয়লা কিনতেও তো পয়সা লাগে ?

সাধনার গলা চড়েছে। পার্টিশনের ও পাশে বাসন্তী যাতে অনায়াসে শুনতে পাবে, এতখানি চড়েছে।

জীবনে আজ পর্যন্ত সে এতখানি গলা চড়িয়ে সাধারণ কথা কেন কোনো কথাই বলেনি।

সত্যবাবু আজ টাকা না দিলে রেশন আসবে না।

তার দু-নম্বর ছাত্র বিমলের বাবা সত্যবাবু সরকারি উকিল। তার কাছে মাসকাবার বলে কিছু নেই। অবশ্য শুধু এটা ঘর থেকে টাকা বার করে পাওনা মেটাবার বেলায়। পাওনা সে কারও বাকি রাখে না, যাকে যা দেবার শেষ পর্যন্ত দিয়ে দেয়, কিন্তু সময়মতো দেয় না। টাকা সম্পর্কে তার মূলনীতি হল, নগদ যা আসবে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘরে আনা, যা দিতে হবে তা যতদিন সম্ভব দেরি করে ঘর থেকে বার করা। মাসে দশ বারো তারিখের আগে রাখাল তার কাছে ছেলে পড়ানোর মজুরি আদায় করতে পারে না।

সাধনা তা জানে। সত্যবাবুর কাঝে গতমাসের বেতন আদায় করে তবে আজ রাখাল রেশন আনবে এটাও তার আগে থেকেই জানা। কিন্তু জানা হল নিছক জ্ঞান। ছাঁকা জ্ঞান দিয়ে মানুষ কারবার করেছে, কেউ কোনোদিন শুধু জ্ঞান ধুয়ে জল খেয়ে প্রাণ ঠান্ডা রাখতে পারেনি।

সাধনা বলে, রেশন না এলে একলা আমি উপোস দেব না।

আজ টাকা না দিলে কাজ ছেড়ে দেব।

তা ছাড়বে বই কী, নইলে চলবে কেন ? একটা কাজ ছেড়েছ গোঁয়ারতুমি করে, অভিমানে আরেকটা কাজ ছেড়ে একেবারে উপোস তো দিতেই হবে।

রাখাল একটু থ বনে যায়। সাধনার তাহলে মুখ খুলছে ? এবার তারা কলহবিদ্যায় ক্রমে ক্রমে ধাতস্থ হবে নাকি ?

আটটা বাজে, আমি যাই।

বলেই রাখাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। যেন পালিয়ে যায়। না গিয়ে তার উপায় নেই। সত্যবাবুর ছেলেকে পড়াতে যাবার সময় নির্দিষ্ট আছে। আজ সত্যবাবুর কাছে তার ছেলেকে পড়ানোর বাকি মজুরিটা আদায় করতেই হবে, নইলে রেশন আসবে না। সময় মতো কাজ হওয়া দরকার। সাধনা এ সব বোঝে।

তবু সাধনার বুক জ্বলে যায়। কিছুতে তুলল না হারেব কথাটা ! ব্যবস্থা কবাব জন্য সেই আবার নিজে থেকে তোষামোদ করুক, এই ইচ্ছা রাখালের ?

এদিকে রাখালের প্রাণটাও জ্বালা করে। রেশন কার্ড আর থলিটাও এগিয়ে দেবে না সাধনা, তাকেই খুঁজে পেতে নিয়ে যেতে হবে ! তা, তার মতো অপদার্থ মানুষ আর কী ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারে ?

জ্বালার উপর জ্বালা ! একজনের মর্মান্তিক অভিমানের, আরেকজনের সর্বনাশা আত্মগ্লানির।

৩

রাখাল বেরিয়ে যেতেই পাশের ঘরের আশা এসে বলে, চিনিটা দেবে ভাই ?

রেশন আনতে গেছে। এলেই দেব।

আশা মুখ ভার করে ফিরে যায়।

আধকাপ চিনি ধার করেছিল, তারই জন্য তাগিদ। পাশের ঘরে থাকে, তবু কত অনায়াসে সঞ্জীব আর আশা তাদের এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলে ভাবতে গেলে সাধনার মাঝে মাঝে কৌতুক বোধ হয়। মাঝে মাঝে, সব সময় নয়।

আজ ইচ্ছা হচ্ছিল একটা চাপড় মারে আশার গালে। রেশন কার্ড আর থলি নিয়ে রাখালকে বেরোতে দেখেই যে আশা চিনিটুকু ফেরত চাইতে এসেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চিনি সাধনা দিতে পারবে না জানে, সে জন্য বিরক্ত হবার সুযোগ জুটবে। টাটকা তাগিদটা ভুলতেও পারবে না সাধনা, খানিক বাদে রেশন এলে চিনিটাও ফেরত দেবে।

তারই আগেকার রান্নাঘরটি দখল করে রাখে, দিনে শতবার মুখোমুখি হতে হয় উঠানে বারান্দায় কলতলায়, আশা যেন তাকে দেখতেই পায় না। কত লোকের সঙ্গে যেচে কত কথা বলে সঞ্জীব, রাখালের সঙ্গে মুখোমুখি হলেও যেন বোবা বনে থাকে। এক বাড়িতে পাশাপাশি থেকেও তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই ওরা একান্ত নিস্পৃহ, উদাসীন।

সাধনা জিজ্ঞাসা করে, কটা বাজল দিদি ?

জবাব আসে ঘড়ি ঠিক নেই।

এই বেঠিক ঘড়ি ধরেই ঠিক সময়ে সঞ্জীব কিন্তু আপিস যায়, রেডিয়ো চালায়। পিয়ন যাকে সামনে পায় তার হাতেই দু-ঘরের চিঠি দেয়। তাদের চিঠি সঞ্জীব বা আশার হাতে দিলে পিয়নকে ফিরিয়ে দেয়, বলে, আমাদের চিঠি নয়।

বলে ঘরে চলে যায়।

সঞ্জীব আপিস গেলে আশা ঘরে তালা দিয়ে রান্নাঘরে যায়—দশ মিনিটের জন্য নাইতে গেলেও ঘরের দরজায় তালা পড়ে ! পাশেই আছে সস্ত্রীক এক বেকার !

তবু আশার কাছেই সাধনা আধকাপ চিনি ধার করেছিল। কী করে করেছিল কে জানে ?

আশা গয়না পরে কম। হাতে দু-গাছা করে চুড়ি আর গলায় একটি হার। ভালো ভালো রঙিন শাড়ি ছাড়া তার সাধারণ কাপড় একখানাও নেই, তার বাড়িতে ব্যবহারের জামাও বিশেষ ধরনে ছাঁটা। খোঁপা সে বাঁধে না, কিন্তু পাকানো চুলের যে দলাটি ঘাড়ের কাছে ঝোলে খোঁপার চেয়ে তার বাঁধন শক্ত মনে হয়—সাধনা তো কখনও খসতে দ্যাখেনি। বাড়িতে সব সময়ে সে স্যান্ডেল পায়ে দেয়।

তাকে দেখলেই টের পাওয়া যায় গয়না তার যথেষ্টই আছে কিন্তু বেশি গয়না গায়ে রাখা সে অসভ্যতা গ্রাম্যতা মনে করে।

নটার আগেই সঞ্জীব নাইতে যায়। ফরসা রোগা মানুষটা অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারির মতো দেখতে। উঠানটুকু পার হবার সময় পলকের জন্য সে একবার সাধনার রান্নার জায়গাটুকুর দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে।

হঠাৎ কী মনে হয় সাধনার, ছেলেকে কোলে নিয়ে একটা চায়ের কাপ হাতে করে সে যায় বাসন্তীর কাছে। বলে, আধকাপ চিনি ধার দেবেন ?

ধার দেব না। আধকাপ চিনি আবার ধার দেব কী রকম ভাই ?

আজকাল চিনি কি এমনি নেওয়া যায়, না দেওয়া যায় ? বাসন্তী কাপটা ভর্তি করে চিনি এনে দিয়ে হেসে বলে, এখন আমার বাড়তি আছে। আমার যখন দরকার হবে, আমিও গিয়ে খানিকটা চেয়ে আনব।

সাধনা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে। আশার কাছে আধকাপ চিনি ধার নেওয়ার ধাক্কায় এই সহজ আদান-প্রদানের সম্পর্কটা সে ভুলতে বসেছিল ?

ফিরে গিয়ে আধকাপ চিনি নিয়ে সাধনা আশার রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বলে, আপনার চিনিটা দিদি।

সঞ্জীব তাড়াতাড়ি নাওয়া সেরে ইতিমধ্যে খেতে বসেছিল। সে মুখ তুলেও চায় না।

সাধনা বলে, আপনার আপিসটা কোথায় ?

সঞ্জীব বলে, ক্লাইভ স্ট্রিটে।

এখন কি ক্লাইভ স্ট্রিট আছে ? নতুন কী নাম হয়েছে না ?

গায়ের জোরে সাধনা যেন ওদের উদাসীনতাকে উপেক্ষা করে আশাকে পর্যন্ত ডিঙিয়ে একেবারে সঞ্জীবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করবে ! ভাব করলেই বেকার তারা অনুগ্রহ চেয়ে বসবে ভেবে তোমাদের যতই মিছে আতঙ্ক থাক, সে যেন তা গ্রাহ্য করবে না !

চিনিটা ঢেলে রেখে আশা খালি কাপটা এগিয়ে দেয়। তবু নড়ে না সাধনা।

সত্যবাবুর কাছে টাকা পেয়ে রেশন আর তরকারি আনলে তবে তার আজ রান্নাবান্নার হাঙ্গামা। সামনে মানুষ থাকতে কেন সে অবসরের সময় দুটো কথা কইবে না ?

আশা তাকে বসতে বলে না। বিব্রত সঞ্জীব খাওয়া শেষ করে উঠবার সময় হঠাৎ বলে, আপনি বসুন ?

আশার দিকে একনজর তাকিয়ে সাধনা হেসে বলে, না যাই, কাজ আছে।

নিজের ঘরে গিয়ে তার কান্না আসে। মনে হয় গায়ের জোরে সে যেন সঞ্জীবের কাছে সার্টিফিকেট আদায় করেছে যে সেও একটা মানুষ, একজন বেকার মানুষের বউ হলেও। এ রকম সার্টিফিকেটের দরকারও তার হচ্ছে ?

ছি ছি !

বাইরে থেকে ডাক আসে, রাখালবাবু আছেন ? রাখালবাবু ?

রাজীবের গলা। মোটাসোটা কালো মানুষটিকে সাধনা চোখে দেখেছে, সামনাসামনি এ পর্যন্ত কখনও ওর সঙ্গে কথা বলেনি। বাড়িতে গেলে রাজীব নিজেই তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে তার পর্দা রক্ষা করে !

বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে সাধনা বলে, উনি তো বাড়ি নেই।

তবে তো মুশকিল হল !

কিছু বলার থাকলে বলে যান।

রাজীব ইতস্তত করে বলে, রাখালবাবু চাকরি খুঁজছেন—একটা খবর পেয়েছিলাম। আজকেই ওনার যাওয়া দরকার, তা আমি তো বেরিয়ে যাচ্ছি—

আপনার আপিসের ঠিকানাটা দিয়ে যান, উনি গিয়ে দেখা করবেন আপনার সঙ্গে। কখন যাবেন ?

রাজীব একেবারে ছাপানো ঠিকানা তাকে দেয়—কার্ড নয়, একটা ছাপা বিলের মাথাটা ছিঁড়ে দেয়। সাধনা জানত রাজীব লেখাপড়া বেশি করেনি, তার কথার ধরন ও চালচলনে সে অল্প শিক্ষিত ছোটো ব্যবসায়ীর সেকেলে ভোঁতা ভাবটাই পুরোমাত্রায় প্রত্যাশা করছিল। আজ সামনাসামনি মানুষটার সঙ্গে কথা বলে সে আশ্চর্য হয়ে যায়। মার্জিতরুচি শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে কোনোই তো তফাত নেই তার ! এই রাজীবের ব্যাবসা বিড়ির পাতা আর বিড়ির তামাকেব ! শুখা আর পাতা বেচে, তাও বন্ধুর সঙ্গে ভাগে, বাসন্তীকে গায়ে সে এত গয়না দিয়েছে ! লুকিয়ে বাসন্তী এত টাকা জমিয়েছে যে তার ভাঙা হারটা কিনে টাকার একটা অংশকে সোনা করে জমানো সে সুবিধাজনক মনে করে !

রাজীব জানায় বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে রাখাল যেন যায়। রাখালকে সঙ্গে নিয়ে চেনা একটি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, সে আবার রাখালকে নিয়ে যাবে যে আপিসে চাকরি খালি আছে—হাঙ্গামা অনেক !

হাঙ্গামা বইকী। ঘরে গিয়ে সাধনা তাই ভাবে। এমন লোকও আছে জগতে আপনজনকে চাকরি জুটিয়ে দেওয়া যাদের কাছে ডালভাত—মায়ের পিসতুতো ভাই সম্পর্কে এমনি একজন মামা থাকায় ওই বাগানওলা বাড়ির হাবাগোবা ছেলে কুমুদ চাইতে না চাইতে তিনশো টাকার চাকরি পেয়ে গেছে। কিন্তু বিড়ির পাতা আর তামাকের ছোটোখাটো ব্যবসায়ী রাজীব তো সে দরের বা স্তরের মানুষ নয়, এ বাজারে একজনকে চাকরি জুটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাটাই তার পক্ষে হাঙ্গামার ব্যাপার বইকী !

স্বেচ্ছায় যেচে সে এই হাঙ্গামা করতে চায় কেন ?

রাখাল তার আত্মীয়ও নয়, বন্ধুও নয়। ভালোরকম জানাশোনাও নেই তাদের মধ্যে। রাখালের চাকরির জন্য তার এত মাথাব্যথা কেন ?

বাসন্তী বলেছে ?

বাসন্তী কেন রাখালকে চাকরি জুটিয়ে দেবার কথা রাজীবকে বলবে ? তার স্বার্থ কী ?

সাধনা নিশ্বাস ফেলে। ঠিকমতো বোঝা গেল না। শুধু ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থ নিয়ে যে জগৎ চলে না, এ কি তারই একটা প্রমাণ ? আধকাপ চিনি ধার চাইতে যেতে বাসন্তী কী রকম খুশিতে ডগমগ হয়ে কাপ ভর্তি চিনি দিয়ে বলেছিল যে ধারের কারবার তাদের মধ্যে নয়, বারবার সে দৃশ্য মনে আসে। মনে আসে তার হারটি কিনতে চাওয়ার ভূমিকা করা। এ ভাবে হারটা কিনতে চাওয়ায় পাছে তাকে অপমান করা হয়, সে রাগ করে, এ জন্য সত্যই ভয় ছিল বাসন্তীর !

রাজীবের সঙ্গে বাসন্তীর অনেক অমিল, অনেক বিষয়ে রাজীবকে তার অবিশ্বাস। শুধু রাজীবের বেলা নয়, পুরুষ মানুষ সম্পর্কে বাসন্তীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বড়ো কম। এটা বাসন্তী গোপনও করে না এবং সাধনাও আগেই টের পেয়েছিল।

পুরুষ রাখাল তার ভাঙা হারটা দোকানে বেচতে যাবে এ চিন্তা কি অসহ্য ঠেকেছে বাসন্তীর ? জমানো টাকা সোনা করতে চায় এসব কি তার বানানো কথা ? আসলে তার অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে সে ব্যবস্থা করতে চায় যে পুরুষ এবং স্বামী রাখালের বদলে সে যাতে হারটা নিজেই বেচতে পারে, নগদ টাকাটা যাতে সে-ই হাতে পায় ?

অথবা এ সমস্ত তারই উদ্ভট কল্পনা ?

জানালা দিয়ে দেখা যায় পাড়ার ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। ছেলেরা একলা অথবা দু-তিনজন একসাথে, মেয়েরা আট-দশজন দল বেঁধে। সেও এমনিভাবে স্কুলে যেত, বেশি দিনের কথা নয়। তখনও টের পেত বাপের তার অভাবের সংসার। ওই ছেলেমেয়েরাও কি টের পায় আজকের সংসারের ভয়াবহ অভাব—দু-চারজন ছাড়া ? কোনো মন্ত্রে বয়স কমে গিয়ে একবার যদি সে ভিড়ে পড়তে পারত ওদের দলে ! নিদারুণ অস্থিরতা জাগে সাধনার, একটু ছটফট করে বেড়াবার জায়গা পর্যন্ত তার নেই। এই একখানা ঘরে সে একা। তার কাজ নেই, বেঁচে থাকার মানে নেই। এক পোয়া দুধ জ্বাল দিয়ে আর একমুঠো ডাল সিদ্ধ করে উনানটাকে নিভতে দিয়ে তার শুধু প্রতীক্ষা করে থাকা যে কতক্ষণে দুটি চাল আসবে শাকপাতা আসবে, আবার উনান ধরিয়ে ভাত তরকারি রাঁধবার সুযোগ পাবে !

বাক্সো খুলে সাধনা ভাঙা হারটা বার করে। খোকা ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে তাকিয়েও দ্যাখে না। আবার সে বাসন্তীর কাছে যায়।

বাসন্তী চুলে তেল দিচ্ছিল, নাইতে যাবে। আজকেই আগে সে দুবার বাসন্তীকে দেখেছে—গায়ে শুধু তার গয়নার আবরণ নয়, মোটা ছিটের জামা কাপড় যেন বোরখার মতোই গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত তার নারীত্বকে ঢেকে রেখেছিল।

এখন শুধু ফিনফিনে একখানা পাতলা কাপড় আলগাভাবে গায়ে জড়ানো।

রাজীব বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই দেহকে সে আড়াল থেকে মুক্তি দিয়েছে।

কী হয়েছে ভাই ?

কিছু হয়নি। হারটা সত্যি কিনবেন ?

কিনব না ? আমি কি তামাশা করছিলাম আপনার সঙ্গে ?

তবে কিনে নিন।

বাসন্তী দ্বিধার সঙ্গে বলে, ওজন হল না, আজকে সোনার দর কত জানা নেই—

সাধনা বলে, ওজন তিন ভরি ধরুন। দোকানের রসিদ এনেছি, তিন ভরি দেড় আনা ওজন লিখেছে, দেড় আনা বাদ দিন। সোনার দর কাগজেই আছে—

বাসন্তী হঠাৎ হাসে, তা তো আছে, কিন্তু সোনামণিই যে নেই !

তার মানে ?

তুমি বোন বড্ডো ছেলেমানুষ।

সাধনা ক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

বাসন্তীও গম্ভীর হয়ে বলে, ঝোঁকের মাথায় ছুটে এলে, একবার ভাবলেও না আরেকজনকে গোপন করে এটা আমায় বেচে দেয়া যায় না ? সে ভদ্দরলোকের কিছু জানা না থাকলে বরং আলাদা কথা ছিল। মেয়েদের অমন আড়ালে আড়ালে অনেক কিছু করতেই হয়। কিন্তু এটা জানা বিষয়, তুমিই এটা নিয়ে কত পরামর্শ করেছ মানুষটার সঙ্গে। তাকে একেবারে বাদ দিয়ে কি এটা বেচতে পার ?

আমার জিনিস—

হোক না তোমার জিনিস। এ তো শুধু তোমার সোনার জিনিস। তুমি নিজে কার জিনিস ? সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছ ? একেবারে বরবাদ করে দিয়েছ মানুষটাকে ? যতক্ষণ বাঁচবে কথাও কইবে না, পাশেও শোবে না তো ?

সাধনা বলে, তুমি সত্যি আশ্চর্য মানুষ !

বাসন্তী বলে, তুমি সত্যি ছেলেমানুষ। মেয়েছেলে দশ বছরে পেকে ঝানু হবে, পনেরো বছরে রসাবে। বুড়োমি পাকামি সব তলিয়ে থাকবে রসে। নইলে কি ব্যাটাছেলের সঙ্গে পারা যায় ? ছেলেমানুষ রয়ে গেলে আর উপায় নেই, সে বেচারার অদেষ্ট মন্দ !

এত ফন্দি এঁটে চলতে হবে ?

আরে কপাল ! এ নাকি ফন্দি আঁটা, মতলব আঁটা ? মেয়েছেলেদের চালচলন স্বভাব হবে এটা। ব্যাটাছেলের মতো ব্যাটাছেলে হবে, মেয়েছেলের মতো মেয়েছেলে হবে, যেমন সংসার যেমন নিয়ম। তাতে ফন্দি আঁটার কী আছে ? বুঝে শুনে চলবে না তো কি বোকাহাবা হবে মানুষ ? ছেলেমানুষের মতো ঝোঁকের মাথায় চলবে ? সাধ করে জেনেশুনে সুখশান্তি নষ্ট করবে ? না ভাই, ওটা মোটে কাজের কথা নয়।

ছেলের কান্না শুনে সাধনা তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে। বাড়িতে পা দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে দ্যাখে, তার ছেলে আজ আশার কোলে উঠেছে !

তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চেয়ে ঝাঁঝালো গলায় আশা বলে, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে ? একলা ফেলে রেখে গেছ ছেলেটাকে ? রোয়াক থেকে পড়ে মাথাটা যে ফাটেনি—

একলা কেন ? তুমি তো ছিলে।

সাধনা হাসে কিন্তু আশা গম্ভীর মুখেই ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যায়। এ তো হাসি তামাশার কথা নয় !

রেশন, কিছু তরকারি আর আধপোয়া মাছ নিয়ে রাখাল বাড়ি ফেরে। সত্যবাবুর কাছে মাসভর খাটুনির মজুরির টাকা আজ সে আদায় করে ছেড়েছে। তার চাইবার ধরন দেখে আজও তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবার সাহস সত্যবাবুর হয়নি।

সাধনার কাছে রাজীবের কথা শুনে সে বলে, ভাঁওতা বোধ হয়।

তোমাকে ভাঁওতা দিয়ে মানুষটার লাভ কী ?

কে জানে কী মতলব আছে। সোজাসুজি আমায় বললেই হত !

স্থিরদৃষ্টিতে সে সাধনার দিকে চেয়ে থাকে।

তরকারি কুটবে কী, সে দৃষ্টি দেখে মাথা ঘুরে যায় সাধনার !

সারাদিন বাইরে কাটাও, কখন তোমায় দেখা পাবেন ?

পাশাপাশি ঘর, ইচ্ছা থাকলে আর দেখা হত না ? রাত্রে তো বাড়ি ফিরি আমি ?

সাধনা চুপ করে থাকে। রাখালের একটা চাকরি বাগিয়ে দেবার জন্য বাসন্তী রাজীবের উপর চাপ দিয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা নিয়ে গিয়েও মুখ ফুটে বাসন্তীকে সে কিছু বলতে পারেনি। কুণ্ঠা বোধ করেছে। মনে হয়েছে বাসন্তী যদি আড়াল থেকে তার ভালো করতে চেয়ে থাকে এ বিষয়ে তাকে আড়ালে থাকতে দেওয়াই ভালো।

বাসন্তী যেচে তার সঙ্গে ভাব করতে চায়, কেন চায় সে হিসাবটা এখনও সাধনার ঠিক হয়নি বলে এই কুণ্ঠা। বাসন্তী যদি তার প্রশ্নের জবাবে সহজভাবে হেসে বলেই বসে যে, হ্যাঁ ভাই, আমিই ওকে বলেছি—কী ভাষায় কীভাবে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে সাধনা ? নিজের মান বাঁচিয়ে জানাবে ?

বাজীবের ঠিকানা-লেখা কাগজটা নাড়তে নাড়তে বাখাল আবাব ব্যঙ্গের সুরে বলে, আমাব জন্য হঠাৎ এত দরদ জাগল কেন ? আমি তো ভদ্দবলোককে চাকবি খুঁজে দিতে বলিনি ? চাকরি কিনা গাছের ফল, যেতে যেচে প্রতিবেশীদেব বিতরণ কবেন !

এবার সাধনা শান্ত সুরে বলে, অন্য কারণও তো থাকতে পারে ?

কী কারণ ? ভালো জানাশোনা পর্যন্ত নেই—

তোমাদের নেই, ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার ভাব আছে।

ও তাই বলো ! পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে তাদের স্বামীদের দিয়ে তুমি আমার চাকরি জোটাবার চেষ্টা করছ ? বেশ, বেশ—এবার তাহলে আর ভাবনা নেই !

রাখাল একখানা চিঠি লিখতে বসে। চিঠিখানা রাখাল তিনশো মাইল দূরে তার ভাইয়ের কাছে লিখছে জানতে পারলে সাধনার মাথা ঘুরে যেত। হাতের কাজ করতে করতে সে বাসন্তীর সহজ বাস্তববুদ্ধির কথা ভাবে—বাসন্তী ঠিক করেছে। তারা কত শিক্ষিত ভদ্র ভালোমানুষ, তাদের মধ্যে কত বিশ্বাস আব ভালোবাসা। এ সব গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সোজাসুজি বলে দিয়েছে যে রাখালকে অন্তত একবার না জানিয়ে হারের ব্যবস্থা সে করতে পারে না, ওটা সংসারের নিয়ম নয় !

নিয়ম নয় এই হিসাবে যে শুধু এই গোপনতাটুকুর জন্য স্বামীকে যা খুশি তাই ভাববার সুযোগ দেওয়া হয়। রাখাল পছন্দ করুক না করুক, তার অবাধ্যতায় যতই রাগ করুক, গুরুতর মনোমালিন্য ঘটে যাক—সে হবে আলাদা কথা। রাখালকে জানিয়ে কাজটা কবলে রাখাল কোনোমতেই এটাকে তার সামনাসামনি বিদ্রোহ করার অতিরিক্ত অন্য কিছু বানাতে পারবে না। না জানিয়ে করলে যা খুশি মানে করতে পারবে তার কাজের।

তাই বটে। এমনিই রীতি এ সংসারের। তারাও বাদ নয়। রাখালকে না জানিয়ে সে ভাব করেছে বাসন্তীর সঙ্গে শুধু এই জন্যই এমন অসম্ভবও সম্ভব হল। গোপন করার ইচ্ছা থাক বা না থাক, জানাবার কথা মনে আসেনি আর প্রয়োজন বোধ করেনি বলেই হোক, সে জন্য কিছুই আসে যায় না। স্বামীকে না জানিয়ে পাড়ার একটি বউয়ের সঙ্গে ভাব করেছে এটাই হল আসল কথা।

রাখাল তাই নানারকম মানে করতে পেরেছে অতি সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনার। রাজীব যেচে তার চাকরি করে দিতে চায়, কেন সে যখন বাড়ি থাকে না ঠিক সেই সময়ে কথা বলতে আর ঠিকানা দিতে আসে সাধনার কাছে, তারই মানে।

ধারালো মানে, কাঁটা-ভরা মানে। দুজনেরই মনকে যা কাটবে আর বিঁধবে।

মনের মধ্যে মানে করতে করতে তাই সে ও রকম স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকতে পেরেছে।

এও তবে সম্ভব জগতে ? রাখালের পক্ষে এ সব কথা ভাবা ?

কলের মতো কাজ করে যায় সাধনা। জগৎ সংসারে যেন জীবনের জোয়ার-ভাটা নেই, স্তব্ধ থমথমে হয়ে গেছে সব। ভাত নামায়, আলু কুমড়ার তরকারি চাপায়, আধপোয়া মাছ সাঁতলে ঝোল করে—তারই ফাঁকে ফাঁকে ছেলেকে আধ-শুকনো মাই চুষতে দেয়।

এ সব যেন অন্য কেউ করছে, সাধনা নয়।

কত বিশ্বাস, কত ধারণা, কত সংস্কার যে তার মিথ্যা হয়ে গেছে এই একটা অসম্ভব সম্ভব হওয়ায়—যা সম্ভব কী অসম্ভব এ বিষয়ে চিন্তা পর্যন্ত করার দরকার হয়নি এতদিন, সেটা একেবারে কঠোর বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দেওয়ায়। উনান নিভে এসেছে।

কয়লা রাখার পুরানো ভাঙা বালতিটার দিকে চেয়ে সাধনার হঠাৎ হাসি পায়। এক টুকরো কয়লা নেই। অন্তত পাঁচ সের কয়লা এনে দেবার জন্য রাখালকে বলতে হবে। নইলে মাছের ঝোল নামবে না।

ঘরে গিয়ে তাক থেকে একটা বই নিয়ে আসে—মস্ত এক গয়নার দোকানের ক্যাটালগ। কত প্যাটার্নের সাধারণ অসাধারণ কত রকমের সোনা আর জড়োয়া গয়নাব ছবিসুদ্ধ তালিকাই যে বইটাতে আছে ! যত্ন করে তাকে তুলে রেখেছিল—কোনোদিন যদি দরকার হয় প্যাটার্ন বেছে পছন্দ করার !

পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে উনানে দিয়ে সে ঝোলটা রাঁধে।

রাখাল এসে লেখা চিঠিখানা তার হাতে দেয়। তার দাদা প্রসন্নকে নিজের নিরুপায় অবস্থার কথা খুলে লিখে রাখাল জানিয়েছে যে সাধনা যদি মাস তিনেক গিয়ে তার কাছে থেকে আসে তাহলে বড়োই উপকার হয়। ইতিমধ্যে রাখাল তার সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবে।

পড়ে চিঠিটাও সাধনা উনানে গুঁজে দেয়।

তুমি যাবে না ?

না।

ভায়ের কাছে বোন যায় না।

এ অবস্থায় যায় না।

রাখাল ব্যঙ্গ করে বলে, এ অবস্থায় আত্মীয়ের বিয়ে বাড়িতে মানুষ নাচতে নাচতে যায়, ভায়ের বাড়ি যায় না, না ?

সাধনা কড়াই কাত করে মাঝের ঝোল উনানে ঢেলে দিয়ে ঘবে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

৪

রাখাল স্নান করে নিজেই ভাত বেড়ে খায়। ডাল তরকারি দিয়ে খায়।

বড়ো মাছের আধপোয়া পেটি এনেছিল সাত আনা দিয়ে। চমৎকার ছিল মাছটা। পোড়া মাছের গন্ধ শুঁকেই খাওয়ার সাধ মেটাতে হল।

খেয়ে উঠেই জামা গায় দেয়। বলে, কই। ঠিকানাটা দাও।

পুড়িয়ে ফেলেছি।

বন্ধুর কাছ থেকে জেনে এসো।

তোমার এ চাকরি করতে হবে না।

রাখাল কাঠের চেয়ারটাতে বসে। বলে, তোমার কি মাথা বিগড়ে গেল ? একজন চাকরি করে দিচ্ছে, চেষ্টা করব না ? তার মনে যাই থাক—

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে সাধনা ফোঁস করে ওঠে, মাথা বিগড়েছে তোমার, আমার নয়। বারবার বলছি মানুষটার সঙ্গে আগে আমার একটা মুখের কথা পর্যন্ত হয়নি, শুধু ওর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ, তবু তোমার ওই এক চিন্তা !

গলা চড়িয়ে চিৎকার করে সাধনা যোগ দেয়, ভদ্রলোকের মনে কিছু নেই, থাকতে পারে না। যদি কিছু থাকে সব তোমারই মগজে।

তবে তো কথাই নেই। ঠিকানাটা জেনে এসো।

রাখালের শান্তভাবে সাধনা বড়োই দমে যায়। ঝিমিয়ে গিয়ে গভীর একটা হতাশা বোধ করে। নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমিই জেনে যাও।

রাখাল বলে, সেই ভালো। যাবার সময় চাকরটার কাছেই জেনে যেতে পারব।

রাখাল বেরিয়ে যায়। সাধনার হারের কথা উল্লেখও করে না।

রাখাল বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই ভোলার মা দরজার বাইরে থেকে ডাকে, খোকার মা কী করেন ?

সাধনা শ্রান্ত কণ্ঠে বলে, ডিম রাখব না ভোলার মা।

একটা কথা ছিল।

শিথিল আঁচল গায়ে জড়াতে জড়াতে সাধনা উঠে আসে, কী বলবে বলো ?

ভোলার মা তার মুখের থমথমে ভাব নজর করে দ্যাখে, কিন্তু কিছুই বলে না। জিজ্ঞাসাও করে না যে তোমার জ্বর এসেছে নাকি ? কীসের প্রক্রিয়ায় এমন হয় সে ভালো করেই জানে। কথায় এর প্রতিকার নেই।

বলে, ভিতরে একটু আড়ালে গিয়া কমু কথাটা। আর কিছু না, একটা পরামর্শ দিবেন।

এত মানুষ থাকতে তার কাছে ভোলার মা পরামর্শ চায় ?

ঘরে এসো।

ঘরে ঢুকে মেঝেতে উবু হয়ে বসে ভোলার মা বলে, অন্য মাইন্‌ষেরে জিগাইতে সাহস পাইলাম না। কার মনে কী আছে কেডা কইবো ?

বলতে বলতে সযত্নে আঁচলের কোণে বাঁধা এক জোড়া সোনার মাকড়ি বার করে, সাধনার সামনে রেখে বলে, আর কিছু নাই, এইটুক সোনা সম্বল ছিল।

ভোলার মার কয়েকটা টাকার দরকার। মাকড়ি দুটো বাঁধা রাখবে। কার কাছে গেলে ভালো হয় যদি বলে দেয় সাধনা ? যার কাছে গেলে কাজও হবে, জিনিসটা গচ্ছিত রেখে ভোলার মাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে ?

বাঁধা রাখবে ? বেচবে না ?

না, বেচুম না। সবই তো বেইচা দিছি, এই একখান চিহ্ন রাখুম।

কীসের চিহ্ন ? প্রথম বয়সে ভালোবেসে ভোলার বাবা মাকড়ি দুটো কিনে দিয়েছিল তাকে।

আজও ভোলার মার কাছে মূল্যবান হয়ে আছে স্বামীর প্রথম বয়সের ভালোবাসা ! সে দিনগুলি স্বপ্নের মতো বহুদূর পিছনে পড়ে আছে—সোনার মাকড়ি দুটি তার বাস্তব প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে মিথ্যা স্বপ্ন নয়, সত্যই একদিন জীবনে এসেছিল সেই দিনগুলি !

কী ভাবেন ?

সাধনা লজ্জা পায়—নিজের কাছে। সে-ই ভোলার মার অতীত স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল।

আমার টাকা নেই।

আপনে যদি না পারেন, কইয়া দ্যান না কার কাছে যামু ?

তাই বা কার নাম করি বলো ? কে নেবে কে নেবে না—

ভোলার মা চুপ করে থাকে।

দু-একজনকে বলে দেখতে পারি।

বৈকালে আসুম ?

এসো।

ভোলার মা মাকড়ি দুটি বাড়িয়ে দেয়। সাধনা আশ্চর্য হয়ে বলে, রেখে যাবে ?

যারে কইবেন, জিনিসটা দেখাইবেন না ?

ভোলার মা চলে যাবার পর সাধনা ধীরে ধীরে বুঝতে পারে সে কেন বিশেষ করে তার কাছে এসেছিল। ভোলার মা টের পেয়ে গেছে তার অবস্থা। সেও নামতে আরম্ভ করেছে ভোলার মার স্তরে, তাদের দুজনেরই অবস্থা খানিকটা ইতরবিশেষ।

সে তাই অনেকটা কাছের মানুষ ভোলার মার ! সে সহজেই বুঝবে ভোলার মার কথা, সহজেই অনুভব করতে পারবে মাকড়ি বাঁধা রেখে কটা টাকা পাওয়া তার কাছে কতখানি গুরুতর ব্যাপার ! অন্যে তো এতখানি মর্যাদা দেবে না ভোলার মার প্রয়োজনকে।

হয়তো গায়েই মাখবে না তার কথা। হয়তো সন্দেহ করবে নানারকম। আধঘণ্টা জেরা করে বলবে, তুমি অন্য কোথাও চেষ্টা করো !

তাই, আশা যদিও প্রায়ই তার কাছে ডিম রাখে, নানাকথা জিজ্ঞাসা করে এবং মাকড়ি বাঁধা রেখে টাকাও সে অনায়াসে দিতে পারে তাকে, তবু, আগে সে পরামর্শ চাইতে এসেছে সাধনার কাছে।

খেয়ে উঠে ঘরে তালা দিয়ে সাধনা বাসন্তীর কাছে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় তার ভাঙা হার, বলে, তুমি তো এমনি নেবে না হারটা, দোকানে যাচাই না করে ?

বাসন্তী বলে, নেয়া কি উচিত ? তুমিই বলো ভাই ? বেশি দিলে ভাববে দয়া করেছি, কম দিলে ভাববে ঠকিয়েছি।

তবে চলো দোকানে যাই, যাচাই করিয়ে আসি।

বাসন্তী গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা, তুমি আমি একলাটি যাব ? কিছু যদি হয় ?

সাধনা হেসে বলে, কী হবে। বাঘে খাবে ? পুরুষের চেয়ে মেয়েদের রাস্তায় ভয় কম, তা জানো ? তুমি যদি মিথ্যে করে একজনের নামে বলো, এ লোকটা অভদ্রতা করেছে, কেউ আর তার কথা কানেও তুলবে না, দশজনে মিলে মেরে তার হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

বাসন্তী মাথা নেড়ে বলে, সেটাই তো খারাপ। আমরা যেন মানুষ নই, ইয়ে ! রাস্তার মানুষের কাছেও আমরা আহ্লাদি।

দুপুরবেলার আলস্যে আর শৈথিল্যে যেন থইথই করছে বাসন্তী, দেখে মনে করা দায় যে, সেও আবার ভালো করে গা ঢাকে, উঠে চলে ফিরে বেড়ায়, সংসারে গিন্নিপনা করে। সে পছন্দ করে না, কিন্তু উপায় কী, পুরুষের কাছে মেয়েরা আহ্লাদি। খারাপ হলেও নিয়মটা মেনে নিয়ে সে দুপুরবেলা ঘরের কোণে একা থাকার সময়েও আহ্লাদি হয়েই আছে। যে ভূমিকা অভিনয় করতেই হবে বরাবর, দুদণ্ডের জন্য তার হাবভাব চালচলন ছাঁটাই করে রেখে তার লাভ কী ?

গা মোড়ামুড়ি দিয়ে হাই তুলে উঠে দাঁড়ায়। বলে, মানুষটা ফিরলে বলতে হবে তোমার সাথে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

মিছে কথা বলবে ?

মিছে কথা ? তোমার যেন সব তাতেই খুঁতখুতানি। মিছে কথা কী গো ? তোমার সাথে দুপুরবেলা বেরিয়েছিলাম এটুকু শুধু জানাব মানুষটাকে। সত্যি সত্যি তো বেরুচ্ছি তোমার সাথে।

যদি জিজ্ঞাসা করেন কোথা গিয়েছিলে, কেন গিয়েছিলে ?

ইস্ ! জিগ্যেস করলেই হল ! আমি কি বাঁদি নাকি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বলতে হবে ? বেরিয়েছিলাম, জানিয়ে দিলাম, ফুরিয়ে গেল। কোথা গেছিলাম, কী করেছিলাম, খুশি হয় বলব, খুশি হয় বলব না—জিগ্যেস করলেই বলতে হবে নাকি আমায় !

সাধনাকে খালি ঘরে একলা রেখে সে বাথরুমে যায়। আশার ঘরে এত দামি দামি জিনিস নেই, আশার বাক্সে এত টাকা আর গয়না নেই—আশা পারত না।

দুজনে বাসে চেপে গয়নার দোকানে যায়। মস্ত দোকান, সারি সারি কাঁচের শো-কেসে ঝলমল করছে হরেক রকমের গয়না। কত নাম, কত বৈচিত্র্য, কত রকমের রুচির কাছে কত ধরনের আবেদন। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে একটু ভয় ভয় করে, একটু ছমছম করে গা।

শত শত মেয়েলোকের মনপ্রাণ রূপযৌবন যেন রূপক হয়ে ঝলমল করছে শো কেসে।

৫

রাজীব বলে, আসুন রাখালবাবু, বসুন। একটা সিগারেট খান !

একটা টুল এগিয়ে দেয়। পার্টনার দীননাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, কী আশ্চর্য যোগাযোগ দেখুন মশাই, কাল দীনুর কাছে শুনলাম চাকরিটার খবর, আজ খেয়ে দেয়ে দোকানে বেরুব, স্ত্রী জানালেন আপনি নাকি চাকরি খুঁজছেন। ভাবলাম কী, এমন সুযোগ তো ছাড়া ঠিক নয়। একে প্রতিবেশী, তায় আবার গিন্নির বন্ধুর হাজব্যান্ড ! লাগিয়ে দিতে পারি তো আমায় পায় কে ? ঘরে খাতির, আপনাদের কাছে খাতির !

রাজীব একগাল হাসে।—আপনাতে আমাতে বেশি আলাপ হয়নি, স্ত্রীরা দুজনে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন।

অনর্গল কত কথাই যে বলে রাজীব পাঁচ-সাতমিনিটের মধ্যে ! বাড়িতে বাসন্তীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় ছাড়া তার গলা এক রকম শোনাই যায় না। বাড়িতে কম কথা বলাটা বোধ হয় বাইরে পুষিয়ে নেয় !

বলে, কিন্তু দাদা, যদি ফসকেই যায়, রাগ করবেন না যেন।

না না, রাগের কী আছে ? আমার জন্য চেষ্টা করেছেন এটা কী কম কথা হল !

যদি ফসকে যায় ! যদি ! চাকরি হওয়া সম্পর্কে এরা এতখানি সুনিশ্চিত যে না-হওয়াটা নিছক 'যদির' কথা ! আশায় বাখাল অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

দীননাথ বলে, তুমি তো একধার থেকে বকে চলেছ। কোথায় চাকরি কী চাকরি সে সব বিত্তান্ত বলো ভদ্দরলোককে ? ওঁরও তো পছন্দ-অপছন্দ আছে ?

সে তো তুমি বলবে।

দীননাথ অত্যন্ত শীর্ণ মানুষ। গায়ের হাড়গুলি যেন তার পাঞ্জাবি ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। কথা বলার সময় থেকে থেকে চোখ মিটমিট করে। রং খুব ফরসা। চেহারায় সে যেন একেবারে রাজীবের রূপধরা বিপরীত।

দীননাথ বলে, আপনি বন্ধু মানুষ, খুলেই বলি আপনাকে। আপিসটা আমার এক আত্মীয়ের। ব্যাপারটা হল কী জানেন, ইনকাম ট্যাক্সের চোটে তো আর করে খাবার পথ নেই মানুষের। কর্তাদের একটু কড়া দৃষ্টি পড়েছে এই আত্মীয়টির ওপর। কাগজে-কলমে একটা পোস্ট আছে—সেলস্

অর্গানাইজার। আপিস-টাপিসে আসেন না, ঘুরে ঘুরে সেল অর্গানাইজ করে বেড়ান আর মাসে মাসে পাঁচশো টাকা মাইনে নেন। বুঝলেন না ?

দীননাথ নিজের মনেই হাসে—নীরবে। শব্দ করে হাসাটা বোধ হয় তার আসে না।

বলে, তা এবার একবার মানুষটার সশরীরে হাজির হওয়াটা দরকার পড়ে গেছে। ওরা বলছে, তোমাদের এইটুকু কারবার, পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে সেলস্ অর্গানাইজার রেখেছ ? মজাটা দেখুন একবার। আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে অর্গানাইজার রাখি, আর হাজার টাকা দিয়ে রাখি, তোদের কীরে বাপু ? বাজার ধরতে লোকে গোড়ায় টাকা ঢালে না, লোকসান দেয় না ? কিন্তু তা বললে চলবে না, প্রমাণ দিতে হবে ওই পোস্টে সত্যি লোক আছে।

রাখাল চুপ করে শুনছিল। আশা ঘুচে যাওয়ায় সে স্বস্তি পেয়েছে। তার বদলে এবাব যেন রাজীব কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে মনে হয় !

রাখাল বলে, আমাকে ওই কাজে লাগাবেন ?

ঠিক ধরেছেন ! আপনার মতো লোক হলেই ভালো। অনেক কাল অন্য আপিসে কাজ করেননি, কেউ বলতে পারবে না আপনি এ পোস্টে ছিলেন না।

রাখাল মৃদু হেসে বলে, পাঁচশো টাকাই পাব তো আমি ?

দীননাথও মুচকে হেসে বলে, দু-একমাস পাবেন বইকী ! তবে কী জানেন, এ বাজারে পাঁচশো টাকা মাইনের লোক রেখে কি ব্যাবসা চলে ? পরে ওটা মিউচুয়ালি ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে। আপনারও যাতে সংসারটা চলে, কোম্পানিরও যাতে—বুঝলেন না ?

বুঝলাম বইকী ! পুরানো পে বিলে আমাকে সই করতে হবে তো ? পোস্টে যে নামে লোক আছে সে নামটাও নিতে হবে নিশ্চয় ?

দীননাথ নীরবে সায় দিয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে বলে, আপনার কোনো রিস্ক নেই। রাজীবের বন্ধু মানুষ আপনি, আপনাকে করে দিতে পারি কাজটা। গোড়ায় দু-তিনমাস ওই পাঁচশো টাকাই পাবেন, তারপর এ পোস্টটা তুলে দিয়ে অন্য একটা কাজ দেয়া হবে আপনাকে। ভেবেচিন্তে বলুন লাগবেন না কি। আরও একজন ক্যান্ডিডেট আছে, আজকেই একজনকে লাগিয়ে দেয়া হবে। বুঝলেন না ?

রাখাল লক্ষ করে যে রাজীবের মুখের ভাব একেবারে বদলে গেছে, রীতিমতো শঙ্কিত দৃষ্টিতে সে তার দিকে চেয়ে আছে। তার মনোভাব রাখাল অনুমান করতে পারে। চাকরিটার মধ্যে যে এত প্যাঁচ আছে এটা তার জানা ছিল না। এখন সে পড়ে গেছে মহা দুর্ভাবনায়। রাখালের ভালোমন্দের জন্য তার ভাবনা নয়, ভাবনা বাড়ির সেই মানুষটির জন্য, যার কথায় রাখালকে সে এই চাকরির খোঁজ দিয়েছে। রাখাল যদি মরিয়া হয়ে রাজি হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ফ্যাসাদে পড়ে, বাসন্তীর কাছে সহজে সে রেহাই পাবে না।

রাখাল মাথা নেড়ে বলে, না মশাই, এ কাজ আমার পোষাবে না।

রাজীব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে !

দীননাথ বলে, সে তো আপনার ইচ্ছা। তবে, আপনি হলেন আমাদের রাজীবের বন্ধু, ভেতরের কথা সব খুলে বলেছি আপনাকে। দেখবেন যেন—

রাখাল বলে, সে জন্য ভাববেন না। তাছাড়া, সত্যি সত্যি আসল কথা কিছুই বলেননি আমায়। কার ব্যাবসা, কোন আপিস আমি কিছুই জানি না। ইচ্ছা থাকলেও আমি কোনো ক্ষতি করতে পারব না।

দীননাথ গম্ভীর হয়ে বলে, দাদা, ইচ্ছা থাকলে সবাই ক্ষতি করতে পারে।

কে জানে। তবে আমার যখন ইচ্ছাই নেই তখন আর কথা কী।

রাজীব বলে, এ সব ভেবো না দীনু, রাখালবাবু খাঁটি মানুষ। আমি জানি তো ওঁকে।

রাখাল বিদায় নিলে তার সঙ্গে রাস্তায় নেমে গিয়ে রাজীব অপরাধীর মতো বলে, কিছু মনে করলেন না তো রাখালবাবু ?

চাকরি যেন গাছের ফল ! পচে নষ্ট হয়ে যাবে বলে মানুষ যেন প্রতিবেশীদের যেচে যেচে চাকরি বিতরণ করে !

এ কথা বলায় সাধনা চটে গিয়েছিল। কারও কোনো মতলব না থাকলে, ভিতরে কোনো প্যাঁচ না থাকলে চাকরি যেন এ ভাবে হাওয়ায় উড়ে এসে হাজির হয় বেকারের কাছে, ছাঁটাই বেকারি দুর্ভিক্ষের অভিশাপে কানায় কানায় ভরা এই দেশ।

রাজীবের মতলব ছিল শুধু বউয়ের একটু মন জোগানো। তাতেই যেন রাজনীতি উলটে গিয়েছে সংসারের ! এ ভাবে যে চাকরি হয় না বেকারের এ সত্যটা মিথ্যা হয়ে গেছে। সাধনা চায়, তাই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটতে বাধ্য। তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে খাতির করার জন্যই অঘটন ঘটতে হবে সংসারে।

সাধনার প্রতিটি কথা, প্রতিটি ব্যবহার আজ নতুন হতাশা এনে দিয়েছে রাখালকে। সাধনা তার সাধারণ বাস্তববুদ্ধি হারাতে বসেছে ভেবে তার ভয় হয়েছিল, আসলে এ বুদ্ধি কোনোদিনই ছিল না তার।

তার স্বভাবে একটা ধৈর্য আর সংযম ছিল, সাধারণ সহজ অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার একটা ভাসাভাসা বাস্তববোধ ছিল। তার বেশি কিছু নয়। সাধারণ হিসাবে বুদ্ধিমতী মেয়ে, সেই সঙ্গে খানিকটা ধৈর্য আর সংযমের সমাবেশ—এটাকেই সে মনে করেছিল সচেতন বাস্তববোধ। দুঃখের দিন শুরু হবার পর এটাকেই সে ধরে নিয়েছিল পরম আশীর্বাদ বলে।

ভেবেছিল, যেমন বিপাকেই পড়ুক আর যত মারাত্মক হোক অবস্থা, শেষ পর্যন্ত দুর্দিন সে পার হয়ে যাবে। সাধনা আরও শোচনীয় করে তুলবে না অবস্থা, পদে পদে ব্যাহত করবে না তার লড়াই, সবটুকু জীবনীশক্তি সে কাজে লাগাতে পারবে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে।

বরং নানাভাবে তাকে সাহায্যই করবে সাধনা। শুধু সেবা করে ভালোবেসে নয়, সব কষ্ট আর জ্বালা লুকিয়ে সব সময় হাসিমুখ দেখিয়ে নয়—ও সব অতটা দরকারি মনে করেনি রাখাল। বাস্তব-বুদ্ধি দিয়ে সাধনা বাস্তব অবস্থা বুঝে তার সঙ্গে চলতে পারবে—এটাই ছিল তার সবচেয়ে বড়ো ভরসা। কদিন ধরে ভাঙতে ভাঙতে আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সে ভরসা। সে রকম বাস্তববুদ্ধিই নেই সাধনার, সে করবে স্রোতে গা ভাসিয়ে ধ্বংসের দিকে চলার বদলে অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে রেখে বাঁচার চেষ্টায় তাকে সাহায্য !

একটা গোড়ার হিসাবেই তার ভুল হয়ে গেছে। বড়ো মারাত্মক ভুল।

গোড়া থেকে খেয়াল রাখলে ধৈর্য আর সংযমের সীমা পার হয়ে সাধনাকে সে নতুন এক বিপদ হয়ে উঠতে দিত না, অন্যভাবে সামলে চলতে পারত এদিকটা। গোড়া থেকে জানা থাকলে আজ সাধনার উপর সব আস্থা হারিয়ে নিজেকে এত বেশি নিরুপায় অসহায় মনে হত না।

দিনের পর দিন কী শক্তিটাই তাকে ক্ষয় করে আসতে হয়েছে দেহ আর মনের। প্রথম থেকে না জেনে আজ এই অসময়ে জানা গেল সাধনা তার সাথি নয়, বোঝা।

চায়ের কাপ সামনে রেখে রাখাল ভাবে। নতুন করে আবার হিসাব মেলাবার চেষ্টা করে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কোনো লাভ নেই, তার চেয়ে এক কাপ চায়ের দাম দিয়ে চায়ের দোকানে আধঘণ্টা বসা ভালো। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এটা রাখাল জেনেছে।

দেয়ালে গত বছরের ক্যালেন্ডারের একটা ছবি ঝুলানো। অতি সুন্দর ছবি বলে ক্যালেন্ডার শেষ হয়ে গেলেও ছবিটা টাঙানো আছে। বড়োই জনপ্রিয় হয়েছে ছবিটি। বনবাসিনী স্বামীসোহাগিনি সীতা ধনুকধারী সন্ন্যাসী রামের অঙ্গলগ্না হয়ে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অদূরে সোনার হরিণকে। ছবির দিকে তাকানোমাত্র বোঝা যায় সীতার কী আবদার—জগৎ সংসার চুলোয় যাক, সোনার হরিণ তার চাই !

রাজার মেয়ে আর রাজার যে ছেলে রাজা হবে তার বউ। কত সোনার কত গয়নাই না জানি সীতার ছিল ! সব গয়না ফেলে, গায়ের গয়নাগুলি পর্যন্ত খুলে রেখে বনে যেতে মায়া হয়নি সীতার। কিন্তু বনের মধ্যে সোনার হরিণ দেখেই মেয়েদের চিরন্তন সোনার লোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার অবুঝ আবদারের কাছে হার মানতে হয়েছে রামের।

গয়না ফেলে আসতে মায়া হয়নি, সে কি এই জন্য যে চোদ্দো বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে ? চোদ্দো বছর পরে রাম আবার রাজা হলে ওই রেখে যাওয়া সোনার গয়নার সঙ্গে আরও কত গয়না যোগ হবে সীতার !

নয়তো নতুন প্যাটার্নের নতুন একটা গয়নার মতো সোনার একটা হরিণ দেখে এমন মোহ কি জাগতে পারে সীতার, গায়ের গয়নাগুলি পর্যন্ত যার তুচ্ছ করে ফেলে আসতে একবার ভাবতে হয়নি ?

চা জুড়িয়ে যায়। ধীরে ধীরে মাথাটা বেঞ্চের উপর নেমে আসে রাখালের। চায়েব জন্য পয়সা দিতে হবে। চায়ের কাপে একটা চুমুক না দিয়েই বেচারি গভীর ঘুমের কবলে গিয়ে পড়েছে।

তাকে যে চা দিয়েছিল সেই ছোকরাই একটু ইতস্তত করে আস্তে ডাকে, বাবু—

দোকানের মালিক গিরীন সামনে ছোট্ট টেবিলটিতে ক্যাশ বাক্সো রেখে নিজের সাত বছরেব পুরানো মোটা কাঠের টুলে বসে চারিদিকে শ্যেনদৃষ্টি পেতে রাখে। সে চাপা গলায় ধমকে ওঠে, এই চোপ, ডাকিস নে। খবরদার বলে দিলাম।

ঘণ্টু কাছে সরে এসে বলে, মোটে এক কাপ চা নিয়েছে—

হল বা এক কাপ চা, নিয়েছে তো !

ঘণ্টু চোখ বুজে একটা অদ্ভুত মেয়েলি ভঙ্গি করে। ছেলেটার মেটে মেটে ফরসা রং, মুখে বসন্তের দাগ, গোলগাল চেহারা। ঘণ্টুর চালচলনে খানিকটা মেয়েলি ভাব আছে, বউ-বউ ভাব ! গলায় তার একটি সোনার চেন হার।

গিরীন বলে, আরে শালা, খদ্দের হল খদ্দের। খাতির পেলে আরাম পেলে তবে তো একদিনের খদ্দের দশদিন আসবে। ঘুমোচ্ছে ঘুমোক না বাবু, ঘুম ভেঙে খুশি হবে। ভাববে যে না, এ দোকানটা ভালো।

বলে গিরীন ঘণ্টুর গালটা টিপে দেয়।

বেঞ্চ থেকে যখন সে মাথা তোলে বেলা পড়ে এসেছে।

ঘণ্টু বলে, রাতে ঘুমোননি বাবু ?

রাখাল নীরবে চায়ের দামটা তার হাতে দেয়। অপরাধীর মতোই তাড়াতাড়ি চায়ের দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এক কাপ চায়ের দাম দিয়ে এতক্ষণ দোকানে আশ্রয় নিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ার মতো নিরাপদ আশ্রয় !

পথে অসংখ্য মানুষ। দোকানে লোক কম, কাপড়ের দোকানেও—যত ভিড় গিয়ে যেন জমেছে রেশনের কাপড়ের দোকানে। সাধনাকে এ মাসে একখানা কাপড় দিতেই হবে। আগেকার কখানা ভালো কাপড় ছিল বলে এ পর্যন্ত কোনোমতে চলেছে, আর চালানো অসম্ভব। সেলাই করে চালিয়ে দেবারও একটা সীমা আছে, যার পরে আর চলে না, নিজে থেকে কাপড় ফেঁসে যায়।

তার নিজের ? তাকে তো বেরোতে হবে টুইশনি করতে, চাকরি খুঁজতে। তার নিজেরও একেবারে অচল অবস্থা। কী দিয়ে কী ভাবে কী করবে ভেবেও কূল পাওয়া যায় না।

কিন্তু সাধনা এদিকে যাবেই তার ভাগনির বিয়েতে, নতুন হার গলায় পরে যাবে ! নিজের কানপাশা রেবাকে উপহার দিয়ে সম্মান বজায় রাখবে।

তীব্র জ্বালাভরা হাসি ফোটে রাখালের মুখে।

প্রভাকে পড়াতে যেতে আবও প্রায় দুঘণ্টা দেরি। রাস্তায় রাস্তায় কাটাতে হবে এ সময়টা। আরও একটা টুইশনিও যদি জোটাতে পারত !

পথেই সময় কাটায়। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় ছোটো পার্কটার বেঞ্চে বসবার জায়গার খোঁজে—বেঞ্চ খালি নেই। মানুষ বেড়াতে বেরিয়ে বেঞ্চ কটা দখল করেনি। যারা বসেছে তারই মতো তাদেরও দরকার হয়েছে কোথাও একটু বসবার। এটা বোঝা যায়।

এক বাড়ির রোয়াকে বসতে পায়। তাও নির্বিবাদে নয় !

কী চান ?

কিছু না। একটু বসছি।

জানালায় উঁকি দেওয়া প্রৌঢ় মুখটি খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আড়ালে সরে যায়।

কয়েক হাত তফাতে ফুটপাতে ঘোমটা টেনে একটি বউ বসে আছে। তার সামনে বিছানো ন্যাকড়ায় পড়ে আছে একটি ঘুমন্ত কঙ্কাল শিশু। বউটির সর্বাঙ্গ ঢাকা, সেলাই করা শতজীর্ণ ময়লা কাপড়েই ঢাকা, শুধু ডান হাতটি বার করে পেতে রেখেছে নিঃশব্দ প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তার সামনে পথ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি মিছিল পার হয়ে যায়। তিনটিই চলেছে একদিকে। মেয়েপুরুষ ছেলেমেয়ের দুটি মিছিল, একটি মজুরের। উদ্‌বাস্তুদের মিছিল, ছাত্রছাত্রীর মিছিল, ধর্মঘটি মজুরের মিছিল। হাতে হাতে প্ল্যাকার্ডে লেখা দাবিগুলি উঁচু করে তুলে ধরে একসঙ্গে মুখে দাবি ঘোষণা করতে করতে চলেছে মিছিলগুলি। রাখাল ভাবে, প্ল্যাকার্ডে লিখে আর মুখে দাবি ধ্বনি তুলে ঘোষণার বোধ হয় দরকার হয় না আর। সব মানুষের আজ কীসের অভাব আর কী কী চেয়ে মানুষ মিছিল করে কারও কী অজানা আছে !

ঘোমটা তুলে দিয়ে তিনবারই বউটি যতক্ষণ দেখা যায় মিছিল দ্যাখে, তারপর আবার ঘোমটা টেনে ডান হাতটি তেমনিভাবে একটু বাড়িয়ে ধরে বসে থাকে। মুখ দেখে বোঝা যায় বয়স তার সাধনার চেয়েও কম হবে।

এই বউটিকে যদি সাধনা একবার দেখত !

কিন্তু সত্যই কিছু লাভ হত কি দেখে ? এই বউটিকে না দেখুক, এরই মতো অভাগিনি বউ আজ পথেঘাটে ছড়িয়ে আছে দেশের, তাদের দু-চারজনকে কি আর দ্যাখেনি সাধনা ?

সাধনা কি জানে না দেশের বেশির ভাগ লোকের আজ কী অবস্থা এবং সে জন্য নিজেরা কেউ তারা দায়ি নয় ?

কিন্তু দেখেও সাধনা দেখবে না, জেনেও সে জানবে না। তাকেই সে দায়ি করে রাখবে সব দুর্ভাগ্যের জন্য। সে বুঝবে না যে ঘরের চাপে বাইরের চাপে রাখাল যদি পঙ্গু হয়ে যায় তারপর হয়তো তারও একদিন এই বউটির দশাই হবে।

প্রভা বলে, জ্বর নিয়ে পড়াতে এলেন নাকি ?

জ্বরের মতো হয়েছে একটু।

তবে এলেন কেন ?

রাখাল মনে মনে বলে, এলাম কেন ? না এলে তোমরা যে রাগ করবে !

মুখে বলে, খানিকক্ষণ পড়িয়ে যাই। একেবারে ফাঁকি দিলে চলবে কেন ?

প্রভা মুখ ভার করে বলে, ভাগ্যে আমি আপনাকে মাইনে দিই না—টাকাটা বাবার। নইলে সত্যি একবার চটতে হত। মুখের ওপর এমন করে কাউকে ধিক্কার দিতে আছে ?

ধিক্কার কীসের ?

প্রভা একটু হেসে বলে, আমরা জন্ম জন্ম দাসীর জাত, মেয়েমানুষ। ধিক্কার দেবার এ কৌশল আমরা জানি। জ্বর গায়ে রাঁধতে গিয়ে আমরা যখন বলি, না রেঁধে উপায় কী, সবাই খাবে কী—তখন সেটা পুরুষদের ধিক্কার দিয়েই বলি।

তোমাকে রাঁধতে হয় নাকি ?

বলেই রাখাল গুম খেয়ে যায়। আগের বার ধিক্কার না দিয়ে থাকলেও এ কথাটা রীতিমতো খোঁচা দেওয়া হয়ে গেছে। বড়োলোকের মেয়েকে এ প্রশ্ন করার একটাই মানে হয।

মুখখানা সত্যই ম্লান হয়ে যায় প্রভার। এত উজ্জ্বল তার গায়ের রং যে মুখে একটু মেঘ ঘনালেই মনে হয় দুর্যোগ ঘনিয়েছে।

রাখাল আবার বলে, কিছু মনে কোরো না প্রভা।

প্রভা বলে, কেন মনে করব না ? আমার বাবা কি খুব বেশি বড়োলোক ? বারোশো টাকা মাইনে পান। আজকের দিনে বারোশো টাকা পেলে কেউ বড়োলোক হয় ? টাকাব ভাবনায় রাত্রে বাবার ঘুম হয় না তা জানেন ?

রাখাল বিব্রত হয়ে বলে, আমি এমনি বলেছি কথাটা। একটা রাঁধুনি তো আছে, তোমরা না রাঁধলেও চলে, এর বেশি কিছুই বলতে চাইনি।

প্রভা কিন্তু এত সহজে তার্কে রেহাই দিতে রাজি নয়।

সে ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে, তা না চাইলেও এটা সত্যি যে আমাদের সম্পর্কে আপনাদেব অনেক ভুল ধারণা আছে। রাঁধতে হয় না বলেই কি আমি স্বাধীন ? যাদের রাঁধতে হয়, আমিও তাদেরই দলের। খানিকটা আরামে থাকি, এইটুকু তফাত।

রাখাল আর কথা কয় না। এবার কিছু বলা মানেই ছাত্রীর সঙ্গে তর্কে নামা। প্রভা নতুন থিয়োরি শিখেছে, সবটাই অতি রোমাঞ্চকর। তফাত থাকলেও যে রাঁধুনি রাখে পয়সা দিয়ে সে সমান হয়ে গিয়েছে দুবেলা যাকে পয়সার জন্য পরের বাড়ি হাঁড়ি ঠেলতে হয় তার সঙ্গে—এই অতি মনোরম সিদ্ধান্ত সে আবিষ্কার করেছে একেবারে অন্যস্তরের অন্য এক সত্য থেকে। বড়ো ধনী ছাড়া বড়ো ধনিকের শাসনে সবাই এ দেশে নিপীড়িত। দুর্মূল্য খোলা বাজার আর চোরাবাজার শুধু তার বাবার মতো বারোশো টাকা আয়ের মানুষকে কেন আয যাদের আরও অনেক বেশি তাদেরও জোরে আঘাত করেছে—মাঝারি ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত আজ বেসামাল হবার উপক্রম। ধনিক শাসনের অবসান শুধু গরিবের নয়, এদেরও স্বার্থ।

এ পর্যন্ত অবশ্যই সত্য কথাটা। কিন্তু এই সূত্র ধরেই প্রভা যখন তাদের সঙ্গে সাধনাদের তফাতটা, অমিমূল্যেও যারা আরাম-বিলাস কিনতে পারে তাদের সঙ্গে যাদের স্রেফ ভাতকাপড়ের টানাটানি তাদের তফাতটা নিছক আরামে থাকা না থাকায় দাঁড় করায় তখন গা জ্বালা করারই কথা !

আরামের অভাব আর আসল অভাব প্রভার কাছে এক !

প্রভা টেবিলের বইগুলি ঠেলে সরিয়ে দেয়। বলে, এ পড়া আজ পড়ব না। চুপ করে গেলেন কেন জানি। ভুল কথা কী বললাম আজ তাই পড়ান আমাকে। বেশ, আপনার কথাই ঠিক—

আমি তো কিছুই বলিনি !

চুপ করে থাকা মানেই বলেছেন। আপনি ভাবছেন, গরিবের মেয়ের সঙ্গে আমার তুলনা ! তারা ভালো করে খেতে পরতে পায় না আর আমি দামি শাড়ি পরি, মাছ দুধ খেয়ে মোটা হই !

প্রভার গড়ন সত্যই একটু মোটাসোটা ধরনের। তাই নিজের কথায় নিজেই সে একটু মুচকে হাসে।

কিন্তু ভালো খেতে পরতে পাই বলেই কি আমি পুরুষের অধীন নই, পুরুষের সম্পত্তি নই ? আমার বেলা ভিন্ন নিয়ম ? গরিব ঘরের মেয়েদের বেলা স্পষ্ট চোখে পড়ে, আমাদের বেলা আড়ালে থাকে এইমাত্র।

এবার তার মনের গতি ধরতে পেরে রাখাল হেসে বলে, তুমি ঠিক উলটোটা বলছ। ওটা বরং গরিবের ঘরেই খানিক আড়াল থাকে। মেয়েরা যে পুরুষের সম্পত্তি বড়োলোকের ঘরেই এটা সব দিক থেকে চোখে পড়ে। সাজিয়ে গুজিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে আদরে আহ্লাদে যে রাখে, তার মানেই তো তাই। নিজের সম্পত্তি তাই এত আদর এত যত্ন। গরিবের ঘরেই হঠাৎ ধরা যায় না। মেয়েরা যেরকম খাটে আর কষ্ট করে তাতে মনে করা চলে তারা কারও সম্পত্তিই নয়, বেওয়ারিশ জিনিস। নিজের সম্পত্তিকে কেউ এত খারাপ ভাবে রাখে ?

প্রভা দমে গিয়ে বলে, তাইতো ! এটা তো ভাবিনি ? আমি ভাবতাম মালিক মানেই যে কষ্ট দেয়, অত্যাচার করে !

যেমন মিলের মালিক ?—রাখাল হাসে, মালিক কি মিলের ওপর অত্যাচাব করে ? মিলটার জন্য তার যত দরদ ! অত্যাচার করে মিলে যারা খাটে তাদের ওপর—কত কম পয়সায় যত খাটুনি আদায় করতে পারে।

রাখালেব চা আর খাবার আসে। ভালো দামি খাবার, ডিমের মামলেট।

জ্বরের ওপর খাবেন ?

রাখাল খেতে আরম্ভ করে বলে, জ্বর নয়, জ্বর ভাব। খেতে না পেলেই সেটা হয়।

প্রভা নীরবে তার খাওয়া দ্যাখে। মনের মধ্যে তার পাক দিয়ে বেড়ায় একটা প্রশ্ন—বেকার জীবনের দারিদ্র্য কি পরিবর্তন এনেছে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কের ? যদি এনে থাকে, সে পরিবর্তনের মর্মকথা কী ? জানে যে দারিদ্র্য রসকষ শুষে নেয় জীবনের, জ্বালা আর অশান্তি রুক্ষতা এনে দেয় মাধুর্য কোমলতার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে। কিন্তু ঠিক কীবকম হয় তার ভিতরের রূপটা ? পরস্পরের সম্পর্কে মিষ্টতার অভাব ঘটে, কারণে অকারণে তিক্ততার সৃষ্টি হয়—কিন্তু এ সব সত্ত্বেও পরস্পরকে গ্রহণ তো তাদের করতে হয়। মানিয়ে চলতে হয় দুজনকে, মেনে নিতে হয় পরস্পরকে। কেমন হয় তাদের এই আত্মীয়তা ? সব কিছু সত্ত্বেও আপন হওয়া ?

নিস্তরঙ্গ ভোঁতা হয়ে যায় ? যান্ত্রিক হয়ে যায় ? বাস্তব বাঁধনে বাঁধা নিরুপায় দুটি নরনারীর স্থূল সম্পর্ক দাঁড়ায় ?

অথবা দুঃখকষ্ট হতাশার প্রতিক্রিয়ায়, সংঘর্ষের জ্বালায় স্থূল বাস্তব আত্মীয়তাটুকু হয় উগ্র, অস্বাভাবিক, রোমাঞ্চকর ?

কথাটা এমন জানতে ইচ্ছা করে প্রভার !

কিন্তু এ কথা তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না রাখালকে। একজনকে জিজ্ঞাসা করে বোধ হয় জানাও যায় না এ সব কথা।

অন্য আরেকটা প্রশ্ন ছিল প্রভার। যে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সে প্রস্তুত করছে তারই সম্পর্কে।

ভেবেচিন্তে এ বিষয়েই সে প্রশ্ন করে। বলে, আচ্ছা, স্বাধীনভাবে যে মেয়েরা রোজগার করে তারা কি সত্যিকারের স্বাধীন ?

এ প্রশ্নের মানে রাখাল জানত। এটা প্রভার ব্যক্তিগত প্রশ্নও বটে।

স্বাধীনভাবে রোজগার করে ? কোন দেশের মেয়ের কথা বলছ ? এ দেশে পুরুষেরা স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পায় না, মেয়েরা কোথা থেকে সে সুযোগ পাবে ? রোজগার করে এই পর্যন্ত। এ ধারণাই বা তুমি কোথায় পেলে নিজে রোজগার করলেই মানুষ স্বাধীন হয় ? পুরুষরা অন্তত তাহলে স্বাধীন হয়ে যেত ? সত্যিকারের স্বাধীনতা অনেক বড়ো জিনিস।

মেয়েদের চাকরি-বাকরি করার তো তাহলে কোনো মানে নেই ?

মানে আছে বইকী ! মস্ত মানে আছে। এ দেশে বেশ কিছু মেয়ে ঘরের কোণ ছেড়ে রোজগার করতে বেরিয়েছে, এ একটা কত বড়ো পরিবর্তনের লক্ষণ আমাদের চেতনার। এটা কী সোজা কথা হল ? সব চেয়ে বড়ো কথা কী জানো ? যারা রোজগার করতে ঘর ছেড়ে বেরোয়নি তারাও এটা মেনে নিয়েছে। মেয়েমানুষ আপিস করে শুনে ঘরের কোনার ঘোমটা-টানা বউও চোখ বড়ো বড়ো করে গালে হাত দেয় না। সেকেলে গোঁড়া পুরুষ এটা পছন্দ না করলেও সায় দিয়েছে—আমার ঘরে ও সব চলবে না, তবে সমাজে চলছে, চলুক। পুরুষের অ্যাপ্রুভড্ উপায়ে মেয়েরা রোজগার করুক এটা চালু হয়ে গেছে সমাজে—কিছু মেয়ের চাকরি করার চেয়ে এটাই বড়ো কথা।

পুরুষের অ্যাপ্রুভড্ উপায়ে ?

চায়ের কাপে শেষ চুমক দিয়ে রাখাল স্থিরদৃষ্টিতে প্রভার মুখের দিকে চেয়ে বলে, তাছাড়া কী উপায় আছে ? সামাজিক অনুমোদন মানেই পুরুষের অনুমোদন। এটা হল চাকবি-বাকরির বেলায়। অন্যভাবেও মেয়েরা রোজগার করে—সমাজে সে নোংরা উপায়টাতে সায় দেয় না, সয়ে যায়। কিন্তু ও সব কারবারও পুরুষরাই চালায়, তারাই কর্তা।

প্রভা কাতরভাবে বলে, এতকাল নারী আন্দোলন করে আমরা তবে করলাম কী ?

রাখাল আশ্বাস দিয়ে বলে; অনেক কিছু করেছ। সারা দেশের মুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছ। মেয়েপুরুষের আসল স্বাধীনতার লড়াইকে জোরালো করেছ। তবে শুধু মেয়েদের জন্য মেয়েদেরই পৃথক নিজস্ব নারী আন্দোলন তো নিছক সস্তা শখের ব্যাপার—মেয়েরাও প্রাণের জ্বালায় যাতে আসল বড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে না বসে সে জন্য তাদের স্বার্থে ভিন্ন করে নিয়ে একটা বেশ ঝালঝাল টকটক মিষ্টিমধুর আন্দোলনে তাদের মাতিয়ে দেওয়া। পুরুষেরা মেয়েদের দাসী করে রেখেছে, এই বলে মেয়েদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার মানেই হচ্ছে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মতো পুরুষ-রাষ্ট্র নারী-রাষ্ট্র চাওয়া।

রাখাল একটা সিগারেট ধরায়। এই একটা সিগারেটই তার সম্বল ছিল।

বলে, পুরুষের বিরুদ্ধে মেয়েদের কোনো লড়াই নেই। সব লড়াই অবস্থা আর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো দেশে যদি একজন বেকার থাকে, সে দেশে একটি মেয়ের সাধ্য নেই স্বাধীন হয়। সকলের ভাতকাপড় পাওয়া আর মেয়েদের স্বাধীন হওয়া—হলে দুটোই একসাথে হবে নইলে কোনোটাই হবে না।

প্রভা সংশয়ের সঙ্গে বলে, আপনি ধাঁধায় ফেললেন। মেয়েরা এ রকম পদানত হয়েই থাকবে, তার মানে আন্দোলন করবে শুধু পুরুষেরা ?

রাখাল খুশি হয়ে বলে, ভাগ্যে আজ পড়তে না চেয়ে তর্ক পড়েছ প্রভা। নইলে একটা ভুল ধারণা থেকে যেত তোমার সম্পর্কে, ভাবতাম তুমি বুঝি শুধু বই মুখস্থ আর পরীক্ষা পাশ কর।

প্রভা খুশি হয়ে মাথা নত করে টেবিলে আঙুল দিয়ে লাইন টানে।

রাখাল বলে, কিন্তু এত মেয়ে লড়াই করছে, গুলির সামনে পর্যন্ত বুক পেতে দিচ্ছে, তবু তোমার এ ধাঁধা কেন ?

সে তো শুধু কিছু অগ্রণী মেয়ে।

অগ্রণী হয় কারা ? যারা পিছিয়ে আছে তাদের যারা এমনভাবে ছাড়িয়ে গেছে যে কোনো মিল নেই, সম্পর্ক নেই ? একজনও যখন এগিয়ে যায় বুঝতে হবে পিছিয়ে থাকলেও দশজনের মধ্যে সাড়া এসেছে, সমর্থন এসেছে—সে তারই প্রতীক। নইলে সে কী নিয়ে কীসের জোরে এগোল ? পুরুষেরা এগিয়ে গেলে মেয়েরাও এগিয়ে যাবে। মেয়েদের দমিয়ে রেখে বাদ দিয়ে কি পুরুষের লড়াই চলে ?

প্রভা তবু ছাড়বে না। মৃদু হেসে বলে, লড়াই পুরুষের, তবে মেয়েদেরও দরকার বলে দয়া করে সঙ্গে নেয়। আমিও এই কথাই বলছিলাম।

রাখালের মুখেও হাসি ফোটে।—দয়া মায়া সমাজ তো মেয়ে-পুরুষ সব জড়িয়ে দিচ্ছ কিনা, তাই এই ধাঁধাও কাটবে না। দয়া ? দয়া আবার কীসের ? অবস্থা পালটে দিয়ে যে পুরুষ লড়াই করছে, অবস্থাটা কী আর কেন না জেনেই সে লড়াই করছে ? মেয়েপুরুষের বর্তমান সম্পর্কটাও তো বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আরেকটা অভিশাপ—পুরুষের পক্ষে অভিশাপ, সে তা জানে। এ অভিশাপ দূর করাও তার কাজ।

একটু থেমে রাখাল আবার বলে, স্বাধীনতার লড়াইয়ের চেতনা যে স্তরেই থাক, এ চেতনাটাও থাকে। না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত জাগে না জাগে না কবে লেখা হয়েছিল মনে আছে ?

প্রভা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কোনো একটা প্রশ্ন করবে কী করবে না ভেবে সে ইতস্তত করছে বুঝে রাখালও চুপ করে অপেক্ষা করে।

একটা কথা বললে রাগ করবেন ?

কথাটা না শুনে কী করে বলি ?

যে কথাই হোক, আগে বলুন রাগ হলেও রাগ করবেন না। একটিবার নয় রাগ না করার চুক্তিতে একটা কথা আমায় বলতেই দিলেন !

বেশ তাই হবে, বলো।

প্রভা গম্ভীর হয়ে মুখের ভাবে গুরুত্ব আনে। জোর করে সোজা তাকিয়ে থাকে রাখালের চোখের দিকে।

আপনি এত বোঝেন। সাধনাদি কেন ঘর ছেড়ে বেরোন না ? শুধু সংসারটুকু নিয়ে থাকেন ?

এ রকম প্রশ্ন রাখাল কল্পনাও করেনি। মেয়েপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে সাধারণ আলোচনা থেকে প্রভা একেবারে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসবে এটা সত্যই সম্ভব ছিল না তার পক্ষে ! রাগ হয় প্রচণ্ড, মুখ তার লাল হয়ে যায়। দেখে মুখখানা ম্লান হয়ে আসে প্রভার।

সামলে যায় রাখাল। রাগ করবে না কথা দিয়েছে বলেই শুধু নয়, প্রভা যে তাকে খোঁচা দিতে বা অপমান করতে কথাটা জিজ্ঞাসা করেনি এটা খেয়াল করে। মনের মধ্যে এ ধাঁধাটাও পাক খাচ্ছিল তার। সরলভাবে তাকেই জিজ্ঞাসা করে বসেছে এর সমাধান কী।

সাধনাদিকেই জিজ্ঞাসা করলে পারতে প্রভা।

তিনি তো বুঝিয়ে দিতে পারবেন না।

তুমি নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলে। তোমার সাধনাদি বুঝিয়ে দিতে পারবে না সে কেন ঘরের কোনায় দিন কাটায়। তার মানেই সে এ সব বোঝে না।

আপনি বুঝিয়ে দেন না ?

রাখাল ম্লান হেসে বলে, বুঝবে কেন ? এ সব বুঝিয়ে দেবার চুক্তিতে তো তাকে বিয়ে করিনি !

এটা রাগের কথা রাখালের।

বাড়ি ফেরার পথে রাখালেরও মনে হয়, তার কথায় একটা ফাঁকি আছে।

সত্যই সে কি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে সাধনাকে যে তাকে আর তার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আর তার একার নেই ? এ জন্য নেই যে এটা তার অসাধ্য হয়ে গেছে এমনি আজ দুরবস্থা দেশের ?

না, আন্তরিকভাবে বাস্তব উপায়ে এ চেষ্টা সে কোনোদিন করেনি।

কথাই শুধু বলেছে নানারকম। দেশবিদেশের কথা শুনিয়েছে সাধনাকে, দেশের আজ কেন এমন ভয়ংকর অবস্থা সেটা ব্যাখ্যা করেছে অনেকটা নিজের বেকারত্বের সাফাই হিসাবে। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে নিজের দোষে সে বেকার নয়, সাধনা যে কষ্ট পাচ্ছে সেটা তার অপরাধ নয়, দেশের মানুষ যাদের বিশ্বাস করেছিল, যারা সত্যিকারের মুক্তি এনে দেবে ভেবেছিল, এটা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল।

বেঁচে থাকার ও বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সে ভাগাভাগি করতে চায়নি সাধনার সঙ্গে। যেভাবে পারে একা সে ভরণ-পোষণ করবে তাকে আর তার আগামী সন্তানদের, নীড় বেঁধে নিয়ে রক্ষা করবে নেই নীড়, বিয়ের এই চুক্তিটা নিজেই সে পালন কবতে চেয়েছে প্রাণপণে ! অক্ষমতার জন্য তাই অবস্থার অজুহাত দিয়ে, নিজের নির্দোষিতার কৈফিয়ত দিয়ে শুধু মান বাঁচাতে চেয়েছে সাধনার কাছে।

আসলে আজও তার মন মজে রয়েছে আগের দিনের ফেলে আসা জীবনধারাব রসে। চাকরি করে দুটো পয়সা এনে ছোটো একটা ঘর বেঁধে সীমাবদ্ধ জীবনের ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ নিয়ে দিন কাটাবার অভ্যাসে আজও নেশার মতো তাকে টেনেছে, আজও সে জের টেনে চলতে চায় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সেই অভ্যাসের !

জানে যে জগৎ পালটে যাচ্ছে, তাদের ঘর-সংসার ভেঙে দিচ্ছে সেই পরিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে, শেষ হয়ে আসছে তাদের মতো মানুষের পুরানো ধাঁচেব জীবনযাত্রা। আর ফিরে আসবে না তাদের আগেকার জীবন।

তবু, জেনেও এখনও সে আঁকড়ে থাকতে চায় সেই জীবনকেই, যেটুকু আজও বজায় বাখা যায় সেইটুকু দিয়েই আজও মন ভুলাতে চায় নিজের যে এখনও টিকে আছি, টিকিয়ে রেখেছি পারিবারিক জীবন।

নিজে একা একটু অংশ নিয়েছে সকলের দুরবস্থার সত্যিকারের চেষ্টায়, নতুন করে সব গড়ার লড়ায়ে। এটুকু করেই সন্তুষ্ট থেকেছে।

বাসে উঠে দেখা হল বেলার স্বামী ধীরেনের সঙ্গে।

বেলা সাধনার ছেলেবেলার বন্ধু। সেই সূত্রে রাখাল ও ধীরেনের পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হলেও দুজনের সম্পর্ক বন্ধুত্বের পর্যায়ে উঠতে পারেনি।

বোঝাই বাসে কথা হয় না। প্রভা আজ না পড়ায় রাখাল সকাল সকাল ছুটি পেয়েছে, বাসে এখন যাত্রীদের গাদাগাদি। পুরো টাইম পড়িয়ে রাখাল যেদিন বাসে ওঠে সেদিনও অবশ্য কিছুটা পথ তাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়।

শহরতলির কাছাকাছি গিয়ে ধীরেনের পাশেই বসতে পায়।

বলে, খবর কী ?

সেই এক খবর।

কিছু হল না ?

কী করে হয় ! রামরাজ্যে কিছু হয় না।

চাকরি দানের সরকারি আপিস সম্পর্কে ধীরেন তার নতুন অভিজ্ঞতার কাহিনি আরম্ভ করে, কাহিনি শেষ না হতে বাস দাঁড়ায় তার নামবার স্টপেজে। সে বলে, নামুন না খানিক বসে গল্প করে যাবেন ?

এখান থেকে রাখালের বাড়িও মোটে কয়েক মিনিটের পথ। সে ধীরেনের সঙ্গে নেমে যায়।

সরু গলির মধ্যে চারকোনা উঠানের চারদিকে ঘর তোলা সেকেলে ধরনের পুরানো একটি দোতলা বাড়িতে ধীরেনের আস্তানা—একতলায় একখানি ঘর, আলো বাতাস খেলে না। সমস্ত বাড়িটাতে এমনিভাবে একখানা দুখানা ঘর নিয়ে মোট ন-ঘর ভাড়াটে বাস করে। সকালে বিকালে নটি ছোটোবড়ো পরিবারের উনানে যখন প্রায় একসঙ্গে আঁচ পড়ে অনেককে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয় রাস্তায়।

বেলা বলে, আসুন।

সে হাতকল চালিয়ে ফ্রক সেলাই করছিল। তার নিজের মেয়েটির বয়স মোটে দুবছর, ফ্রকটা দশ-এগারো বছরের মেয়ের। আরও দু-তিনটি সেলাই করা শায়া ব্লাউজ পাশে পড়ে আছে, কিছু আলগা ছিটের কাপড়ও আছে।

এত কী সেলাই করছেন ?

বেলা শুধু একটু হাসে।

জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরতে পরতে ধীরেন গম্ভীর শুকনো গলায় বলে, পাড়ার লোকের ফরমাশ সব। উনি বাড়িতে দর্জির দোকান খুলেছেন।

বলে সে গামছাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

বেলা বলে, গয়না বেচে খাচ্ছি। বিয়েতে কলটা পেয়েছিলাম। শখের জিনিস ঘর সাজিয়ে রেখে লাভ কী ? এমনি কত জামা সেলাই করে দিয়েছি কতজনকে, আজ দরকারের সময় দুটো পয়সা যদি রোজগার হয়, দোষের কী আছে বলুন ?

কে বলে দোষ ?

উনি খুঁতখুঁত করেন। পাড়ার চেনা লোকের কাছে পয়সা নিয়ে জামা সেলাই করব, ওনার সেটা পছন্দ হয় না।

পছন্দ না হয়ে উপায় কী ?

উপায় নেই। তবু পছন্দ হয় না !

রাখাল ভাবে, সাধনার কল নেই। কিন্তু কল থাকলেও সে কি নিজে উদ্যোগী হয়ে এ ভাবে কিছু রোজগারের উপায় খুঁজে নিতে পারত ? এদিকটা খেয়াল হত না সাধনার, সে হয়তো বলত যে নগদ যা পাওয়া যায় তাতেই কলটা বেচে দাও, সেই টাকায় কিছুদিন চলুক !

৬

কী দোলটাই যে খায় সাধনার মন !

এক সিদ্ধান্ত থেকে একেবারে বিপরীত আরেক সিদ্ধান্তে !

বাসন্তী একরাশ নোট দিয়েছে তাকে—কারণ, হারের দামটা সে যা দিয়েছে তার মধ্যে দু-চারখানা পাঁচ টাকার ছাড়া বাকি সব দুটাকা একটাকার নোট।

সংসারের খরচ থেকে একটি দুটি করে বাসন্তী টাকাগুলি জমিয়েছে।

বাসন্তী নিজে এসে গুনে দিয়ে গিয়েছিল নোটগুলি। সাধনা আরেকবার গুনে বাক্সে তুলে রেখেছিল—ট্রাঙ্কের মধ্যে তার গয়না রাখার ছোটো বাক্সে। বাক্সে যেন আঁটে না এত নোট !

ক-ভরি সোনার বদলে একরাশি টুকরা কাগজ।

প্রথমে তার মনে জেগেছিল একটা দ্বিধা। রাখালের ভরসা না করে কাল আবার বাসন্তীর সঙ্গে দোকানে গিয়ে নিজেই কিনে আনবে নতুন হারটা ? অথবা রাখালকে টাকা দেবে কিনে আনতে ?

রাখালকে জানানো হয়নি সে নিজেই হার বিক্রির ব্যবস্থা করেছে !

হার কেনার ব্যবস্থাটাও যদি রাখালকে না জানিয়ে করে ? যে ব্যবহারটা রাখাল জুড়েছে তার সঙ্গে তার একটা উচিত মতো জবাব দেওয়া হবে সে অত তুচ্ছ নয়, পরাধীন দাসী নয় !

বাড়াবাড়ি হবে ? হোক বাড়াবাড়ি ! তাকে নিয়ে রাজীবের মিথ্যা মতলব আন্দাজ করে বাড়াবাড়ির চরম করেনি রাখাল ? সে কেন অত সমীহ করে চলবে তাকে ?

তবু নানা সংশয় জাগে। একটা অজানা আতঙ্ক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় প্রাণটা। জোর করে সে রেবার বিয়েতে যাবে, রাখাল না গেলেও একা যাবে—এই ঝগড়াটাই কোথা থেকে কীসে গিয়ে দাঁড়ায় ঠিক নেই। রাখাল এখনও তার হুকুম ফিরিয়ে নেয়নি, সেও ছাড়েনি তার জিদ। এত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তাদের এই বিরোধ যে এ বিষয়ে তারপর একটি কথাও হয়নি তাদের মধ্যে !

রাখাল অপেক্ষা করছে সে কী বলে কী করে দেখবার জন্য। হয়তো রাখাল আশাও করছে যে সে তার জিদ ছেড়ে দিয়েছে তাই আর হারের কথা তুলছে না। আর এদিকে সে অপেক্ষা করছে রাখাল নিজে থেকে তার হুকুম ফিরিয়ে নেবে, নতুন হার এনে দেবার জন্য ভাঙা হারটা চেয়ে নেবে, আরেকবার তাকে বিবেচনা করার সুযোগ দেবে যে বিয়েতে সত্যি সে যাবে কিনা।

এ ব্যাপারেই কী ঘটে না ঘটে, আরও গোলমাল সৃষ্টি করা কি ঠিক হবে ?

তার ভয় করে। মনে হয় নিজের দোষেই হয়তো সে নিজের সর্বনাশ করে বসবে। সবদিক দিয়ে দারুণ দুঃসময়, অর কাজ নেই অশান্তি বাড়িয়ে।

এই ভয়টাই আবার যেন তাকে ঘা মেরে কঠিন করে দেয়। এই ভয় যেন তাকে বলে দেয়, তোমার মতো নিরুপায় অসহায় কেউ নেই, রাখাল ছাড়া তোমার আর গতি নেই, তোমার সাধ্য নেই রাখালের বিরুদ্ধে যাবার। রাখালের ইচ্ছা অনিচ্ছা খুশি অখুশিই তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা খুশি অখুশি। রাখাল যদি রাখে তবেই তোমার মান থাকে। রাখাল খেতে পরতে না দিলে তুমি খেতে পাবে না, ন্যাংটো হয়ে থাকবে, খেয়াল নেই তোমার ?

আগে খেয়াল ছিল না সত্যই, নিজের জিদ বজায় রাখতে গেলে রাখাল শেষ পর্যন্ত কী করবে এই ভয় এবার হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিয়েছে।

একেবারে যেন ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছে নিজের সম্পর্কে তার মর্যাদাবোধ, এ সংসারে তার অধিকারবোধ মনুষ্যত্ববোধ।

এই তবে তার আসল সম্পর্ক রাখালের সঙ্গে, সংসারের এইখানে তার আসল স্থান ?

ও বাড়ির সুধা নিয়মিতভাবে মারধোর লাথি-ঝাঁটা পায় স্বামীর কাছে। সুধার সঙ্গে তার আসলে কোনো পার্থক্য নেই। রাখাল যে তাকে মারধোর করে না সেটা নিছক রাখালের রুচি। এর মধ্যে তার কোনো বাহাদুরি নেই।

তখন আবার বিগড়ে যায় সাধনার মন। এক উগ্র প্রচণ্ড বিদ্রোহ জাগে তার মধ্যে। হোক তার সর্বনাশ, ভেঙে চুরমার হয়ে যাক তার সংসাব, ঘুচে যাক স্বামীর কাছে তার সব আশাভরসা—নত সে হবে না কিছুতেই।

খেতে পরতে দেয় বলে, চিরকালের জন্য তার স্বামীত্বের পদটা দখল করেছে বলে, রাখাল যদি এই জোর খাটিয়ে তাকে দমিয়ে রাখতে চায়—একবার সে চেষ্টা করে দেখুক ! দেখুক যে ঠিক মাটি দিয়ে গড়া তার সাধনা নয়, সেও রক্তমাংসের মানুষ, নিজের মান বাঁচাতে সেও শক্ত হতে জানে।

ছেলে কোলে সে রাস্তায় নেমে যাবে। ঝি-গিরি রাঁধুনিগিরি করবে। দরকার হলে বেশ্যাবৃত্তি নেবে। তবু—

আবার দোল খেয়ে মন চলে যায় অন্যদিকে। আবার মনে পড়তে থাকে যে রাখাল এ পর্যন্ত তাকে অপমান বিশেষ কিছুই করেনি ! সেই যে হর্তাকর্তা বিধাতার মতো সোজাসুজি তাকে নিষেধ করে দিয়েছিল যে রেবার বিয়েতে তার যাওয়া হবে না, তারপর থেকে এক রকম গুম খেয়েই আছে মানুষটা। রাগ করে একজন গুম খেয়ে থাকলে তাতে তার অপমান কীসের ?

তাকে ভাইয়ের কাছে পাঠাতে চেয়েছে কিছুদিনের জন্য। দুরবস্থায় পড়লে এমন কী কেউ পাঠায় না ? এতে তার প্রাণে আঘাত দেওয়া হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মানে ঘা লাগবে কেন ?

যেচে চাকরি দিতে চায় বলে রাজীবের মতলব সম্পর্কে যে ইঙ্গিত সে করেছে, সেটা রাজীবের সম্পর্কেই। রাজীবের মনের মধ্যে কী আছে না আছে সে কথা বলায় তার অপমান কীসের ? সে রাজীবকে প্রশ্রয় দেয় এ রকম ইঙ্গিত তো রাখাল করেনি।

নিজেই সে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে ব্যাপারটা নিজের মনের মধ্যে। যা শুধু মনোমালিন্য স্বামী-স্ত্রীর সেটাকে দাঁড় করিয়েছে তার মনুষ্যত্ব বজায় থাকা না থাকার প্রশ্নে।

তাছাড়া,—সাধনা এ কথাটাও ভাবে,—সংসারে সে তো একা নয় স্বামী যাকে খেতে পরতে দেয়, স্বামীই যার একমাত্র গতি। সব স্ত্রীরই একদশা। এ জন্য বিশেষভাবে নিজেকে ধিক্কার দেবার কী আছে ?

স্বামীত্বের অধিকার যদি রাখাল একটু খাটাতেই চায়, আর দশজনের মতো সেটুকু মেনে নিলেই বা দোষ কী ? সুধার মতো লাথি আর চাবুক সয়ে যাবার প্রশ্ন তো নয় !

কিন্তু বেশিক্ষণ একভাবে থাকে না তার মন। পালা করে নরম আর গরম হয়, আপস থেকে বিদ্রোহে গতায়াত চলে।

ভোলার মা বলেছিল বিকালে আসবে।

বেলা পড়ে আসে, তার দেখা নেই। এ আবার আরেকটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সাধনার। হার বিক্রির টাকা থেকে সে নিজেই মাকড়ি দুটো বাঁধা রেখে ভোলার মাকে পঁচিশটা টাকা দেবে ভেবেছে।

ভরি খানেক কম সোনার একটা নতুন হার সে কিনবে। দোকানে দেখে এসেছে, ও রকম সোনাতেও সর্বদা ব্যবহারের হার মন্দ হয় না।

কিছু টাকা তার বাঁচবে।

কিন্তু টাকা রাখলে থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে খরচ হয়ে যাবে। তার তো বাসন্তীর মতো অবস্থা নয় যে সংসারের খরচ থেকে বাড়তি দু-পাঁচটা সরিয়ে সরিয়ে রেখে জমাতে থাকবে, খরচ করার দরকার হবে না।

তার চেয়ে মাকড়ি বাঁধা রাখলে হার বেচা পঁচিশটা টাকাও যদি টিকে যায়।

কিন্তু ভোলার মা আসে না কেন ? টাকার দরকার বলে সোনা ফেলে রেখে গেছে, তার কি তাগিদ নেই এসে খবর নেবার ? সাধনা নিজেই এমন অধৈর্য হয়ে ওঠে যে নিজেই সে আশ্চর্য হয়ে যায়।

গিয়ে দিয়ে এলে কেমন হয় টাকাটা ভোলার মাকে ?

ওই তো চোখের সামনে দেখা যায় কুঁড়েঘরগুলি। এই তফাত থেকেই ঘরগুলিকে একে একে সে গড়ে উঠতে দেখেছে, এখান থেকেই এতদিন তাকিয়ে দেখেছে ঘরগুলিকে। ভোলার মা ছাড়া আর কারা এখানে থাকে, কীভাবে অতটুকু ঘরে থাকে, কিছুই সে জানে না।

গেলে দোষ কী ?

পাঁচটার পর আর ধৈর্য থাকে না সাধনাব। ব্লাউজের ভিতরে টাকা নিয়ে ছেলেকে কোলে তুলে হাঁটতে হাঁটতে বেড়াতে বেড়াতে পুকুরপাড় ঘুবে সে ছোটোখাটো কলোনিটিতে যায়। কাছাকাছি গিযে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সমান দূরে দূরে সাজিয়ে বসানো ছাঁচে ঢালা ছোটো ছোটো ঘর, টুকরো টুকরো বাগান, সবু সবু পথ—চাবিদিক পরিষ্কার ঝকঝকে। ঠিক যেন ছবির মতো। ঘব হারানো মানুষগুলি সব গড়েছে নিজের হাতে। এখনও কোনো ঘরেব টুকিটাকি কাজ চলেছে, কাজ করছে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ! কয়েক হাত বাগানটুকুতে পুরুষ লাগাচ্ছে সবজিচারা, পুকুর থেকে জল এনে দিচ্ছে তার বউ। রাস্তার কল থেকে কেউ কলসি কবে জল আনছে, কেউ ধবাচ্ছে উনান, কেউ বেঁধে দিচ্ছে আরেকজনের চুল।

ভোলার মাব ঘরটি পুব-দক্ষিণ কোণে। কলোনির একজন ঘবটা সাধনাকে দেখিয়ে দেয়।

সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে বলে, কী চান ?

ভোলার মা ঘরে নেই ?

মা ? মা ডিম বেচতে গেছে।

ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে দিযে সাধনা বলে, তুমি দুর্গা, না ?

মাথা হেলিযে সায় দিয়ে দুর্গা বলে, আসেন, বসেন।

একটা চওড়া বেঞ্চেব মতো মাটিব দাওয়া, তাতে একটা তালপাতাব চাটাইযেব আসন দুর্গা বিছিয়ে দেয়। বসতে বসতে সাধনা বলে, বসব কী, আমি তোমাব মার খোঁজে এলাম, তোমাব মা হয়তো ওদিকে আমাব বাড়ি গেছে।

ভিতর থেকে পুবুষের গলা শোনা যায়, দুগ্‌গা, জিগা তো ওইটাব ব্যবস্থা করছেন নাকি ?

দুর্গা বলে, মা আপনাকে মাকড়ি দুইটা দিছে না ? কিছু কবছেন ?

এরা সবাই তবে জানে ? ভোলার মা চুপিচুপি লুকিয়ে মাকড়ি দুটি বাঁধা বাখতে তার শবণাপন্ন হয়নি ! এই একটা খটকা ছিল সাধনার মনে।

সে বলে, হ্যাঁ, ব্যবস্থা করেছি। সেই জন্যই খুঁজতে এসেছিলাম তোমাব মাকে।

গায়ে কাঁথা জড়িযে রাধেশ ভিতব থেকে বেরিয়ে আসে। চুলে পাকধরা লম্বা চওড়া মস্ত একটা মানুষ, ঠিকমতো খেতে পেলে বোধ হয় দৈত্যের মতো দেখাত। কতকাল ধরে উপবাসী দেহে স্বাস্থ্যের জোয়ার নেই, শুধু ভাটা। হাড় আর চামড়া শুধু বজায আছে।

জ্বর নিয়া উইঠ্যা আইলা ক্যান ?

মেয়ের প্রতিবাদ কানেও তোলে না রাধেশ। ক-হাত তফাতে উবু হয়ে বসে ধীবে ধীরে বলে, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন। ভোলার মারে কইয়া দিছিলাম, মাকড়ি তুমি বেচবা না, কিছুতেই বেচবা না। ভালো মাইন্‌ষের কাছে বাঁধা দিয়া টাকা পাইলে আনবা, না পাইলে আনবা না। দুই মাসে পারি ছয় মাসে পারি মাকড়ি আমি খালাস কইরা আনুম। মাকড়ি বেইচা বিয়া দিমু না মাইয়ার।

রাধেশ মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কয়েকবার কাশে।

মেয়ের বিয়ে নাকি ?

হ। তেরো তারিখে লগ্ন আছে, পার কইরা দিমু।

ভোলার মা তো বিয়ের কথা কিছু বলেনি ?

কী কইব কন ? নামেই বিয়া, নম নম কইরা সারুম। তবু কয়টা টাকা লাগব।

পঁচিশ টাকায় মেয়ের বিয়ে ! দুর্গাকে ভালো করে দেখতে দেখতে সাধনা আশ্চর্য হয়ে বিবরণ শোনে। এখানকারই আরেকটি কুঁড়েঘরে থাকে ছেলেটি, নাম তার বিষ্ণুচরণ। মা আর বিবাহিতা এক বোনকে সাথে করে এখানে মাথা গুঁজেছিল। দূরে আরেক পাড়ায় ঘর বেধে বোনকে তার স্বামী নিয়ে গেছে। হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মা মরে গেছে বিষ্ণুর। কী অসুখ হয়েছিল কে জানে ! হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, প্রথমে জায়গা মেলেনি, মরবার আধঘণ্টা আগে ঠাঁই পেয়েছিল সমিতির বাবুদের চেষ্টায়।

তা ওদিকে বিষ্ণুকে থাকতে হয় একা, এদিকে এতবড়ো মেয়ে নিয়ে তাদেরও ঝঞ্ঝাটের অন্ত নেই। শকুন হারামজাদাগুলির নজর যেন খালি খুঁজে বেড়ায় কোথায় কোন গরিব অসহায়ের ঘরে অল্পবয়সি মেয়ে আছে। দুপক্ষে তারা তাই পরামর্শ করে বিয়েটা ঠিক করেছে। দেনাপাওনা কিছু নেই, কাপড়গয়না থালাবাসন কিছুই লাগবে না, যেমন আছে মেয়ে আর ছেলে ঠিক তেমনিভাবেই শুধু বিয়েটা হবে কলোনির দশজনের সামনে।

তবু শাখা-সিঁদুর তো চাই, পুরুত তো চাই, টুকিটাকি এটা ওটা তো চাই যা না হলে বিয়েই হবে না। একটি করে মিষ্টি দেওয়া হবে কলোনির সকলকে, সকলের মিলিত হুকুমেই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে একটির বেশি মিষ্টি দেওয়া। পেট ভরে খাবে শুধু বিষ্টুর বোন আর ভগ্নিপতি।

তবু পঁচিশ টাকায় বিয়ে ! সাধনার বিশ্বাস হতে চায় না কিছুতেই। হাতে আরও কিছু টাকা আছে, তার সঙ্গে এই পঁচিশ টাকা যোগ হবে নিশ্চয়।

পঁচিশ টাকায় কুলিয়ে যাবে ? সাধনা জিজ্ঞাসা করে।

না কুলাইয়া উপায় কী ? কুলান লাগব।

পঁচিশ টাকায় কুলিয়ে না নিলে বিয়ে হয় না, প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে হয় কবে আরও বেশি খরচ করার ক্ষমতা হবে সেই অজানা অনাগত দিনের আশায়। সবাই এটা বোঝে। তাই পঁচিশ টাকাতেই বিয়েব ব্যবস্থা হয়েছে। সকলে মিলে পরামর্শ করে স্বীকৃত ব্যবস্থা।

দুর্গা চুপ করে দাঁড়িয়ে শোনে। মেটে রং, রোগা গড়ন, আধ-রুক্ষ একরাশি চুল। এত চুল বলেই বোধ হয় বিয়ের কটা দিন আগেও যথেষ্ট তেল দিয়ে চুলের রুক্ষতা সম্পূর্ণ ঘোচানো যায়নি।

হাতে দুগাছা করে নকল সোনার চুরি, কানে ওই নকল সোনারই দুল !

কথা কইতে কইতে ভোলাব মা এসে পড়ে। সাধনার কাছেই সে গিয়েছিল, আশার কাছে খবর পায় যে তাকে এদিকে আসতে দেখা গিয়েছে। ভোলার মার অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়নি যে তার খোঁজে তাদের কুঁড়ের দিকেই গিয়েছে সাধনা।

ভোলার মা কৃতজ্ঞতা জানায় অপরূপভাবে !

শুধু বলে, ভালোমন্দ মানুষ চিনতে আমাগো ভুল হয় না।

অনেক দেখে অনেক ঠেকে সে নির্ভুল যাচাই করতে শিখেছে সৎ মানুষ আর অসৎ মানুষকে। সাধনার কাছেই সে গিয়েছিল মাকড়ি নিয়ে। সাধনা মানুষটা ভালো। সন্দেহাতীতভাবে ভালো।

ভোলার মাকে টাকা দিয়ে সাধনা একটু খুশি মনেই ঘরে ফেরে। উপর উপর কতটুকুই বা দেখেছে আর কতটুকুই বা জেনেছে এখানকার মানুষের দিবারাত্রির জীবন, তবু তার মনে হয় সে যেন কিছুক্ষণের জন্য নতুন একটা জগৎ থেকে ঘুরে এল। ঘরের এত কাছে জীবনের একটা অতি সহজ প্রাথমিক সত্য এমনভাবে বাস্তব রূপ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে এটা যেন এখনও তার বিশ্বাস হতে চায় না, চোখে দেখে কানে শুনে আসার পরেও। তার ধারণাতীত ছিল এই সহজ সত্যটা। এত অসহায়

এত নিরুপায় হয়ে পড়েও মানুষ হাল ছাড়ে না, এমনভাবে আবার আশ্রয় গড়ে নেয়, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবনের নতুন ভিত গাঁথে !

পঁচিশ টাকায় আয়োজন করে ছেলেমেয়ের বিয়ের !

এতদিন সাধনার কাছে বিয়ের মানেটাই ছিল রোমাঞ্চকর স্বপ্নকে বাস্তব করা উপলক্ষে হইচই আনন্দ উৎসব। সমস্ত কিছু ছাঁটাই করে এরা বজায় রেখেছে শুধু বিয়ের আয়োজনটুকুকে ! খরচপত্রের আনন্দ উৎসব করার সাধ্য নেই বলে দমে গিয়ে বাতিল করে দেয়নি ছেলেমেয়ের বিয়ে হওয়া !

ওখানে যেতে হবে মাঝে মাঝে। কী দিয়ে কীভাবে ওরা সংসার চালায় ভালো করে জানতে হবে।

এইটুকু সময় নিজের চিন্তা ভুলে ছিল। ঘরের তালা খুলতে খুলতে ক্ষণিকের জন্য পিছু হটা সমুদ্রের মতোই তার চিন্তাভাবনা দ্বিধা সংশয় জ্বালা ভয় ছুটে এসে তার মনকে দখল করে।

এত জটিল এত বেখাপ্পা তার জীবন ! অভাবের শেষ নেই একদিকে, অন্যদিকে সীমা নেই অশান্তির।

কেন এমন হয় ? কেন তারা এই বিরোধ আর অশান্তি দূরে সরিয়ে দিয়ে অন্তত মিলেমিশে শান্তিতে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে পারে না ? তাদের চেয়েও কি মনের জোর বেশি ভোলার মায়েদের ? বিদ্যাবুদ্ধি বেশি ?

শুধু রাখাল নয়, সকলের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে একটা আকণ্ঠ সাধ জাগে সাধনার। সবাই তারা কথা বলে পরামর্শ করে বিদ্বেষ আর ভুল বোঝা মিটিয়ে নেবে, তাব মনেও কেউ আঘাত দেবে না, সেও এমন কিছুই করবে না যাতে কারও রাগ হতে পারে, দুঃখ হতে পারে।

ঝোঁকটা চাপতে পারে না সাধনা। তখনই উঠে আশার ঘরে যায়—সরলভাবে প্রাণ খুলে আশার সঙ্গে আলাপ করবে। একরকম পাশাপাশি ঘর, অথচ তারা ভুলেও একজন আরেকজনেব ঘরে যায় না, একী অর্থহীন অকারণ বিরোধ !

উনানে আঁচ দিয়ে দেয়ালে টাঙানো বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আশা চুল বাঁধছিল। আয়নায় সাধনাকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে তাকায় না, সেই ভাবেই যেন আয়নায় সাধনার প্রতিচ্ছবিকে জিজ্ঞাসা করে, কী বলছ ?

এমনি এসেছিলাম, গল্প করতে।

ও ! বেশ তো।

মুখ ফেরায় না আশা, চুল বাঁধা স্থগিতও করে না এক মুহূর্তের জন্য। সাধনা দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে বসতেও বলে না।

সাধনা ঠিক করেই এসেছিল যে আশা কী ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না, নিজের মান অপমান নিয়ে মিথ্যে কাতর হবে না, অন্য সমস্ত হিসাব বাদ দিয়ে সরল সহজ প্রীতিকর কথা আর ব্যবহার দিয়ে আশাকে সে জয় করে ছাড়বে !

বড়ো দমে যায় সাধনা। তার কান দুটি ঝাঁঝা করে। কিন্তু যেচে গল্প করতে এসে আচমকা ফিরেই বা যাওয়া যায় কী করে ?

সেদিন আশাকে উপেক্ষা করে ওদের রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে গায়ের জোরে রাজীবের সঙ্গে আলাপ চালিয়েছিল। সেটা ছিল আলাদা ব্যাপার। সেটা ছিল ওদের সংকীর্ণতাকে তুচ্ছ করে গায়ের জোরে নিজের মহৎ ও উদার হওয়া।

আজ নত হয়েই এসেছে আশার কাছে। এসেছে একটা অবাস্তব মিথ্যা উদারতার ঝোঁকে !

মরিয়া হয়ে সে আবদারের সুরে বলে, আমার চুলটা বেঁধে দাও না !

আমি পারিনে।

কাল বেড়াতে এসেছিল ঘোষালদের মেজোবউ, আশা গল্প করতে করতে সযত্নে তার চুল বেঁধে দিয়েছিল।

অগত্যা কী আর করে, সাধনাকে বলতে হয়, আচ্ছা যাই, উনুন ধরাবো।

আচ্ছা।

প্রাণটা জ্বলে পুড়ে যায় সাধনার। আজকেই ও বেলা কড়াইসুদ্ধ মাছের ঝোল উনানে ঢেলে দেবার সময ভাপ লেগে কিছুক্ষণ তার হাত যেমন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে মনে হয়েছিল।

না আপসের ভরসা নেই, এ অশান্তির হাত থেকে তার রেহাই নেই। নিজেব মনটা ঝেড়ে মুছে সাফ করে সে যদি যেচে নত হযে আপস করতে যায়, তার অপমানটাই তাতে বেশি হবে, আবও সে ছোটোই হয়ে যাবে শুধু, তাছাড়া কোনো লাভ হবে না।

তাকে ভুল বুঝবে মানুষ, ভাববে যে তার বুঝি কোনো মতলব আছে !

এ জগতে বোঝাপড়া নেই। যে যেমন বোঝে সেটাই আঁকড়ে থাকবে।

গভীর হতাশা বোধ করে সাধনা। জীবন নয়, এ যেন একটা যন্ত্র। নিজের ধরাবাঁধা নিযমে একভাবে পাক খেয়ে চলবে, কারও সাধ্য নেই এতটুকু এদিক ওদিক করে।

হৃদয় মনের কোনো মূল্য নেই এই যান্ত্রিক জীবনে।

নইলে হাসিমুখে ছাড়া কথা ছিল না যে বাখাল আর তার মধ্যে, একটু মুখভাব কবলে পাঁচ মিনিটে যে রাখাল তার মুখে হাসি ফুটিযে ছাড়ত, সেই বাখাল নিজে আঘাত দিযে তাকে আহত করেও অনায়াসে তাকে উপেক্ষা করে চলেছে !

সকাল সকাল রাখালকে বাড়ি ফিরতে দেখে বুঝি আশা জাগে সাধনার।

কিছু হল নাকি ?

না।

চাকরিটা কীসের ?

জোচ্চুরি করে জেলে যাবার।

সাধনার মুখ ছোটো হযে যায়।

ব্যাপারটা কী হল বলো না ?

বলব আবার কী ? নিজেরা একটা ফাঁদে পড়েছে, আমায় জবাই করে বাঁচবার মতলব ছিল। নইলে যেচে কেউ চাকরি দিতে চায় ?

তার সঙ্গে ভালো করে কথাও কি বলতে চায় না রাখাল ? তার আগ্রহ টের পায না ? এমন ভাসাভাসা জবাব দেবার নইলে আর কী মানে থাকতে পাবে !

অনেক কথা বলার ছিল সাধনার। কিন্তু তার সঙ্গে যার কথা বলার সাধ নেই তাকে নিজের কথা গায়ের জোরে যেচে যেচে শুনিয়ে আর লাভ কী ? যেচে তাকে চাকরি দিতে চাওয়ার মধ্যে মতলব ছিল রাজীবের, কিন্তু সে যা ভেবেছিল সে রকম মতলব নয়, অন্য মতলব ছিল, এ প্রমাণ পেয়ে কি একটু নরম হওয়া উচিত ছিল না রাখালের ? যে বিশ্রী মতলবের ইঙ্গিত সে আজকেই করেছিল চাকরিটার খোঁজে বেরোবার আগে, সে কথা মনে করে সাধনার কাছে একটু লজ্জা পাওয়াও কি উচিত ছিল না তার ?

রৈবার বিয়েতে যাওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়েছে বলে কী সম্পর্ক চুকে গিয়েছে তাদেব !

এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটাতে হয়।

কী বিড়ম্বনা জীবনে !

সাধনাকে অমানুষ মনে হয় রাখালের। গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে মনে হয় একটা সচল মাংসপিণ্ডে যেন ক্ষুদ্র স্বার্থপর এক টুকরো প্রাণ বসিয়ে জীবন্ত মানুষটা তৈরি হয়েছে। হয়তো কোনো দোষ নেই সাধনার। সংসার তাকে গড়ে তুলেছে এমনিভাবে, ছোটো করে দিয়েছে তার মনটাকে। হয়তো প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করলে খানিকটা সংশোধন সে করেও নিতে পারত তাকে।

কিন্তু সে জন্য তো বাতিল হয়ে যায় না এ সত্যটা যে সে অতি নিচুস্তরের ঘৃণ্য মানুষ।

সেই সাধনা, যার হাসি দেখে তার প্রাণ জুড়িয়ে যেত। যার সরল নির্ভর, শান্ত মধুর প্রকৃতি আর কেরানির সংসারের স্বল্প আয়োজন নিয়েই সংসার করার আনন্দে মশগুল হয়ে থাকার ক্ষমতা দেখে মনে হত, কত সৌভাগ্য তার যে এমন বউ পেয়েছে !

আজ কী স্পষ্ট হয়েই ধরা পড়েছে তার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ হৃদয় আর অবুঝ একগুঁয়ে মনের পরিচয়। এ পরিচয় কী করে এতদিন তার কাছে গোপন ছিল ভাবলেও বিস্ময় বোধ হয় !

হয়তো তাই হবে। এ সব ছোটো হৃদয় ছোটো মনের মানুষ অল্প পেয়েই খুশিতে গদগদ হয়ে যায়, নিজেকে ধন্য মনে করে। তখন হয়ে থাকে একেবারে অন্যরকম মানুষ !

আবার সেটুকুর অভাব ঘটলেই একেবারে বিগড়ে যায় এ সব মানুষ। একেবারে বিপরীত রূপটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

জীবন খালি হয়ে গেল, শরীরে খালি হয়ে এল জীবনী শক্তি, সোনার হারের অভাবে খালি গলার শোকেই সে আকুল ! রেবার বিয়েতে যাওয়ার ছলে সে গড়িয়ে নিতে চায় নতুন হার ! ক-দিন জগৎ সংসার তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে, ভাতের হাঁড়ির মতো হয়ে আছে তাব মুখ, অস্থির উন্মনা অস্বাভাবিক হয়ে গেছে তার কথাবার্তা চালচলন !

তার নিজের বা তার ছেলের বা স্বামীর একটা অসুখ হলে চিকিৎসা হবে না জানে, অথচ নতুন হার গলায় দিয়ে সেজেগুজে বিয়ে বাড়িতে গিয়ে কনেকে নিজের কানপাশা উপহার দিতে পারবে না বলে, দশজন আত্মীয়বন্ধুর কাছে মিথ্যা সম্মান মিথ্যা সমাদর পাবে না বলে, পাগল হয়ে যেতে বসেছে !

তাকে আর তার রকম-সকম দেখে কে না বুঝবে যে এটা শুধু তার একটা জোরালো সাধ নয়, সাধটা না মিটলে সে শুধু গভীর মনোবেদনা পাবে না—এটা তার জীবনের চরম কামনায় দাঁড়িয়ে গেছে, এ কামনা না মিটলে হয়তো সে সত্যই পাগল হয়ে যাবে।

ভাবতেও ঘৃণা বোধ হয় রাখালের। নিরুপায় বিদ্বেষে নিশ্বাস তার আটকে আসতে চায়।

নতুন হার তাকে এনে দিতেই হবে। নিয়েও যেতে হবে রেবাব বিয়েতে। তাছাড়া উপায় নেই। এই সামান্য ব্যাপারে মাথা বিগড়ে দেওয়া যেতে পারে না সাধনার। যত প্রতিক্রিয়া হবে সব ভোগ করতে হবে তো তাকেই।

ছেলেটার কথাও তো ভাবতে হবে।

রাখালকে সাধনার পাষণ্ড মনে হয়। রক্তমাংসের মানুষ নয়, অস্বাভাবিক অমানুষিক কিছু দিয়ে গড়া। চোখ ফেটে তার জল আসতে চায়। যে রাখাল এত বড়ো বড়ো কথা বলত, এত ছোটো তার মন ? পাশাপাশি শুয়েও সে ভুলতে পারে না তাদের কলহ হয়েছে ? পাশাপাশি শুয়ে নীরব উপেক্ষায় তাকে কাবু করে কলহে জয়ী হতে চায় ? এত সে নীচ ?

সাধনার সহ্য হয় না। সে উঠে গিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ে।

রাখাল বলে, কী হল ?

সাধনা বলে, কী আবার হবে !

রাখাল একটু চুপ করে থেকে বলে, কাল তোমার হারটা বদলে আনব। এতই যখন ইচ্ছা তোমার, রেবার বিয়েতে নিয়ে যাব।

উঠে বসে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে সাধনা বলে, দ্যাখো, আমিও একটা মানুষ ! ও রকম কোরো না তুমি আমার সঙ্গে। একদিন বাড়ি ফিরে আমাকে আর দেখতে পাবে না।

রাখাল চুপ করে থাকে। সেটা আর আশ্চর্য কী ? যে মতিগতি সাধনার, যে রকম অবুঝ সে, অজ্ঞান মানুষ, তারই জন্য সারাদিন বাইরে প্রাণপাত করে ঘরে ফিরে তাকে দেখতে না পাওয়া আশ্চর্য কিছুই নয়।

রাখাল চুপ করে শুয়ে চোখ বুজে ভাবে।

কিন্তু এতদূর তো গড়াল গলার একটা হার আর বিয়ে বাড়ি যেতে চাওয়ার উপলক্ষে, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে ? আর কি উপলক্ষ আসবে না ? দিন দিন কি আরও বিগড়ে যেতে থাকবে না সাধনার মন ?

আসল কথা, এ দারিদ্র্য সইবার শক্তি নেই সাধনার। আর কিছুদিন এ ভাবে চললে সে ভেঙে পড়বেই।

সাধনা ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু রাখালের চোখে ঘুম আসে না। জেগে থেকে চোখ বুজে সে ক্রমে ক্রমে সাধনার অপমৃত্যু ঘটতে দেখতে পায়।

শুধু সাধনা মরছে না, তাকেও ঘায়েল করে দিয়ে যাচ্ছে।

৭

ভাঙন ধরলে এমনি তির্যকগতি পায় মধ্যবিত্তের বুদ্ধি বিবেচনা। ধরাবাঁধা পথ ছেড়ে দিতে হলেই শুরু হয় তার এঁকে বেঁকে পাক দিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে চলা। যতক্ষণ না নতুন পথ সুনিশ্চিত হয়ে যায়, সোজা চলার পথ সে খুঁজে পায় না। মধ্যবিত্তের বিপ্লব তাই আসে অতিবিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের মারফতে, যতক্ষণ না প্রকৃত বিপ্লব রূপ নেয়।

সকালে বিশুকে পড়াতে গিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকেই রাখাল বিশুর মাকে দেখতে পায়। গরদের শাড়ি পরে সদ্যস্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, সর্বাঙ্গে তার ঠিক আগের মতোই গয়নার অভাব।

কখন ফিরলেন ?

বিশুর মা দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বলে, কাইল ফিরছি বাবা। ওইদিন ফিরুম ভাবছিলাম, কুটুম ছাড়ল না। শুকনা ক্যান দেখায় তোমারে, খারাপ নাকি শরীর ?

না, শরীর ভালোই আছে।

পড়াতে পড়াতে বারবার সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, খেই হারিয়ে ফেলে। বিশুর মতো ভোঁতা ছেলেও টের পায় আজ কিছু হয়েছে তার মাস্টারমশায়ের।

নির্মলা আজও তাকে প্রসাদ দিয়ে যায়। কালীঘাটে পূজা দেওয়ার প্রসাদ, বিশুর মার সঙ্গে এসেছে।

নির্মলা বলে, এই ঘরে তো পড়াইতে পারবেন না আইজ। ঠাকুরের পূজা শুরু হইবো। বড়ো ঘরে বসেন গিয়া।

আজ পূর্ণিমা খেয়াল ছিল না রাখালের। প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে সকাল সন্ধ্যায় বিশেষভাবে ঠাকুরের পূজা হয়।

বিশুর মার শোয়ার ঘরখানাই এ বাড়ির সেরা ঘর। নির্মলা সেই ঘরের মেঝেতে দামি চিকন পাটি বিছিয়ে দেয়। এটি শীতলপাটিও বটে। বেত অথবা অন্য কীসের ছাল দিয়ে এ পাটি তৈরি হয় রাখাল জানে না। ছাল-বাকল দিয়ে যে এমন মসৃণ আর পাতলা জিনিস তৈরি হয় এটাও তার আগে জানা ছিল না। পাকিয়ে রাখলে বাঁশের চেয়ে মোটা হয় না, বিছিয়ে দিলে এতখানি ছড়িয়ে যায় যে চার-পাঁচজন অনায়াসে শুতে পারে।

একদিকের দেয়াল ঘেঁষে প্রকাণ্ড ভারী খাট, একেবারে নতুন। দেশ থেকে খাট আনা যায়নি, কিন্তু খাটে না শুয়ে বোধ হয় ঘুম আসে না বিশুর মা আর সতীশের। তাই নতুন খাট কেনা হয়েছে। অন্যদিকের দেয়াল ঘেঁষে অনেকগুলি ছোটোবড়ো ট্রাংক আর স্যুটকেস—সব রঙিন কাপড়ের বোরখায় ঢাকা। দেয়ালে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটে তোলা কাঁচা ছবি আর কাঁচা হরফের বাণী—রাধাকৃষ্ণের কোনো অঙ্গ সরু কোনো অঙ্গ মোটা, 'পতি পরম গুরু' আপন গুরুত্বে আপনিই এলিয়ে পড়েছে। খানিক পরেই শঙ্খ ঘণ্টা বেজে ওঠে। পূজা শুরু হয়। বিশুর মা একবার ঘরে এসে বাক্সো খুলে পুরানো দিনের দুটি রুপোর টাকা নিয়ে যায়।

পুরুতকে আজও সে পুরানো দিনের জমানো রূপার টাকা দিয়ে দক্ষিণা দেয়। এ টাকা ফুরিয়ে গেলে বাজে ধাতুর টাকা বা ছাপানো নোটে দক্ষিণা দিতে হলে না জানি কত মর্মাহত হবে বিশুর মা !

বিশুকেও যেতে হয় ঠাকুরঘরে। বিশুর মা নিজে এসে ছেলেকে ডেকে নিয়ে যায়।

আধঘণ্টা পরে বিশু ফিরে আসামাত্র রাখাল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আজ আর সময় নেই। আটটা বেজে গেছে। আমি যাচ্ছি।

মনে হয় সে ভীষণ চটে গেছে ঠাকুর পূজার নামে তার ছাত্রের পড়াশুনার গাফিলতিতে।

বিশু ভয়ে ভয়ে বলে, আমারে ডাইকা নিয়া গেলো—

আচ্ছা, আচ্ছা।

তাড়াতাড়ি সে সিঁড়ি দিয়ে নামে। যেন একরকম পালিয়ে যাবার মতো অতি ব্যস্ততার সঙ্গে সে চলে যেতে চায় এ বাড়ি ছেড়ে।

নির্মলা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বলে, শোনেন, শোনেন, প্রসাদ নিয়া যান।

সিঁড়ির নীচে একতলা এখন জনশূন্য। বুড়ি রাজু শুধু একমনে বাসন মেজে চলেছে কলতলায়।

নির্মলা বলে, পুরুষ মানুষের এত তাড়া ? কই যাইবেন ?

আরেকটি ছেলে পড়াতে যাব।

ইস্ ! একেবারে বিশ্রাম পান না। ক্যান এত খাইট্যা মরেন আপনে ? কার লেইগা খাটেন ? আমার সয় না আপনার কষ্ট।

এ মিথ্যা আবেগ নয়। নির্মলার চোখে মুখে ফুটে পড়ে তার দরদ। ব্যাকুল দুটি চোখ সে পেতে রাখে রাখালের মুখে। তবু, ভয়ংকর এক বিপদের মতোই তাকে মনে হয় রাখালের।

নির্মলা তার হাত ধরে। বলে, ঘরে আইসা দুইদণ্ড বসেন। আসেন দুইটা কথা কই।

আজ নয়, আরেকদিন।

কিন্তু এ সুযোগ তো আসবে আবার একমাস পরে, আরেকটা পূর্ণিমা এলে।

ডরান নাকি ?

রাখাল মাথা নাড়ে।—দরকার আছে।

তবে ওই বেলা আইবেন ? সন্ধ্যাকালে ? দুই ঘণ্টা পূজা হইব।

যদি পারি আসব।

রাখাল আর দাঁড়ায় না। বাইরে গিয়ে ছেঁড়া স্যান্ডেলে পা ঢুকিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করে।

ক্ষুব্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে নির্মলা তাব পালিযে যাওযা চেয়ে দেখে।

সোনা যে ওজনে এত ভারী রাখালের জানা ছিল না। বিশুব মাব সেকেলে ধরনের গযনাগুলিও বেশ পরিপুষ্ট। কোঁচায় বাঁধা ক-খানা মাত্র গয়নাব ওজনটা বাখাল প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করে।

ভোলার মা আজও ডিম বেচতে বেরিয়েছে, প্যাসেজে ডিমেব টুকবি সামনে রেখে সে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল আশার জন্য। আশা হাত ধুয়ে এসে দর করে পছন্দ কবে ডিম কিনবে।

ভোলার মাই রাখালকে সাবধান করে দেয়, ব্যাগটা পইড়া যাইবো, ঠিকভাবে থোন।

টাকা নেই, কিন্তু পুরানো শখের মানিব্যাগটা আছে। পড়ি পড়ি অবস্থা থেকে ব্যাগটা পকেটের ভিতর ঠেলে দিয়ে রাখাল ঘরে চলে যায়।

আজও সোজা দু-নম্বব ছাত্রটিকে পড়াতে চলে যাবার বদলে তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে নানা কথা মনে হয় সাধনার। আজও কি রাখাল প্রত্যাশা করেছে যে সাধনা নিজে থেকে মুখ ফুটে তাকে হারের কথা বলবে ?

সামনাসামনি এ টালবাহানা অসহ্য মনে হওয়ায সাধনা ঘর থেকে বেরিয়ে তার উনানের পাশে চলে যায়। তাতে সুবিধাই হয় রাখালের। কোঁচা থেকে খুলে গয়না কটা একটুকরো ন্যাকড়ায় বেঁধে একখানা আস্ত খবরের কাগজে জড়িয়ে পুঁটলি কবে নেবার সুযোগ পায়।

চাকবির খববের আশায় আজও সে প্রতি ববিবার দুখানা কাগজ কেনে, মাঝে মাঝে দরখাস্তও পাঠায়।

বিছানায় স্থির হয়ে বসে মিনিটখানেক সে ভাবে। নিজেব ভিতবটা তার এত বেশি ধীব শান্ত মনে হয় সে উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো আযনায নিজেব মুখ দেখে প্রায চমকে ওঠে।

গামছায় মুখ মুছে সে মৃদুস্বরে সাধনাকে ডাকে। সাধনা ঘরে এলে বলে, তোমার হারটা দাও।

কেন ?

আজ একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।

তোমার কিছু করতে হবে না।

করতে হবে না ?

না যা করবার আমিই করব।

একটু যদি ভাববার সময় পেত সাধনা ! আচমকা ডেকে বিনা ভূমিকায় হারের কথা না তুলে তার প্রস্তাবের জবাব দেবার জন্য কয়েক মিনিট প্রস্তুত হবার সময় যদি রাখাল তাকে দিত ! এমন স্পষ্টভাবে সোজাসুজি রাখালকে বাতিল করে দেওয়ার বদলে এই সুযোগে সে নিশ্চয় রাখালকে জানিয়ে দিত যে হারের ব্যবস্থা সে ইতিমধ্যেই অর্ধেকটা করে ফেলেছে।

রাখাল চলে যাবার পর সাধনা এই কথাই ভাবে আর আপশোশ করে। রাখাল নিজে থেকে নরম হয়ে তার কাছে হাব মানতে চাইল আর সে কিনা সংঘাতের জের টেনে আরও উগ্র, আরও কঠিন হয়ে উঠল !

রাস্তায় নেমে রাখাল ভাবে, এই তো স্পষ্ট লক্ষণ বিকারের। হিসাব তার ভুল হয়নি, মাথা সাধনার বিগড়ে যেতে বসেছে। কঠিন রোগের চিকিৎসার মতোই এই কঠিন দারিদ্র্যের চাপ থেকে সাধনাকে একটু মুক্তি দেওয়া আজ একান্তভাবে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নইলে দুর্দশা হয়তো তার

একদিন ঘুচবে, সাধনাকে সুখে রাখার ক্ষমতা হবে, কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হবে না তখন। আজকের বিকৃতিতে সারাজীবনের বিকারের বোঝা করে নিয়ে একটা অসহ বোঝার মতোই হয়ে থাকবে সাধনা।

হাতের কাগজে মোড়া পুঁটলিটার ওজন থেকে এতক্ষণে যেন বুকে বল পায় রাখাল। যাই সে করে থাক, সাধনাকে বাঁচাবার জন্য করেছে। জীবনের অনেকটাই এখনও বাকি তার উপায় কী !

পোদ্দারের দোকানে গয়নাকটা বিক্রি করে রাখাল একুশ শো সাতান্ন টাকা পায়। কত হাজার টাকার গয়নাই যে আছে বিশুর মার ! সমস্ত সোনার কত সামান্য একটু অংশ সে এনেছে। পোদ্দার কয়েক শো টাকা ঠকিয়েছে ধরে নিলেও তারই দাম পাওয়া গেছে দু-হাজারের বেশি।

তাকে আরও বেশি ঠকাবার সাধ ছিল পোদ্দারের।

বুকভরা লোম আর মুখভরা মেছেতার দাগ পোদ্দারটির। অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করতে করতে সে যখন মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে তার দিকে তাকায়, বলতে থাকে যে অনেক ভেজাল আর ময়লা মেশানো আছে গয়নাগুলির সোনার অঙ্গে, গিনির চেয়েও বিশ টাকার মতো কম হবে এ সোনার দর, ব্যাপারটা রাখাল বুঝতে পারে।

বুঝতে পারে যে তার ভাবসাব দেখেই পোদ্দার অনুমান করে নিয়েছে পিছনে গোলমাল আছে তার এই গয়না বেচতে আসার।

এক মুহূর্তের জন্য অবসন্ন বোধ করে রাখাল।

এক মুহূর্তের জন্যই। এক মুহূর্তে সে যেন নিজের সমস্ত জীবনের মূলমন্ত্র মনে মনে আউড়ে নেয়। না, সে চোর নয়। সে চুরি করেনি।

এ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

মুখ গম্ভীর করে কড়া সুরে সে বলে, তবে থাক, অন্য জায়গা দেখি। বিশ টাকা কম ! একী তামাশা পেয়েছ ? আমার ঘরের জিনিস, আমি জানি না সোনা কেমন ?

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়, রেগে বলে, থাক না মশায়, অত ঘষবেন না। আমার বাড়িতে বিপদ, নষ্ট করবার সময় আমার নেই।

পোদ্দার সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষ হয়ে যায়।

সবিনয়ে বলে, বসেন না বাবু, বসেন। ভুল সবারই হয়। ওহে সুবল, তুমি একবার দ্যাখো দিকিন—

তারপর একেবারে বিশ টাকা নয়, গিনি সোনার বাজার দরের চেয়ে চার টাকা কম ধরা হয় তার সোনার দাম। এ-বাবদে ও-বাবদে অবশ্য আরও কিছু বাদ যায়।

তা যাক। গলা কাটার অধিকার নিয়ে সকলে সব ব্যাবসা করবে এটাই প্রথা, এটাই প্রকাশ্য স্বীকৃত নিয়ম। একেও গলা কাটতে না দিলে চলবে কেন।

বাড়ি ফেরবার পথে সেই দোকানে বসে ঘণ্টুর দেওয়া এক কাপ চা খায়। বুকের কাঁপুনি একটু সামলে নেবার জন্য খায়, বুকে তার এতটুকু কাঁপন ধরেনি। শক্ত পাথর হয়ে গেছে হৃদয়টা। বিবেকের দংশনে কাতর হবার বিলাসিতা কি পোষায় তার মতো লোকের ?

ভয় ? না এতটুকু ভয়ও তার নেই। ভয় পাবার কোনো প্রয়োজনও সে অনুভব করে না। আবার কোনো বিশেষ উপলক্ষে গায়ে গয়না চাপাবার দরকার হলে তবেই হয়তো বিশুর মা টের পাবে তার গয়না কয়েকখানা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোনো কারণে আজকেই যদি টের পায়, যদি তাকে সন্দেহও করা হয়, কিছুই তার করতে পারবে না ওরা।

ঘরেই তাদের অনেক লোক, অনেক বাজে লোক। তাদের সকলকে বাদ দিয়ে তাকে জোব করে সন্দেহ করার সাহস পর্যন্ত ওদের হবে না।

ও সব চিন্তা নয়। শান্ত হয়ে বসে একটু তার ভাবা দরকার টাকাগুলি কীভাবে ব্যবহার করবে।

সব টাকাই কি কাজে লাগাবে এই অসহ্য দারিদ্র্য সাধনার পক্ষে একটু সহনীয় করে আনতে, যত দিন পারা যায় অথবা খানিকটা এই কাজে লাগিয়ে বাকিটা লাগালে কোনো স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টায় ?

সে চোর নয়। এ জগতে কারও কোনো ক্ষতি না কবে একজনের একস্তূপ অকেজো এবং অকারণ সোনার একটু অংশ না বলে নেবার সুযোগ আরও দু-একবার পাওয়া যাবে, এ চিন্তাটাই হাস্যকর। এ টাকা ফুরিয়ে গেলে আবার সে নিরুপায় হয়ে পড়বে একান্তভাবেই।

খুব সাবধানে চারিদিক হিসাব করে সব কিছু বিচার করে এ টাকা কাজে লাগাতে হবে।

শুধু সাময়িকভাবে নয়, সাধনাকে বাঁচাবাব একটা স্থায়ী ব্যবস্থাও যাতে সম্ভব হয়।

টাকাগুলি রাখবে কোথায় ? বাড়িতেই রাখবে। না, তার কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই। টাকাগুলি ধবা পড়লে অবশ্য সত্যটা সেটা প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে যে সে-ই গয়না নিয়েছে, বিপদেও সে পড়বে। কিন্তু সে চোর নয়, এ বিপদকে ভয় করলে তাব চলবে না। টাকাটা সাবধানে লুকিয়ে রাখার ফন্দিফাকর আঁটতে গেলেই সে মনেপ্রাণে এবং কার্যত চোর হয়ে যাবে !

সে চোর নয়। সে চুবি করেনি। কেউ তাব কিছু কববে না, করতে পারবে না। এই বিশ্বাস তার একমাত্র অবলম্বন। ভয়ের তাড়নায়, বিপদের কল্পনায় আত্মরক্ষার অস্বাভাবিক উপায় খুঁজে এই বিশ্বাসের গোড়া আলগা করে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তাব।

শেষ পর্যন্ত জগৎ যদি তাকে চোর বলে জানে, তাকে চোরের শাস্তি দেয়, এই বিশ্বাসের জোরেই মাথা উঁচু করে পরম অবজ্ঞাব সঙ্গে সেই শাস্তি সে গ্রহণ করতে পারবে।

ঘণ্টু বলে, একটা চপ খাবেন বাবু ? কাটলেট ?

একুশ শো সাতান্ন টাকা সাড়ে এগারো আনা পয়সা সঙ্গে আছে, তবু রাখাল মাথা নেড়ে বলে, না কিছু খাব না।

চপ কাটলেট খাবার পয়সা কোথায় ? তার নিজের সাড়ে এগারো আনা থেকে এক কাপ চা খাওয়া যেতে পারে, চপ কাটলেট খেলে তাব চলবে কেন ?

তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ টাকা সে জন্য নয়।

বাড়ি ফিরতেই সামনে পড়ে সঞ্জীব।

এই নিরীহ গোবেচারি মানুষটা বাড়িতে তাকে এড়িয়ে চলে বলে কিছু মনে করে না রাখাল। কেন এড়িয়ে চলে জেনে বরং তার একটু অনুকম্পা মেশানো করুণাই জাগে। আশার ভয়ে সে বাড়িতে তার সঙ্গে মেশে না, সে জন্য মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে বলে রাস্তায় বা দোকানে দেখা হলে যেচে নানাকথা আলাপ করে !

আপিস যাননি ?

মুখ কাঁচুমাচু করে সঞ্জীব বলে, না, আজকে যাইনি, শরীরটা ভালো নেই—

মল্লার মতো একটু সে হাসবার চেষ্টা করে। ভয়ে ভয়ে ঠিক চোরের মতোই এদিক ওদিক চেয়ে ঘরে চলে যায়।

বোধ হয় নিষিদ্ধ মানুষ তার সঙ্গে কথা বলার জন্য !

আশাকে তার এই পিটানি খাওয়া শিশুর মতো ভয় করে চলা উদ্ভট সৃষ্টিছাড়া মনে হয়। মনে হয় এ বুঝি শুধু নিবীহ মানুষের বশ্যতা স্বীকারের প্রশ্ন নয়, আরও কী আছে এর পিছনে, আশার কাছে সে বোধ হয় গুরুতর কোনো অপরাধে অপবাধী !

ঘরে গিয়ে কাগজে মোড়া নোটের বান্ডিলটা তার স্যুটকেসে কাপড়ের তলায় রেখে রাখাল সাধনার কাছ থেকে ছেলেকে নিয়ে আসে। তাকে বুকে নিযে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চাবি করতে করতে চিন্তাগুলি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, বাইবে গোলমাল শুনে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায় !

এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে মনকে শক্ত করে দৃঢ়পদে যে বাইরে আসে।

না, তার খোঁজে তার কাছে কেউ আসেনি।

আদালত থেকে লোক এসেছে ডিগ্রি জারি করে সঞ্জীবেব অস্থাবব মালপত্র ক্রোক করতে !

আদালতের লোকের সঙ্গে পাঞ্জাবি গায়ে মোটাসোটা মাঝবয়সি যে লোকটি এসেছিল, সে সঞ্জীবকে বলে, বেশ লোক তো তুমি, বাঃ ! হাতে পায়ে ধবে এক ঘণ্টা সময় চেয়ে নিযে ঘবে ঢুকে লুকিয়ে আছ ? সেই থেকে আমরা গাছতলায় ঠায় বসে আছি তোমার জন্য !

সঞ্জীব কথা কয় না।

লোকটি আবার বলে, ভেবেছিলে আমরা মতলব বুঝিনি তোমাব ? এক ঘণ্টা সময চেযে নিয়ে মালপত্র সরিয়ে ফেলবে ? গাছতলায় বসে নজর রাখব ভাবতে পাবনি, না ?

মাঝে মাঝে সকালের দিকে লোকটিকে আসতে দেখা গেছে সঞ্জীবেব কাছে। এসে কড়া নাড়তেই সঞ্জীব তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে যেত। আজ বোঝা যায়, সে আসত পাওনা টাকার জন্য তাগিদ দিতে !

রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আশা হাঁ করে বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে ছিল, সঞ্জীব হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলতে সে ছুটে আসে।

কী হয়েছে ? কী হয়েছে ? এ সব কী ব্যাপার ?

রাখাল এগিয়ে এসে সোজাসুজি ধমক দেয় সঞ্জীবকে, বলে, কাঁদছেন কেন কচিছেলেব মতো ? ঘরে যান, ঘরে গিয়ে দুজনে ঠান্ডা মাথায কথা বলুন, পরামর্শ করুন।

অন্য অবস্থায় তার স্বামীকে রাখাল এ ভাবে ধমকালে আশা বোধ হয তার গালে একটা চাপড় বসিয়ে দিত ! আজ সে নীরবে তার কথাই মেনে নেয।

সোজা ঘরে চলে যায। গিয়ে ধপাস করে বসে পড়ে তাব হালকা খাটের পরিষ্কার ধবধবে বিছানায়। সঞ্জীবও ঘরে যায় ধীরে ধীরে।

রাখাল বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয় !

পাওনাদার লোকটিকে বলে, দশ মিনিট সময় দিন বেচারাদের। বুঝতে পারছেন তো, ভদ্রলোক বাড়িতে কিছু জানাননি ? এবার হয়তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সাধনা এসে দাঁড়িয়েছিল রোয়াকে। তার মুখ দেখে মনে হয় সে যেন এইমাত্র আকাশ থেকে তার অজানা অচেনা এই অদ্ভুত পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছে।

আশাদের ঘরের ভিতর থেকে প্রথমে কোনো কথাই শোনা যায় না বাইরে। একটু পরেই গলা চড়ে যায় আশার। তার প্রতিটি কথা স্পষ্ট কানে আসে।

আমায় না জানিয়ে তুমি এত টাকা দেনা করেছ ! দেনা করে রেডিয়ো কিনেছ, কাপড় গয়না কিনেছ আমার জন্য ! এ দুর্বুদ্ধি কে দিল তোমাকে ?

কী করব ? মাইনেতে কুলোয় না—

সে কথা বলতে পারতে না আমায় ?

বলিনি ? কতবার বলেছি, টাকায় কুলোচ্ছে না, খরচা না কমালে চলবে না—

ওভাবে তো সবাই বলে। এদিকে বলছ খরচ কুলোয় না, ওদিকে শখ করে রেডিয়ো কিনে আনছ। কী করে আমি বুঝব তোমাব সত্যি কুলোয় না ?

আমি—

চুপ কবো। চুপ কবো তুমি। এখন কী উপায় কবা যায ভাবতে দাও আমায !

তার রান্নাঘর থেকে পোড়া গন্ধ বাব হয়। সাধনা তাড়াতাড়ি গিয়ে কড়াইটা উনান থেকে নামিয়ে রেখে আসে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপব অন্ধকাব থমথমে মুখ নিয়ে আশা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। পাড়ার যে দু-চারজন লোক ব্যাপার জানতে এসেছিল এবং এতক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপচাপ দাঁড়িযেছিল তাদেব দিকে একবার চেযে রাখালকে সে জিজ্ঞাসা করে, কাছাকাছি দোকান আছে রাখালবাবু, গয়না কেনে ?

বাজারের দিকে আছে।

আপনি একটু সঙ্গে যাবেন ওনার ? আমাব কটা গয়না বেচে টাকা নিয়ে আসবেন ?

রাখাল বলে, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট নেই আপনাদেব ?

সঞ্জীব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চুপচাপ দাঁড়িযেছিল, মৃদুস্বরে সে বলে, আছে, টাকা নেই।

রাখাল বলে, আমি বলি কী, গয়না না বেচে ব্যাংকে জমা দিযে লোনের ব্যবস্থা করুন। গযনা বেচলেই লোকসান।

আশা দাবুণ হতাশার সুরে বলে, ব্যাংক থেকে টাকা তো পাব কম ? ইনি যে আবও কয়েক জায়গায় দেনা করে বসেছেন। একবার বেচে না দিলে কি সব শোধ করা যাবে ?

তাদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা কবে নেবেন। একবারে কিছু দিয়ে তারপর মাসে মাসে কিছু কিছু শোধ দেবেন।

আশা নিশ্বাস ফেলে বলে, তাই ভালো। আপনি একটু সঙ্গে যাবেন তো ? ওঁকে দিয়ে আমার ভরসা হয না।

আশা অনাযাসে এ কথা বলে এবং কথাটা কাবও কানে বাজে না,—সাধনারও নয় ! কে না জানে যে আশার ভযেই সঞ্জীব বাখালকে বাড়িতে এড়িযে চলে কিন্তু মানুষকে এড়িযে চলার মতো শক্ত নয় বলে পথেঘাটে দোকানে দেখা হলে বাখালেব সঙ্গেই সে গায়ে পড়ে যেচে আলাপ করে। সেই আশা এখন বুদ্ধি পরামর্শ চাইছে রাখালেব কাছে, ঘোষণা কবেছে যে রাখাল ছাড়া সঞ্জীবকে দিয়ে তার ভরসা নেই ! এ সব কথা মনে পড়ে কিন্তু তুচ্ছ হয়ে যায়। এখন সে বিপদে পড়েছে, এখন তো বিচারের সময নয় আশার।

আশার এই আকস্মিক বিপদ সামলে দেবাব দায়িত্ব রাখাল আগেই নিয়েছে—যখন সে সঞ্জীবকে ধমক দিয়ে আশার সঙ্গে ঘরের মধ্যে পরামর্শ করতে পাঠিয়েছিল।

সে ছাড়া কার ভরসা করবে আশা ?

সঞ্জীব পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রাখাল কথা বলে পাওনাদার লোকটির সঙ্গে। গায়ের গয়না বাক্সের গয়না পুঁটলি করে এনে আশা হাতে তুলে দেয় রাখালের !

হাঙ্গামা সেরে রাখাল ফেরামাত্র ঘরে গিয়ে সাধনা বলে, এটা কী রকম ব্যাপার হল ? এমন ছেলেমানুষ ভদ্রলোক ?

ছেলেমানুষ, তবে খুব বেশি আর কী এমন ছেলেমানুষ ? শখের জন্য খেয়ালের জন্য যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দেয় না লোকে ? এ তো শুধু স্ত্রীকে খুশি রাখার জন্য কিছু দেনা করেছে। ভেবেছিল সামলে নেবে, জের টেনে চলতে চলতে বেসামাল হয়ে পড়েছে।

সব গোপন রেখেছিল স্ত্রীর কাছে !

গোপন না রাখলে কি খুশি রাখা যেত স্ত্রীকে ? স্বামী দেনা করে তাকে আরামে রেখেছে জানলে কোন স্ত্রী খুশি হয় ? এতটা গড়াবে এটা তো ভাবেনি সঞ্জীব। তারপব বেকায়দায় পড়ে দিবারাত্রি দুশ্চিন্তা করতে করতে একটু দিশাহারা হয়ে গেছে। নইলে মাল ক্রোক করতে এসেছে, গাছতলায় তাদের বসিয়ে রেখে এসেও মুখ ফুটে স্ত্রীকে বলতে পারে না ব্যাপারটা, চুপ করে বসে থাকে ?

তাই বটে। পুরুষ মানুষ কীভাবে কেঁদে ফেলল !

পুরুষ মানুষের কি কাঁদা বারণ ?—রাখাল হাসে, বলে, মাঝে মাঝে আমিও ভাবতাম, চাকরির পয়সায় মানুষটা এমন চাল বজায় রেখেছে কী করে ! আজকালকার দিনে দেড়শো দুশো টাকায় দুটি মানুষেরও ভালোমতো খাওয়া পরা থাকা চলে না।

রাখালের ভাবান্তর লক্ষ করছিল সাধনা, লক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে কোনো বোঝাপড়া হয়নি তাদের, কোনো কথাই হয়নি। এমন সহজভাবে রাখাল কথা বলছে, হাসছে, যেন তাদের মধ্যে কোনো বিবাদ বা বিভেদ কোনোদিন ছিল না, এখনও নেই।

আশাদের এই খাপছাড়া ব্যাপারটা ঘটায় রাখাল কি এখনকাব মতো একেবারে ভুলে গেছে সব ?

সে নিজেও যে সহজভাবেই কথা বলছে রাখালের সঙ্গে এটা খেয়াল হয় না সাধনাব।

খেয়ে উঠে রাখাল বলে, কই তোমার হারটা দাও।

সাধনা খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে।

তামাশা করছ না তো ? এত কাণ্ডের পর তুমি যেচে—

এত কাণ্ডের পর মানে ? আমি কি কখনও বলেছি তোমার ভাঙা হাবটা বদলে দেব না ?

মুখে না বললেও—

তুমি তাই ভেবে নিয়েছ ?

সাধনা একটু চুপ করে থেকে বলে, হাব আমি বেচে দিয়েছি।

কীভাবে কার কাছে বেচে দিয়েছে তাও সে খুলে বলে। একটু বেপরোয়া বেশ করেছির ভঙ্গিতেই বলে।

আমায় একবার জিজ্ঞাসাও করলে না ?

কেন করব ? তুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলে হারের কোনো ব্যবস্থা করবে না—

কবে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম ?

নইলে চেয়ে তো নিতে হারটা ?

তাই তো চাইলাম আজ। আজ আমার সময় আছে, সুবিধা আছে।

সাধনা ঠোঁট কামড়ায়। এই কী মানে তবে হঠাৎ তার সঙ্গে রাখালের সহজভাবে হাসিমুখে কথা বলার ? সমস্ত মনোমালিন্যের সমস্ত ভুল বোঝার দায়িত্ব সে তার ঘারে চাপিয়ে দিতে চায় ?

রাখাল বলে, যাকগে। টাকাটা আছে তো ? না খরচ করে ফেলেছ ?

টাকা আছে। আমি ভাবছিলাম নিজে গিয়ে কিনে আনব।

সে তো আমার ওপর রাগ করে ভাবছিলে।

রাগ হবার কারণ থাকলেই মানুষ রাগ করে।

রাখাল এ কথা এড়িয়ে গিয়ে বলে, তুমি নিজে গিয়ে দেখে শুনে পছন্দ করে আনলে কিন্তু মন্দ হয় না।

সাধনা বলে, যেমন হোক, তুমি আনলেই হবে। মিছিমিছি দুজনের ট্রামবাসের পয়সা খরচ।

রাখাল আশ্চর্য হয়ে যায়। তার সঙ্গে দোকানে গয়না কিনতে গেলে মিছামিছি একজনের ট্রামবাসের পয়সা বেশি লাগবে, এই হিসাব করছে সাধনা !

সাধনা তাকে টাকা বার করে দেয়। বলে, বলে দিচ্ছি শোনো। ওটা ছিল তিনভরি সাত আনি—যেমন প্যাটার্ন হোক তুমি আড়াই ভরির মতো আনবে। বাকি টাকা আমায় ফিরিয়ে দেবে।

কী করবে টাকা দিয়ে ?

বিপদ-আপদের জন্য তুলে রাখব !

রাখাল বেরিয়ে যাবার পর বহুদিন পরে আশা আজ তার ঘরে আসে !

তাকে দেখে বোঝা যায় না এইমাত্র তার গয়নাগুলি সে ব্যাংকে পাঠিয়ে দিয়েছে। গায়ে তার সামান্য গয়নাই থাকত, গা থেকে তাও সে খুলে দিয়েছে।

আশার দুঃখ হয়েছে না রাগ হয়েছে বুঝবার উপায় নেই। আচমকা সে যেন পড়ে গেছে এক বিষম ধাঁধায়। ব্যাপারটা ভালোমতো বুঝে উঠতে পারছে না।

বসে হঠাৎ ঘুম ভাঙা মানুষের মতো মুখ করে বলে, এমন অদ্ভুত মানুষও দেখেছ ভাই ?

তোমাকে যেমন ভালোবাসেন তেমনি ভয় করেন কিনা।

বাব্বা, জন্মে জন্মে আমার এমন ভালোবাসায় কাজ নেই ! ভালোবাসার চোটে আমার গয়নাগুলি যেতে বসেছে।

একটু থেমে আশা বলে, তোমাদের দেখে মনে হত, বাঃ, আমি তো বেশ সুখেই আছি ! বাস্‌রে, এই নাকি সেই সুখ ! চাদ্দিকে দেনা করে করে আমায় একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। রেডিয়ো ফেডিয়ো সব বেচে দিয়ে একেবারে আদ্দেক করে ফেলতে হবে খরচ। মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে আমার। প্রথম থেকে বললেই হত চাল কমিয়ে দিতে হবে। গরিব মানুষ, গরিবের মতোই থাকতাম !

সাধনার গলার দিকে চেয়ে সহজ সহানুভূতির সঙ্গে আশা জিজ্ঞাসা করে, গলারটাও বেচতে হয়েছে নাকি ?

না। ভেঙে গেছে, বদলাতে দিয়েছি।

বলে সে হাসে।

বেচতে হয়তো হবে দুদিন বাদে !

রাখালের এনে দেওয়া নতুন হার পরে সাধনা রেবার বিয়েতে যাবে। যাবে কী যাবে না দোলায় মন তার দোল খায়। একবার ভাবে, কেন যাব না ? আবার ভাবে, কী লাভ হবে গিয়ে ?

রাখাল বলেছে, দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হবার কথা। তাকে বিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সে নিজের কাজে যাবে, সন্ধ্যার পর ফিরে আসবে বিয়ে বাড়িতে।

কেলাকে কানপাশা দিতে হবে না সাধনার। কোথা থেকে নাকি কিছু বাড়তি টাকা পাবে রাখাল, রেবার জন্য একটা দুল সে কিনে নিয়ে যাবে।

বাসন্তীকে নতুন হারটা একবার দেখানো উচিত ভেবে সাধনা সেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার বদলে গলায় লটকে দেয়। ও বাড়তে গিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে চোখে পলক পড়ে না সাধনার। গায়ে তার গয়নার চিহ্নও যেন নেই। এত গয়না সে সর্বদা গায়ে চাপিয়ে রাখত যে গলার একটা হার আর হাতে শুধু দুগাছা করে চুড়ি থাকায় তাকে যেন উলঙ্গিনি মনে হচ্ছে।

সাধনা বলে, এ কী ব্যাপার ?

বাসন্তী বলে, আর বলো কেন ভাই। আমার যথাসর্বস্ব গেছে।

চুরি হয়ে গেছে ? কখন চুরি গেল ?

চুরি নয়। ওনার সেই যে বজ্জাত পার্টনারটা মিথ্যে চাকরির খবর জানিয়ে তোমাদের কাছে আমার গালে চুনকালি মাখিয়েছে, সেই ব্যাটার কাজ। ফন্দি করে ওনাকে একেবারে ডুবিয়ে দিতে বসেছিল।

সাধনা বলে, কিন্তু তোমার গয়না—?

বাসন্তী বলে, ওনাকে বাঁচাবার জন্য সব দিতে হয়েছে। শুধু গয়না নয় ভাই, পয়সাকড়ি সোনা-টোনা যা জমিয়েছিলাম, সব ঢেলে দিতে হয়েছে। কী কবি, গয়না গেলে পয়সা গেলে আবার আসবে, সোয়ামি গেলে আর তো পাব না!

নিজের হারের কথা না তুলেই সাধনা ঘরে ফেরে।

রাখাল বলে, ট্যাক্সি আনব?

সাধনা বলে, না, ট্যাক্সি লাগবে না।

কেন?

আমরা ও বিয়েতে যাব না। বেলা পড়ে এলে তুমি আমি দুজনে ভোলার মার মেয়েব বিয়ে দেখতে যাব।

হারটার জন্য অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। নতুন হার বাক্সে তুলে রেখে সাধনা গলাটা আবাব খালি করে ফেলে।

সোনার চেয়ে দামি

(দ্বিতীয় খণ্ড)

লেখকের কথা

পরিকল্পনা ছিল প্রথম খণ্ডের মতো তিনটি খণ্ডে সোনার চেয়ে দামি কিছুটার দাম কষব। দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার সময় দেখলাম তৃতীয় খণ্ডকে পৃথক করা যায় না।

প্রথম খণ্ডের চেয়ে তাই দ্বিতীয় খণ্ড অনেক বড়ো হয়ে গেল। বিজ্ঞাপিত ডাকনাম 'মালিক' হয়ে গেল 'আপস'।

আপস

১

সোনা ওজনে খুব ভারী।

সোনা নামক ধাতুর এই বিশেষ গুণের খবর কলেজে পড়বার সময়েই রাখাল জেনেছিল। জেনেছিল বই পড়ে। সোনার চেয়ে ভারী সোনার চেয়ে দামি ধাতু আছে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। যেমন এটম বোমা তৈরির ধাতু আবিষ্কার করতে হয়েছে বিজ্ঞানকেই এগিয়ে গিয়ে। বিজ্ঞান শুধু নতুন খোঁজে—নতুন পথ, নতুন বিকাশ, বস্তু ও জীবনেব নতুন নাম।

দামের হিসাবে সোনাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান।

কিন্তু তবু সোনার চেয়ে দামি হতে পারেনি সেই ধাতু যে ধাতু দিয়ে মানুষ আজকাল এটম বোমা বানায়।

এখনও সোনাই মানুষের সবচেয়ে জানাচেনা আপন পদার্থ, সোনাকেই মানুষ আরও বেশি বেশি আপন করতে চায়, সোনা দিয়ে মুড়ে রাখতে ব্যাকুল হয়ে থাকে চিন্তাভাবনা আশা আকাঙ্ক্ষা।

সোনার রঙেই সবচেয়ে রঙিন হয় জীবন !

কী ওজনে আর কী দামে সোনার সাথে পাল্লা দিতে পারে যে অসাধাবণ ধাতু, সে ধাতুর সঙ্গে পরিচয় নেই সাধারণ মানুষের।

প্রয়োজনও নেই। সোনাই মানুষের। আদরেব সোনামানিক।

জানা কথাটা রাখালেব অভিজ্ঞতায় যাচাই হয়েছিল সেদিন, বিশুকে পড়াতে গিয়ে ঘর খালি পেয়ে বিশুব মার একরাশি গয়নাব সামান্য একটা অংশ যেদিন না বলে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। গয়না কটাব ওজন তাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল।

রাখাল জেনেছে, সোনার আরেকটা ওজন আছে।

অন্য রকম ওজন।

অবস্থার ফেরে সোনা যখন চাপ দেবার সুযোগ পায় মানুষের বিবেকে, তখন বিবেকে চাপানো সেই সোনার চেয়ে ভারী আর কিছুই থাকে না এ জগতে।

ফাঁক পেলেই সোনা বিবেকে চেপে বসে।

যুক্তি অযুক্তি কিছুই খাটে না, মনের জোরে তুচ্ছ করা যায় না, বেপরোয়া বেশ করেছি মনোভাব দিয়ে দেওয়া যায় না উড়িয়ে।

না বলে একজনের গয়না ধার হিসাবে নিলেও বিবেককে সে গয়না কামড়াবেই কামড়াবে। চোর হয়ে চুরি করলেই বরং এত বেশি কামড়ায় না। চোর ছ্যাচোরের কাছে সোনার চেয়ে দামি কিছুই নেই !

বড়ো বড়ো রাজা মন্ত্রী চোরের বিবেকে একেবারেই কামড়ায় না। প্রত্যক্ষ প্রকাশ্যভাবে কামড়ায় না। বিশেষভাবে চুরি করার বিশেষত্বকে দেশসেবায় নীতি হিসাবে প্রচার করার প্রচণ্ড নেশায় মশগুল হয়ে থাকে।

জেনে বুঝে চোর হলে তো ফুরিয়েই গেল বিবেকের বালাই, বিবেক বিসর্জন দিয়ে চুরি করলাম। চোর আমি হব না কিছুতেই—এ সংস্কারকেও খাতির করব, আবার চোর যা করে ঠিক সেই কাজটাই করব কতগুলি যুক্তি খাড়া করে, এতে কী আর রেহাই মেলে।

নিজেকে রাখাল চোর ভাবে। তবু বিবেক কামড়ায়।

কারণ নিজের কাছে সে অস্বীকার করে না যে নিজের হিসাব তার যাই হোক, দশজনের হিসাবে সে চোর ছাড়া কিছুই নয় !

দশজনের হিসাবে চোর হলেও নিজের হিসাবে চোর নয় ! এ কি নীতি ভাঙবার জন্য নৈতিক সমর্থন সৃষ্টির সেই চির পুরাতন ধাপ্পাবাজি নয় ? বড়ো বড়ো অনেক নীতিজ্ঞ মহাপুরুষ যে নৈতিক ধাপ্পাবাজির জোরে মানুষের সুখ সম্পদ স্বাধীনতা চুরি করে ? ধরতে গেলে আসলে যাদের কল্যাণে রাখালকে নিরুপায় হয়ে উদ্‌বাস্তু এক জমিদারের বউয়ের সেকেলে ধরনের শ্রদ্ধা মেশানো স্নেহে তাকে আপন করার সুযোগ নিয়ে তারই অনেক গয়নার ক্ষুদ্র অংশ গয়না কটা না বলে নিতে হয়েছে ?

এ সব জানে রাখাল।

এ সব প্যাঁচ কষে, এ সব ফাঁকি দিয়ে নিজেকে ভোলাতে পারলে তো কথাই ছিল না। তার কাজ করার এবং উপার্জনের অধিকার অন্যে চুরি করেছে বলেই তার চুরিটা চুরি নয়, এটা শুধু হাস্যকর অজুহাত কেন, নৈতিক যুক্তিই নয় রাখালের কাছে। যে স্বার্থ চুরি-চামারিকে প্রশ্রয় দিয়ে বাড়িয়েছে শতগুণ সেটাই যে আবার সংগ্রামেব পথে সাধাবণ মানুষের বীব মানুষ হওয়ার রেট লক্ষগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, এ দিকটা ভুললে চলবে কেন তার ?

ছাঁটাই হয়ে বেকার হয়ে বছর দেড়েক সেও কি অংশ নেয়নি এই বাঁচার সংগ্রামে ?

অন্যায়কে নিজের অন্যায়ের কৈফিয়ত দাঁড় করাবার ফাঁকি রাখাল জানে।

কোনো নৈতিক সমর্থনই সে সৃষ্টি করেনি নিজের কাজের। সমস্ত কাহিনি শুনে কেউ যদি তাকে চোর বলে, সে প্রতিবাদ করতে যাবে না। এইটাই তার দশজনের হিসাবে নিজেকে চোর মনে করার মানে।

তার নিজের হিসাবের মানেটা খুব সোজা। বিশুর মার গয়না সে চুরি কবেনি, শুধু সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে নিয়েছে। ঋণ হিসাবে নিয়েছে।

প্রচুর গয়না আছে বিশুর মার। একেবাবে অকেজো অনাবশ্যক মাটির ঢেলার মতোই রাশিকৃত সোনা তোরঙ্গে পড়ে আছে। এই সামান্য ক-খানা গয়নার অভাব টেরও পাবে না বিশুর মা।

না জানিয়ে চুপিচুপি নিয়েছে। কিন্তু আর কী উপায় ছিল ? বলে কয়ে নিতে চাইলে এ জগতে কে তাকে দিচ্ছে ঋণ ? কে স্বীকার করছে যে বেকার নিরুপায় তারও যোগ্যতা আছে দাবি আছে ঋণ পাবার ?

সরকারের পর্যন্ত ঋণ দরকার হয়, সকলের ধন কেড়ে নিয়ে যে ক-জন হয়েছে কুবেরের মতো ধনী, তাদের বশংবদ যে সরকার। সরকার কোটি টাকা ঋণ চাইলে কয়েক ঘণ্টায় সে টাকা উঠে যায়। ঋণ দিতে উৎসুক অনেকের টাকা বাতিল করতে হয়।

তাকে কে ঋণ দিচ্ছে পাঁচটা টাকা ?

কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রাশি রাশি সোনা অকেজো করে যদি ফেলে রাখতে পারে মানুষ, সেও তার চরম প্রয়োজনের সময় না বলে তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ ধার নিতে পারে।

সাধনা যখন ভেঙে পড়েছে, সেই সঙ্গে ভেঙে চুরমার করে দেবার উপক্রম করেছে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন, আর কোনো উপায় না থাকলে এভাবে ঋণগ্রহণের অধিকার তার নিশ্চয় জন্মায়।

সাধারণ সুখের লোভে, সাধারণ অভাব অনটনের হাত থেকে রেহাই পেতে সে বিশুর মার গয়নাগুলি নেয়নি। এদিক দিয়ে সে খাঁটি থেকেছে নিজের কাছে। গয়না ক-টা বেচে দুহাজারেরও বেশি টাকা পকেটে নিয়ে খিদেয় যখন ঝিমঝিম করছিল জগৎ তখনও সে প্রশ্রয় দেয়নি একটি চপ খাবার ইচ্ছাকে। ওই দুহাজার টাকা নয়, পকেটে হাত দিয়ে হিসাব করেছিল নিজের এগারো আনা পয়সার !

সাধনাই ছিল তার সবার সেরা যুক্তি।

আকস্মিক বেকারির অসহ্য চাপে সাধনার সাময়িক উন্মত্ততা সামলাতে হবেই, যেভাবে হোক ঠেকাতে হবেই তার নিজেকে ধ্বংস করার সঙ্গে স্বামীপুত্র সংসারটাও ধ্বংস করে দেওয়া। বিশুর মার গয়না নেওয়া উচিত কী অনুচিত সে বিবেচনার সুযোগ পাবে অনেক, সাধনার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে না করলে সারা জীবনটাই তাদের যাবে ভেস্তে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু তার এই হিসাবটাই সাধনা দিয়েছে ভেস্তে।

সাধনা এক রকম তার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে অতটা বিগড়ে সে যায়নি, এত বেশি অসহ্য তার হয়নি স্বামীর বেকারত্বের দুর্দশা যে আত্মহারা হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে সে ভেঙে পড়বে। তার জন্য বিশুর মার গয়না নেবার কোনোই দরকার ছিল না রাখালের !

শুধু তাই নয়।

যেদিক দিয়ে যেভাবে তার উচিত ছিল অবস্থাটা সহনীয় করতে সাধনাকে সাহায্য করা, সেদিক দিয়ে সেভাবে কোনো সাহায্যই সে করেনি তাকে। তাকে নরম জেনে দুর্বল জেনে তেমনি রেখে দিতে চেয়েছে। চরম দুর্দিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে এতটুকু ভাগাভাগি করতে চায়নি বাঁচার ও বাঁচাবার দায়িত্ব, স্বামীত্বের অহংকারে আগের মতোই সাধনাকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছে জীবনসংগ্রামের সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে। একাই সে দিবারাত্রি ভেবেছে কীসে কী হবে আর কীভাবে কী করা যাবে, অথচ বিশেষ কিছু করতে না পেরেও দাবি ঠিক খাড়া রেখেছে যে যতটুকু সে করতে পারে তাই মানতে হবে সাধনাকে, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শান্তভাবে সমস্ত নতুন দুঃখকষ্ট সয়ে যেতে হবে।

সেই একমাত্র রক্ষাকর্তা সাধনার। তাকে রক্ষা করার জন্য যে অমানুষিক চেষ্টা আর পরিশ্রম সে করে চলেছে তাতেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সাধনার।

আর কিছুই তার করার দরকার নেই। কৃতজ্ঞ থাকবে আর নীরবে অবিচলিতভাবে সব সয়ে যাবে। তার না জানলেও চলবে সমস্যাটা কী এবং তার ভারটা লাঘব করতে কিছু না করলেও চলবে।

সাধনারও যে প্রয়োজন আছে নতুন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করা, এটা সে খেয়ালও করেনি !

এই ঘরের কোণে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবন যাপন করতে করতে আশেপাশের জীবনের বাস্তবতা থেকে সাধনা নিজেই ধরতে পেরেছে এবার তারও একটু বদলানো দরকার, শুধু আগের দিনের শোকে কাতর হয়ে থাকলে চলবে না। নিজের প্রয়োজনে নিজের তাগিদেই সাধনা হতাশাকে ঠেকিয়েছে, খানিকটা বদলে দিয়েছে নিজেকে।

সে তাই কৃতজ্ঞতা পায়নি সাধনার। তাকে শুধু ক্ষমা করে মেনে নিয়েছে।

বিশুর মার গয়না বেচা টাকা রোজগারের উপায়ে লাগিয়ে ক্রমে ক্রমে অবস্থার খানিকটা উন্নতি করেও সে সাধনার কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে না। সে তাকে শেখায়নি মিলেমিশে চরম দুর্গতিকে গ্রহণ করার প্রয়োজন, তাদের সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্য সচেতনভাবে জবরদস্ত শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে তার পাশে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন।

অতি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাধনাকে এটা বুঝতে হয়েছিল—একা একা।

সে শুধু আপস করেছিল। রাখালের সঙ্গে নয়, বাস্তবতার সঙ্গে।

রাখাল কীভাবে প্রাণপাত করে নিজের বিবেককে পর্যন্ত বাঁধা রেখে সর্বনাশের মোড় ঘুরিয়েছে, দুরবস্থাকে আয়ত্ত করেছে, সে জন্য মাথাব্যথা নেই সাধনার।

কর্তব্য করছে বাখাল। যা সে নিজেই করতে চায়, একলা করতে চায, যা করে সে স্বামী হয়ে থাকতে চায় সাধনার, সেটুকু শুধু করছে রাখাল !

আগে আপিসে চাকরি করে করত। এখন অন্যভাবে সেই কাজ করছে।

তার বিবেক বাঁধা রাখাব আসল ব্যাপারটা অবশ্য সাধনা জানে না। তাকে সে জানায়নি। বিশুব মার গয়নার কথা খুলে জানিয়ে অনর্থক তার মনের শান্তি নষ্ট করার কোনো মানেই রাখাল খুঁজে পায় না।

হঠাৎ এতগুলি টাকা সে কোথায় পেল তার কৈফিয়ত হিসাবে জানিযেছে যে হীনতা স্বীকার করে চেনা একজন ধনীর কাছে টাকাটা সে ঋণ নিয়েছে, শোধ দিতে না পারলে দায়ে ঠেকবে।

নিজের কাছে দাযে ঠেকবে, নিজের বিবেকের কাছে !

দেখো, যেন বিপদে পড়ো না !

আজও রাত নটা-দশটায় ফিরতে হয। তবে বাসেই ফিবতে পাবে। পুরো প্যাকেট সিগাবেট পকেটে নিয়ে।

খাওয়ার আগে বিশ্রামের ছলেও একটা সিগারেট টানা যায়। বিয়েতে পাওয়া খাটেব বিছানায পা তুলে বসে সিগারেটে টান দিয়ে হাসবার চেষ্টা করে রাখাল বলে, উঃ, কী ভীষণ দিনগুলিই গেল !

সাধনা যন্ত্রের মতো সায় দিয়ে বলে, সত্যি।

তুমি পেট ভরে ভাত পেতে না, একফোঁটা দুধ পর্যন্ত পেতে না !

সত্যি। দুধ খেতে আমার ঘেন্না করে।

খোকনকে তিনপোয়া দুধ খাওয়াও তো ?

কী করে খাওয়াব ? পেট ছেড়েছে যে। আজ সারাদিন শুধু বার্লি খাইয়েছি।

এমন কিছু বড়োলোক হযে যাযনি রাখাল। একটু সামলে উঠতে পেরেই দু-একটা দিকে বাড়াবাড়ি করার তার ঝোঁক চেপেছে। ছেলেটা মোটে একপোয়া দুধ খেত আর টেনে টেনে টনটনিয়ে দিত সাধনার মাই, তাই সে একজন বাঙালি গোয়ালিনি আর একজন পশ্চিমা গোয়ালার কাছে দুধ রোজ করেছে দুসের।

নামেই অবশ্য দুসের দুধ। খাঁটি দুধেব জলীয় সংস্করণ। মানবী মা হোক আর গোমাতাই হোক কারও দুধ জমাট বস্তু নয়। খাঁটি দুধও জলের দ্বারাই তরল হয়ে থাকে। কিন্তু রাখাল যে দুসের দুধ রোজ করেছে তার মধ্যে সেরখানেক বাড়তি জল।

কল আর পুকুরের জল।

শুধুই কি কলের জল আব পুকুবের জল ?

দেশসেবা, ত্যাগ আর গণতন্ত্রের নামে সর্বাঙ্গীণ চোরামির যুগে দুধ-বেচুনেরাও কি আয়ত্ত করবে না সামনে দাঁড়িয়ে গোরুব বাঁট থেকে জলহীন বালতিতে দুধ ঝরে পড়াটা শ্যেনদৃষ্টিতে দেখে যে দুধ কিনবে তাকেও ঠকাতে ?

গোমাতার মুখের খাদ্য কন্ট্রোল করে বাঁট থেকে ঝরা খাঁটি দুধকে কলের বা পুকুরের (কখনও নর্দমার) জল মেশানো দুধের মতোই পরিমাণে বাড়তি তরল করার কৌশল তারা জানে।

রাখাল তাই বলে, কেন মিছে মাথা গরম করছ ? একটাকা সের চাল যে হিসাবে কিনি, জল মেশানো দুধও কিনি সেই হিসাবে। চোরাবাজারি চালের দাম দুধের দাম অনুপাতে ঠিক আছে।

মানেটা এই যে চাল আছে কন্ট্রোলে তাই তার চোরাবাজার। দুধ কন্ট্রোলে নেই তাই তাতে ভাঁওতা।

ভগীরথের গঙ্গা আনার মতো সে যেন দুধের বন্যা এনে দেবে না খেয়ে শুকিয়ে আমসি-বনা তার বউ আর ছেলের পেটে।

রাখাল চিন্তিত হয়ে বলে, খোকনের দুধ হজম হয় না ? তোমার দুধ খেতে ঘেন্না হয় ? কে জানে বাবা এ সব কী ব্যাপার !

খেতে বসে আশা করে, সাধনা মাছের কথা তুলবে। নিজে থেকে ভালো মাছ এনেছে, বেশি করে এনেছে—দুজন মানুষের জন্য তিনপোয়া মাছ। কিন্তু সাধনা সাধারণ কথাই বলে, মাছ সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করে না।

একদিন মাছের কড়াই উনানে উলটে দিয়েছিলে, মনে আছে ?

মনে থাকবে না ? ভাপ লেগে সারাদিন মুখটা জ্বালা করেছিল। যেমন বোকার মতো রেগেছিলাম, তার শাস্তি।

সাধনা হাসে, সহজ শান্তভাবে। জিজ্ঞাসাও করে মাছটা রান্না কেমন হয়েছে, আরেক টুকরো খাবে নাকি রাখাল ? কিন্তু মাছ ভালোবাসে বলে তার জন্য বেশি করে মাছ আনায় সে বিশেষভাবে খুশি হয়েছে কিনা টেরও পাওয়া যায় না।

একটু আনমনা উদাসীন ভাব সাধনার। বছরখানেক দুঃখের আগুনে পুড়তে পুড়তেও তার যে প্রাণশক্তি, ছোটো সংসারটি নিয়ে মেতে থাকার যে আবেগ উদ্দীপনা বজায় ছিল, একটু স্বচ্ছলতা ফিরে আসতেই যেন তা শেষ হয়ে গিয়েছে। তার আনন্দ ছিল যেমন উচ্ছল, রাগ অভিমানও ছিল তেমনি প্রচণ্ড।

খুশির কারণ ঘটলে আগের মতো ডগমগ হয়ে না উঠুক, তেজের সঙ্গে একবার যদি সে রাগও করত !

কোমর বেঁধে প্রাণ খুলে একবার ঝগড়া করত রাখালের সঙ্গে !

সম্পর্ক তাদের বজায় আছে আগের মতোই, আগের মতোই তার বউ হয়ে আছে সাধনা, মা হয়ে আছে তার ছেলের, সংসার করছে—কিন্তু কেমন একটু শান্ত সংযতভাবে, একটু আবেগহীনভাবে।

আগের মতো সাধনা আর নেই।

আজকাল সে খুব পাড়া বেড়ায়।

উদ্‌বাস্তু কলোনিটাতে রোজই একবার ঘুরে আসে। সাধনার কাছ থেকেই রাখাল শুনতে পায় এই সংকীর্ণ এলাকার বাইরের জগৎটুকুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার নানা বিবরণ।

রাখালের মনে হয়, সাধনা কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে পাড়ার ঘরে ঘরে আর উদ্‌বাস্তুদের ওই ছোটো বসতিটুকুতে।

আগেও সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরাখবর রাখত আশেপাশের ঘরে ঘরে কী ঘটছে না ঘটছে। তিন-চারটি বাড়ির সাত-আটটি পরিবারের জীবনযাত্রা তার প্রায় নখদর্পণে ছিল, কার ঘরে কী রান্না হয়েছে আর কার একটু সর্দি হয়েছে সে খবর থেকে কার দূর দেশের আত্মীয়স্বজন কী বিষয়ে চিঠি লিখেছে সে খবর পর্যন্ত। কেবল সাধনা বলে নয়, সব বাড়ির মেয়েরাই এ রকম খবরাখবর রেখে থাকে। শহরতলি পাড়ায় এটা আজও বজায় আছে, মেয়েদের মৌখিক গেজেটে প্রত্যেক পরিবারের খবরাখবর অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের জানাজানি হয়।

সাধনা হয়তো ন-মাসে ছ-মাসে কদাচিৎ পাঁচ-দশমিনিটের জন্য যায় মল্লিকদের বাড়ি, কিন্তু বীরেন দত্তের বউটির সঙ্গে তার খুব ভাব।

তার নাম প্রতিভা।

প্রতিভার আবার গলায় গলায় ভাব মল্লিকদের বাড়ির শোভার সঙ্গে।

প্রতিভার কাছে সাধনা হাঁড়ির খবর পায় মল্লিকদের, তারই মারফতে আবার সাধনার হাঁড়ির খবর পৌঁছে যায় মল্লিকদের বাড়ি। যা শোনে এবং যা জানে সাধনা আবার তা শোনায় আরও দু-একজনকে যাদের সঙ্গে তার ভাব আছে। তাদের কাছে খবর শোনে অন্য বাড়ির।

তারা আবার শোনায় অন্যদের।

এমনিভাবে জানাজানি হয়।

একজনকে যে পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে হয় তা নয়, সব বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয় তাও নয়। দু-চারজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেই যথেষ্ট। পাড়ার কোনো বাড়ির মানুষের চালচলন স্বভাবচরিত্র, সংসারের অবস্থা আর গতি-প্রকৃতি কিছুই তার কাছে গোপন থাকে না।

কিন্তু সে ছিল আলাদা ব্যাপার। সে ছিল শুধু তথ্য জেনে কৌতূহল মেটানো। আজকাল সাধনার শুধু খবর শুনে সাধ মেটে না, নিজে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা করে আসে মানুষগুলির সঙ্গে। যে বাড়িতে তার ছিল ন-মাসে ছ-মাসে একদিন বেড়াতে যাওয়া, নিতান্তই নিয়ম রক্ষার জন্য, সে বাড়িতে আজকাল সে ঘনঘন যাতায়াত করে। যাদের সে পছন্দ করত না, যাদের সঙ্গ ছিল বিরক্তিকর, যেচে গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করে।

ছোটোবড়ো নীড়গুলিতে ছড়ানো জীবনে সে যেন সন্ধান করছে গভীরতর কোনো তাৎপর্য, নতুন কোনো মানে বুঝবার চেষ্টা করছে চেনা মানুষগুলির জানা জীবনের।

জানা জীবন ভেঙে পড়ছে, গতি নিয়েছে অজানা অনিবার্য পরিণতির দিকে। তা, জীবন তো আর ধ্বংস হয় না। ধ্বংস হচ্ছে অবস্থাটা। ধ্বংসের পথে কোনো নতুন অবস্থায় জীবন আবার নতুন রূপ নিতে চলেছে জানবার বুঝবার জন্য কৌতূহলের সীমা নেই সাধনার।

তারও কিনা সেই একই পথে গতি !

রাখালের কাছে আজকাল শুধু সে পাড়ার গল্পই করে না, অনেক জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়ে যায় তার বর্ণনায়। রাখালকেই সে প্রশ্ন করে তা নয়। তার নিজের মনেই জেগেছে প্রশ্নগুলি এবং সর্বত্রই সে খুঁজছে জবাব, সেগুলির যেটুকু ক্ষেত্র তার অধিগম্য, যে ক-জন মানুষ তার জানা-চেনা। শকুন্তলাকে যে দেখতে এসেছিল আধবুড়ো বিপত্নীক এক ব্যবসায়ী সে গল্প শোনানোর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে তার এই জিজ্ঞাসা তুলে ধরা যে বিয়ে ছাড়া গতি নেই মেয়েটার, আর কোনো যোগ্যতার ব্যবস্থা করা হয়নি, তবু মেয়েটার বিয়ে দিতে এত উদাসীন কেন ওর বাপ-ভাই ? এমন খারাপ অবস্থা তো নয় যে বিয়ে দিতে পারছে না ? মানুষও তো ওরা খারাপ নয়, বজ্জাত নয় ? মেয়েরও তো এমন কোনো খুঁত নেই, বাপ-ভাই যাকে ঠিক করুক তাকেই বিয়ে করতেও সে রাজি ? এমনভাবে বয়স বেড়ে চলেছে, আগে হলে বাড়ির লোক কবে পাগল হয়ে উঠত মেয়েটাকে পার করার জন্য, আজ কোথা থেকে কীভাবে এই অদ্ভুত গা-ছাড়া নিশ্চেষ্ট ভাব এল ? এর আসল মানেটা কী ?

এটা বিশেষভাবে শকুন্তলা সম্পর্কে প্রশ্ন। অবিকল না হলেও মোটামুটি একই রকম প্রশ্ন জাগে লতিকা আর অমিয়ার সম্পর্কে।

বিয়ে তাদের হচ্ছে না কেন ?

কয়েক বছর আগে এ রকম পরিবারের এই বয়সের এ রকম মেয়েদের কুমারী দেখা যেত না। স্কুল-কলেজে পড়ে, টাইপরাইটিং শেখে, ভুখা মানুষদের ওপর গুলি চললে এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে দেয়, সে রকম মেয়ে এরা নয়।

আগের মতোই ঘরে ক, খ শেখা সেলাই শেখা রান্না শেখা অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি করা সব মেয়ে।

নীচের ভাড়াটের সঙ্গে দত্তদের যে আরেকবার মারামারি বাধবার উপক্রম হয়েছিল তাতে সাধনা আশ্চর্য হয়নি। সে ভেবে পায় না দুটি শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মেয়েরাও কী করে নামল এই ঝগড়ায়, গলা চড়িয়ে কুৎসিত ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি দিল ? সে তো নিজে গিয়ে দেখে এসেছে যে এ দুটি বাড়ির মেয়েরা ছোটোলোক হয়ে যায়নি, তবু ?

নীরেন দত্তের স্ত্রী বিভাবতী নিজে শিক্ষিতা, লেখাপড়ায় নাচে গানে তার মেয়ে দুটি এ পাড়ায় অতুলনীয়া, ভাড়াটে সুধীর মুখার্জির স্ত্রীর এমন মিশুক স্বভাব, তার ছেলের বউ অঞ্জলি এমন লাজুক প্রকৃতির, তার মেয়ে নমিতার এমন সরল হাসি মিষ্টি কথা—তবু ?

সেনদের নতুন রাঁধুনিটাও আবার পালিয়ে গেছে জানিয়ে সাধনা আগের মতো বিনয় সেনের বউ সুহাসিনীর মন্দ স্বভাবের কথা বলে ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করে দেয় না, ওদের বাড়ি ঝি রাঁধুনি টেকে না কেন এ রহস্যকে নতুন করে তুলে ধরে মাথা ঘামায়।

সুহাসিনীর স্বভাবের জন্য হতেই পারে না, অন্য কারণ আছে।

বারোমাস রোগে ভুগে সত্যি ভারী খিটখিটে স্বভাব হয়েছিল, কিন্তু পরপর দুটি ছেলে মরে গিয়ে সে তো শোকে কাবু হয়ে বিছানা নিয়েছে, ভালোমন্দ কোনো কথাই কাউকে বলে না ? চাকর ঠাকুর ঝি রাঁধুনির উপর বরাবর সে সংসারের সব ভার ছেড়ে দেয়, আগে তবু দেখাশোনা করত তারা কী করছে না করছে, আজকাল তো জিজ্ঞাসাও করে না ? রাঁধুনিটার হাতেই সে তো সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল, সে যা করে তাই সই, তবু কেন তিনদিন কাজ করেই এ লোকটাও পালিয়ে গেল ?

কেন বারবার এ ব্যাপার ঘটবে, কারণ কী ?

ঘোষালদের বাড়িতে লোক বেশি, খাটুনি বেশি, মাইনে কম ; ঘোষাল-গিন্নির যেমন ছুঁচিবাই তেমনি চব্বিশ ঘণ্টা খেঁচাখেঁচি বলে ওদের কাজ ছেড়ে এসেছিল রাঁধুনিটা এ বাড়িতে। এখানে ছোটো সংসারে বেশি বেতনে নিজের খুশিমতো নির্বিবাদে কাজ করার সুযোগ পেয়েও আবার কেন ফিরে গেল ঘোষালদের বাড়িতে ?

আশি টাকা উপার্জনে একখানা ঘরে পরেশের সংসার, তনটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, এক ফোঁটা দুধ রাখে না। দুধ ছাড়া যদি না চলে ছেলেপিলের, ওরা বেঁচে আছে কী করে ? খেলাধুলো করার জোর কোথায় পায় ? আবার যে ছেলেপিলে হবে পরেশের বউ অমলার, সে জন্য ওদের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই কেন ?

ওরা অবশ্য বলে যে মরতে বসেছি। কিন্তু মুখে বললেই তো হয় না। দুশ্চিন্তায় ওরা পাগল হয়ে গেল কই ?

কাছেই ওই উদ্‌বাস্তু কলোনি, ওদের একই দেশ থেকে যারা এসে বাড়ি কিনেছে এখানে, তারা কেন ভুলেও দেশের লোকের কলোনিতে পা দেয় না ? রাখালের ছাত্র বিশুর বাড়ির লোকেরা কেন এড়িয়ে চলে কলোনির হোগলার ঘরের বাসিন্দা দেশের লোককে ·

এমনি কতভাবের কত যে জিজ্ঞাসা সাধনার।

শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় রাখাল। সাধনাকে তার মনে হয় আনমনা উদাসীন—তাকেও যে সাধনার অবিকল সেই রকম মনে হয় এটা এখনও খেয়াল হয়নি রাখালের।

দিনরাত অত কী ভাব ?

দিনরাত ভাবি ? দিন তো কাটে বাইরে, রাত নটা পর্যন্ত।

তুমি দিনরাত ভাব। ঘরেও ভাব, বাইরেও ভাব।

দিনরাত ভাবি জানলে কী করে ?

ও বোঝা যায়।

কী করে ?

এ সব তার আসল প্রশ্নটা চাপা দেবার কৌশল। সাধনা কিন্তু রাগ করে না।

বলে, বাড়িতে যতক্ষণ থাকো, আগেও থাকতে, এখনও থাকো। আগে এ রকম ভাবতে না। একদিন দুদিন নয়, রোজ ভাবতে দেখছি। শুধু বাড়িতে একটু ভেবে এ রকম চিন্তা কেউ তাকে তুলে রাখতে পারে ? আমার কাছে লুকিয়ো না। কিছু হয়ে থাকলে আমায় না বলে লাভ নেই জানো তো ?

বলতে বলতে সাধনা আরও কাছে সরে এসে বসে। গরমে ঘামাচিতে ছেয়ে গেছে রাখালের গা, আদর করে ঘামাচি মেরে দেয়।

কয়েক মুহূর্ত কেমন বিকল হয়ে যায় রাখাল !

বিশেষ কিছু ভাবছি না। কী করব না করব এই নানাচিন্তা।

বলে রাখাল তাকে বুকে টেনে নেয়।

দোকান ভালো চলছে না ?

দোকান ঠিক চলছে। রাজীব পাকা লোক।

তবে ? ধারের টাকার কথা ভাবছ ? কত বলছি খরচ বাড়িয়ো না—

রাখাল শুনতে পায় না তার কথা !

সে তখন ভাবছে, সব কথা খুলে বলবে কি সাধনাকে ? খোলাখুলিভাবে বুঝিয়ে বলবে সে কী করেছে এবং কেন সে তা করেছে ?

কিন্তু সাধনা কি বুঝবে তার কথা ? বিশুর মার গয়না লুকিয়ে নিয়েও কেন সে চোব হয়ে যায়নি, তার মানেও বুঝবে ? রাখাল নিজেই মনে মনে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের জবাব দেয়—না, সাধনা বুঝবে না। তার কাছে এটা আশা করাই অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা !

সাধনাও সেই দশজনের একজন তার কাজকে যারা চুরিই বলবে এবং তাকে ভাববে চোর।

চুরি সে করেছে একা। তাই নিজের বউয়ের কাছেও চোর হয়ে গেছে। চোরেরও বউ থাকে, স্বামীকে চোর হিসাবেই সে নেয়। সাধনা চোরের বউ হিসাবে তাকে চোর বলে নেবে না, দশজনের একজন হয়ে তাকে চোর ভাববে।

শিথিল হয়ে ঝিমিয়ে আসে রাখালের অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ। সেটা টের পেয়েই মুখ ম্লান হয়ে যায় সাধনার, তার বুক থেকে মুক্তি নিয়ে তফাতে সরে বসে হাই তুলে সে একটা নিশ্বাস ফেলে।

এই ভাবনার মানেই সে জানতে চেয়েছিল রাখালের কাছে, সে ভাবনা আদরের আলিঙ্গনকেও এভাবে শিথিল করে দিতে পারে, আজ পর্যন্ত কখনও যা ঘটেনি !

দুশ্চিন্তায় ডুবে থেকে রাখাল তাকে আদর করেনি, তার দিকে ফিরে তাকায়নি —সে ছিল ভিন্ন কথা। তাকে বুকে নিয়ে আদর করতে করতে রাখাল অন্যমনস্ক হয়ে ঝিমিয়ে যায়, এ অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন, একেবারেই দুর্বোধ্য।

২

রাজীবের সঙ্গে বিড়ির পাতা শুখার তামাক আর সিগারেটের কারবারে নেমে রাখাল দুটো পয়সার মুখ দেখতে শুরু করছে।

পাতা শুখা আর সিগারেটের নতুন ছোটোখাটো দোকান, পাইকারি মাল কিনে খুচরো বেচার লাভ, তাও আবার রাজীবের সঙ্গে বখরায়। তবু, সেই আগেকার কেরানিগিরির চেয়ে ভালো

রোজগার হচ্ছে বইকী তার। বেকার হয়ে তিনটে টিউশনি করেও যে শোচনীয় অচল অবস্থায় পড়েছিল, সেটার অবসান হয়েছে।

টিউশনির টাকা পেলে তবে রেশন আসবে, বাজার আসবে এবং উনানে হাঁড়ি চড়বে, এই অসহ্য দুর্দশা আর নেই। এখন সে চোরাবাজার থেকে দু-পাঁচসের চাল যখন খুশি কিনতে পারে, দুবেলা মাছ খাওয়াতে পারে সাধনাকে, ছেলের জন্য রোজের দুধ দরকার হলে আরও আধসের বাড়িয়ে দিতে পারে।

এই সেদিনও আধপোয়া দুধ বাড়াতে পারেনি বলে ছেলেকে মাই ছাড়াতে পারেনি সাধনা। ছেলে দস্যুর মতো শুষেছে আর ব্যথায় টনটন করেছে তার আধশুকনো মাইগুলি।

ব্যাংকে কয়েক শো টাকাও জমেছে রাখালের।

কিন্তু টিউশনি একেবারে ছাড়েনি রাখাল, সকালে বিশুকে আর সন্ধ্যায় প্রভাকে নিয়মিত পড়ায়। দুনম্বর ছেলেটিকে পড়াবার সময় পায় না। আগে ভোরে উঠে বিশুকে পড়িয়ে সটান চলে যেত এই ছাত্রটির বাড়ি, এখন যায় দোকানে। রাজীব অবশ্য তার আগেই দোকান খুলে বসে।

লাভে তো ভাগ বসাবেই, ব্যাবসাটাকে কোন দিকে কোন পথে টেনে নিয়ে যাবার ঝোঁক চাপবে তাও ঠিক নেই, তবু নগদ দুটি হাজার টাকা দিয়ে রাখাল যে ব্যাবসাটা তার শুরু করতে সাহায্য করেছে তাতেই রাজীব কৃতজ্ঞতায় গলে গেছে।

রাজীব বলে, আপনি ভাই যখন খুশি আসবেন, যতক্ষণ খুশি থাকবেন, কোনো হাঙ্গামা করতে হবে না আপনার। আপনি টাকা দিয়েছেন তাই ঢের।

রাখাল কিন্তু আপিসের ডিউটি করার মতো ঘড়ি ধরে নিয়মমতো দোকানে যায়, রাজীবের সঙ্গে খাটে। রাজীবের সসংকোচ প্রতিবাদ কানে তোলে না।

বলে, না ভাই, হাত-পা গুটিয়ে বাবু সেজে বসে থাকতে পারব না। টাকা আপনিও দিয়েছেন আমিও দিয়েছি, আপনি সব ঝঞ্ঝাট পোয়াবেন আর আমি লাভের ভাগটুকু নেব, তা হয় না।

ঝঞ্ঝাট কী ? এই কাজ করে এসেছি চিরকাল, আমাদের কি গায়ে লাগে ? আপনি শিক্ষিত মানুষ, বিদ্যাচর্চা হল আপনার কাজ। এ সব নোংরামি কি আপনাদের সয় ? আপনার টাকাটা না পেলে দোকান স্টার্ট হত না আমার। আপনার কাছে কেনা হয়ে আছি দাদা।

ও কথা বলবেন না। আমার টাকা না পেলেও আপনি ঠিক দোকান দিতেন, অন্য একজন ঠিক ভিড়ে যেত আপনার সঙ্গে। আমার মতো আনাড়িকে পার্টনার করেছেন, আমারই সে জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আপনার কাছে।

রাজীব সবিনয়ে বাতিল করে দেয় তার কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন, কিন্তু খুশি আর তৃপ্তি যেন চোখে মুখে তার ধরে না। সেই যে যেচে একদিন সে রাখালের চাকরি করে দিতে চেয়েছিল তার আগেকার কারবারের বজ্জাত পাষণ্ড পার্টনারটির মারফতে, চাকরির নামে মারাত্মক এক চোরামির ফন্দি[illegible] পড়ার উপক্রম ঘটেছিল রাখালের, সে জন্য লজ্জার সীমা ছিল না রাজীবের। বেকার রাখাল সোজাসুজি পাঁচশো টাকা বেতনের চাকরি প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে বাঁচিয়েছিল বলে রাজীবও যেন বেঁচে গিয়েছিল। শ্রদ্ধার যেমন তার সীমা থাকেনি মানুষটার উপর, না জেনে না বুঝে ভালো করার নামে তাকে বিপদে ফেলতে গিয়েছিল বলে মরমে মরে থাকাও সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি বহুদিন।

চাকরি করে না দিতে পেরে থাক সাথে নিয়ে ব্যাবসায়ে নামিয়ে দুপয়সা আয়ের ব্যবস্থা সে যে তার করে দিতে পেরেছে, এ জন্য তাই আনন্দের সীমা নেই রাজীবের। রাখাল কৃতজ্ঞভাবে কথা বললে তার খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা গোলগাল মুখে দাঁতন-ঘষা ঝকঝকে দাঁতের হাসি ফোটে, ছোটো ছোটো ধীর শান্ত চোখে ঘনঘন খুশির পলক ফেলা চাঞ্চল্য আসে।

খাঁটি শহর এলাকায় ট্রাম-চলা বাস-চলা রাস্তার ধারে ছিল রাজীবের আগের দোকান—আগের সেই বজ্জাত পার্টনার দীননাথের সঙ্গে। সে দোকান গেছে যাক, রাজীবের এখন আর আপশোশ নেই। কী বোকাই তাকে বানিয়েছিল হারামজাদা ! সাধারণ দোকানদার সে, পাইকারি কিনে খুচরো বেচার সাধারণ ব্যাবসায়ী, তাকে উঁচুদরের ব্যাবসায়ী করার লোভ দেখিয়ে, বড়োবাজার থেকে মাল কেনার বদলে বড়োবাজার যেখান থেকে যেভাবে মাল কিনে আনে সেখান থেকে সেইভাবে মাল আনিয়ে ব্যাবসা ফাঁপানোর ভাঁওতা দিয়ে, ঘুষ দিয়ে জোগাড় করা কয়েকটা ওয়াগনের সরকারি পারমিট দেখিয়ে, একজন মন্ত্রীমশায়ের একজন ভাগনেকে দোকানে মহাসমাদরে চা বিস্কুট খাইয়ে, কীভাবেই না মাথাটা গুলিয়ে দিয়েছিল তার।

তারপরেই সর্বনাশ হয়ে যেত, একেবারে শ্রীঘরে গিয়ে বাস করতে হত, যদি না বাসন্তী গায়ের সব গয়না খুলে দিত, ট্রাংকে তার বিয়ের বেনারসির নীচে লুকানো নোট কাঁচা টাকা আর ভাঙা গয়নার সোনায় হাজার পাঁচেক টাকা বার করে দিত !

কত জন্ম তপস্যা করে না জানি সে এমন বউ পেয়েছে, এমনি চরম বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য যে পাঁচ-ছবছর ধরে কেঁদেকেটে ঝগড়া করে নতুন গয়না আদায় করেছে, খুঁটে খুঁটে নোট আর কাঁচা টাকা জমিয়েছে, অচল গয়নার সোনা কিনে রেখেছে !

লোকে তাকে স্ত্রৈণ বলে। ভাগ্যে সে স্ত্রৈণ হয়েছিল !

এবার থেকে আরও সে পোষ মানবে বাসন্তীর !

নতুন পার্টনার নিয়ে শুধু বাস-চলা রাস্তায় তিন হাত চওড়া দশ হাত গভীর একটা খোপরে সে নতুন দোকান খুলেছে। মস্ত বড়ো এলাকার বাজারটার কাছাকাছি।

বাড়ি কাছে হয়েছে দুজনের।

চার পয়সা বাস-ভাড়া লাগে।

রাখাল মাঝে মাঝে ব্যাবসায় বুদ্ধির পরিচয়ও দেয়। সেটা আসলে অবশ্য তার বাস্তববুদ্ধি।

পাঁচশো সিগারেটের মোড়ক কিনতে আসে একজন খদ্দের। দেখেই বোঝা যায় সে পানবিড়ির দোকানি নয়, খুচরো বেচার জন্য পাইকিরি সিগারেট কিনছে না। তার বেশভূষা আর চেহারাটাই সাংস্কৃতিক। বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে, দাঁতে ভাঙন ধরেছে, মুখের চামড়ায় ছাইবর্ণ নেমে এসেছে—কালো মেয়ের মুখে একগাদা সস্তা পাউডার মেখে তেলচিটে গামছা দিয়ে ঘষে তুলে দেবার মতো, তবু চোখে যেন জ্বলছে অতৃপ্ত যৌবনের অগ্নিশিখা, যে ভুখা কোনোদিন মেটে না তাকেই বাড়িয়ে যাওয়ার তপস্যার জ্বালা।

আসুন বামাচরণবাবু, আসুন। ভালো আছেন তো ? অনেকদিন বাদে এলেন। এ নতুন দোকানেও আপনি আসবেন—

রাজীব যেন ভাষা খুঁজে পায় না বিনয় জানাবার, নিজে উঠে দাঁড়িয়ে তার আসনে বসায় বামাচরণকে, দোকানের খেরো বাঁধানো হিসাবের খাতাপত্রের তলায় আড়াল করা বহু ব্যবহারে জীর্ণ পুরাতন একটি ছাপা বই টেনে বার করে সামনে ধরে বলে, আজও মাঝে মাঝে আপনার কবিতার বইটা পড়ি আজ্ঞে ! কবিতা লিখেছেন বটে সত্যি ! রামায়ণ পড়ি মহাভারত পড়ি, প্রাণটা যেন ঠান্ডা হয়ে না পড়ে। তখন আপনার বইটা পড়ি।

বামাচরণ মৃদু মৃদু হাসে। রাজীবের দেওয়া সিগারেটটা ধরায়।

রাজীব বলে, আর লিখলেন না ? বারো-চোদ্দোবছর আগে লিখেছিলেন এ বইটা, আর লিখলেন না ?

লিখেছি। এবার ছাপাব ভাবছি।

নিজে ছাপবেন ?

নিজে ছাপাব কী মশায় ? আমার গরজ পড়েছে। সবাই ছাপাতে চায় আমার নতুন বইটা। সবাই বলে আপনি অনেকদিন কবিতার বই ছাপাননি, আমায় ছাপাতে দিন আপনার নতুন বইটা। কাকে দেব তাই ভাবছি।

ছাপানো হলে একটা বই দেবেন কিন্তু আমায়।

বলে দামি সিগারেট প্যাকেটের পাঁচশো সিগারেটের একটা মোড়ক তার সামনে ধরে দিয়ে রাজীব ক্যাশমেমো কাটতে যায়।

বামাচরণ বলে, ইস্, আমি টাকা আনতে ভুলে গিয়েছি একদম !

দিয়ে যাবেন একসময়।

রাখাল এতক্ষণ নীরবে গুরু-কবি এবং তার ভক্ত-শিষ্যদের আলাপ শুনছিল। এবার সে জোর দিয়ে বলে, ধারে তো দেওয়া যাবে না মাল !

রাজীব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা বিড়ি ধরায়। বামাচরণকে বলে, ইনি আমার নতুন পার্টনার।

বামাচরণ বলে, ও বেলাই টাকা দিয়ে মালটা নিয়ে যাব।

রাখাল হাতজোড় করে, মাপ করবেন, নতুন দোকান, শ্রীজহরলাল স্বয়ং এক পয়সা ধার চাইলে দেবার সাধ্য নেই !

বামাচরণ রাজীবের দিকে তাকায়। রাজীবও একবার তার দিকে তাকিয়ে তার পুরানো ছেঁড়া কবিতার বইটার পাতা উলটে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে থাকে।

বামাচরণ বলে, আচ্ছা ও বেলায় আসব। এক প্যাকেট সিগারেট দাও আমাকে।

রাখাল বলে, কী সিগারেট চান ?

নাম শুনে বলে, এক প্যাকেট সাড়ে আট আনা।

সাড়ে আট আনা দামের একটা সিগারেট প্যাকেট সে মোড়ক খুলে বার করে সামনে ধরে দেয়। আরেকবার বলে, সাড়ে আট আনা।

বামাচরণ বেরিয়ে যায়।

রাজীব হাসিমুখে তাকায়। তারিফ করে বলে, আপনি সত্যি অলরাউন্ড মানুষ দাদা ! এককথা এককাজ, ইদিক উদিক নেই। তা শক্ত মানুষ না হলে কি পারতেন ? অমন অবস্থা গেল, জমানো টাকাটি ঠিক রেখে দিয়েছেন। কী করে যে পারলেন ভাই, ভেবে পাইনে। দুহাজার টাকা জমা রয়েছে, ইদিকে দিন চলে না—আমি হলে কবে উড়িয়ে দিতাম।

প্রশংসা শুনে একটু যেন ম্লান গম্ভীর হয়ে আসে রাখালের মুখ। রাজীব ভাবে—না জেনে কিছু অন্যায় ক'রে বলে ফেললাম না কী রে বাবা ! তারপর ভাবে—দুঃখদুর্দশার দিনগুলির কথা ভেবে হয়তো এই ভাবান্তর ঘটেছে রাখালের।

রাজীবের এখন চলছে নিজের দুর্দিন।

ছোটোখাটো এই দোকানটি আবার দিয়েছে বটে রাখালের সঙ্গে, কিন্তু আগের ব্যাবসায়ের তুলনায় এ কিছুই নয়।

শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা।

নিজের সমস্ত শখ, বাসন্তীর সমস্ত আবদার, জীবনকে সরস করার নানা উপায় আর উপকরণ, হঠাৎ সব বাতিল করে ছেঁটে ফেলে দিতে হয়েছে। অভ্যস্ত পরিপূর্ণ জীবনটা যেন পরিণত হয়ে গেছে অনভ্যস্ত শূন্য জীবনে।

সর্বাঙ্গে গয়না আঁটা থাকত বাসন্তীর, দামি দামি রঙিন শাড়িই শুধু সে পরত। চেয়ে দেখেই সুখে আনন্দে থইথই করত রাজীবের মন। উঠতে বসতে বাসন্তীর ছিল ঝগড়া আর নালিশ, কথা যেন বলত শুধুই মুখ ঝামটা দিয়ে। কিন্তু ওটাই ছিল বাসন্তীর আদর সোহাগ আহ্লাদ আবদারেব বিশেষ ধরন, ঝগড়াটে হয়ে থেকেই সে একেবারে জমিয়ে দিত রসিয়ে দিত জীবনটাকে।

পাড়ার মানুষ বলে কুঁদুলে বউ—তারা কী জানবে সে কেমন কোঁদল, তারা কী বুঝবে রাজীব কেন নিরীহ গোবেচারি সেজে থাকত !

তারা তো হিসাব রাখত না বাসন্তী কখন ঝগড়া করে, কখন করে না। দরকারি কথা বলার সময়, রাজীবের শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে থাকার সময়, নিরালায় আদর সোহাগের সময় ওই ঝগড়াটে মানুষটাই আবার কেমন অন্যরকম মানুষ হয়ে যেত, রাজীব ছাড়া কে তা জানবে !

সেই বাসন্তীর গায়ে আজ গয়না নেই—গলায় একটি হার আর হাতে তিনগাছা করে চুড়ি। সেই বাসন্তী আজ ঝগড়া করতে ভুলে গেছে।

জীবন-যাত্রার আকস্মিক বিপর্যয়ে কেমন থতোমতো খেয়ে গেছে, শান্ত নির্জীব হয়ে গেছে। রাজীবের জন্য গভীর সহানুভূতিতে যন চব্বিশ ঘণ্টা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কলহ করা নেই, মান অভিমান নেই, লীলা-চাপল্য নেই।

দামি শাড়িগুলি আজও পরে। অনেক শাড়ি ব্লাউজ জমানো আছে, বহুদিন চলবে। একই জামাকাপড়ে জড়ানো সেই একই মানুষ, তার সেই একই রূপ-যৌবন, তবু রাজীব তার দিকে তাকিয়ে আগেকার পুলক অনুভব করতে পারে না। মনে হয়, তার বাসন্তী আর নেই।

বাসন্তী বদলে গেছে।

বদলে গেছে, কিন্তু তিতোও হয়নি, টকেও যায়নি। মুখ গোমড়া করে থাকে না বাসন্তী, হাহুতাশ করে না, কখনও তাকে বিরূপ দেখা যায় না রাজীবের উপর। কোঁদল করা লীলাখেলার উদ্দামতাটুকু বাদ দিলে সে ধীর শান্ত হয়েছে। সত্য কথা বলতে কী, সে জন্য আকর্ষণ যে তার কমেছে রাজীবের কাছে মোটেই না নয়। আজকাল বরং নতুন ভাবে বেশি করে টানছে বাসন্তী—দাসী রাঁধুনির মতো তাকে খাটতে দেখে দিনরাত তাকে সোহাগে আদরে ডুবিয়ে রাখবার সাধটা অদম্য হয়ে উঠেছে !

এত ভালো লাগছে, নতুন রকম ভালো লাগছে, তাকে আদর করতে !

কিন্তু তবু রাজীব আগের বাসন্তীকেই ফিরে চায়।

নাঃ, উঠে পড়ে লাগতে হবে আবার, ব্যাবসাটা গড়ে তুলতে হবে। লাখপতি হতে চায় না রাজীব, প্রাসাদ চায় না মোটর গাড়ি চায় না—শুধু আগের দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে চায়। বাসন্তীর গায়ে গয়না উঠবে, সতেজ জীবন্ত হয়ে উঠে আবার নানা বায়না ধরবে বাসন্তী, ঝংকার দিয়ে ঝগড়ার ঢংয়ে আবার সে প্রেমালাপ করবে তার সঙ্গে !

রাখাল তার মনের কথা জানলে নিশ্চয় মনে মনে বলত, এই নাকি প্রেম তোমার কাছে ? টাকায় যা খাড়া ছিল, টাকার অভাবে যা ফুরিয়ে গেছে, আবার টাকা হলেই যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ?

রাজীব এ সব বোঝে না। রাখালের কাছে টাকা শুধু টাকাই, রাজীবের কাছে তা নয়। টাকা ছাড়া যদি মানুষ বাঁচে না আর সেটা যদি সস্তা না করে দেয় বাঁচাকে, টাকা ছাড়া ভালোবাসা না জমলে সেটা খাপছাড়া হয় কীসে, প্রেমকে সেটা ছোটো করে দেয় কোন যুক্তিতে ?

সব দিক যার টানাটানি তার জীবনে আনন্দ আসবে কোথা থেকে ? দরকার মতো যার টাকা নেই তার আবার প্রেম-ভালোবাসা, তার আবার বেঁচে থাকার সুখ !

বিড়ির পাতা শুখা তামাকের বস্তায় ভরা ছোটো লম্বাটে ঘরখানায় বসে কেনাবেচার অবসরে দুজনের মধ্যে যে এ রকম দার্শনিক কথা একেবারেই হয় না তা নয়।

সব মানুষেরই দর্শন আছে, দার্শনিক আলোচনা ছাড়া কোনোও মানুষের চলে না। জীবনদর্শন ছাড়া মানুষের জীবন নেই কোনো স্তরের। হয়তো সেটা পণ্ডিতের দর্শন নয়, ছাঁকা তত্ত্বের জটিল দর্শন নয়। নিজেরই জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা শিক্ষাদীক্ষা সংস্কারের দর্শন, নিজের জীবন আর জগৎটার একটা নিজের বোধগম্য মানে খাড়া করার দর্শন।

রাজীব হয়তো ওই কথাই বলে, টাকা ছাড়া সত্যি সুখ নেই দাদা !

রাখাল হেসে বলে, টাকার সুখ কি আসল সুখ ?

সুখের আবার আসল নকল আছে নাকি ? সুখ হল সুখ। অসুখ হল অসুখ !

ও ভাবে ধরলে কথাটা তাই বটে, আমি বলছিলাম মানুষের মনে করার কথা। আসলে যা সুখ নয় সেটাকেও মানুষ সুখ ভেবে নেয়। ওটাকেই বলছিলাম নকল সুখ। আপনি বলছেন টাকার কথা। টাকা থাকলেই কি সুখ হয় ?

তাই কি হয় ? এককাঁড়ি টাকা হলে কি এককাঁড়ি সুখ হয় ? টাকা হলেও সুখ একদম নাও হতে পারে। তবে কিনা টাকা নইলেও আবার সুখ কিছুতে হবার নয়, সুখের জন্যও টাকাটি চাই। টাকা বাদ দিলে উপোস দেযা সুখ, সে হল মশাই সাধুসন্নেসীর সুখ।

আর আপনার আমার সুখ ?

এই ভাতকাপড় আরাম-বিরাম শান্তি—

তবেই দেখুন, আপনি সব জড়িয়ে দিচ্ছেন। বাঁচাব জন্য ভাত কাপড় চাই, আরও কতগুলি ব্যবস্থা চাই। তার মানেই টাকা চাই, টাকা দিয়ে এ সব ব্যবস্থা হয়। সুখ-শান্তি এ সব তার পরের কথা। আগে বাঁচা চাই ঠিক, নইলে সুখ-শান্তি কীসের ? কিন্তু বাঁচবার ব্যবস্থা হলেই কি সুখ-শান্তি ব্যবস্থা হয় ? সে হল আলাদা ব্যবস্থা। টাকা চাই স্রেফ বাঁচার জন্য, টাকায় সুখ হয় না।

রাজীব দমে গিয়ে দাড়িতে হাত বুলায়, তার চোখ মিটিমিট করে। এবার সে ধাঁধায় পড়ে গেছে !

রাখাল আবার বলে, সুখ মানেই হল আনন্দ। আনন্দ মানুষকে সৃষ্টি করতে হয়। টাকা দিয়ে কেনার জিনিস নয় ওটা। টাকার অভাবে কী হয় ? বাঁচার কষ্ট—জীবনে ওই আনন্দ সৃষ্টির ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় মানুষের। এই হিসেবে যদি বলেন টাকা ছাড়া সুখ হয না, তাহলে অবশ্য কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই হিসেবটুকু ভুললে চলবে না, সুখ আপনাকে সৃষ্টি করতে হবে।

রাজীব বলে, কিন্তু রাখালবাবু, আসলেই যে খটকা বাধছে। কোনো অভাব নেই, অশান্তি নেই, রোগ-বালাই নেই—পাঁচজনকে নিয়ে এ রকম বাঁচাটাই তো সুখের, তাতেই তো আনন্দ মানুষের। আনন্দ আবার ভিন্ন করে সৃষ্টি করতে হয়, তার মানে তো বুঝলাম না মশাই ! বিশেষ আনন্দ হয়, বড়োদরের আনন্দ হয়, সে আলাদা কথা। তার জন্য সাধন-ভজন যোগ-টোগ দরকার হয়। কিন্তু সাধারণ সংসারী মানুষের সাধারণ আনন্দ, দুঃখ কষ্ট রোগ ব্যারাম তা থাকলে সে তো আপনা থেকেই জুটবে।

জুটবে ? হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবেন তবু সুখশান্তি আনন্দ জুটবে ? অভাব নেই আপনার একার, যে পাঁচজনকে নিয়ে সংসার, বাইরে যে দশজনের সঙ্গে কারবার, তাদের তো আছে। বাইরের মানুষ কেন, ঘরের মানুষের সঙ্গে কত বিষয়ে আপনার স্বার্থের মিল নেই। স্বামী-স্ত্রীর পর্যন্ত সব স্বার্থ এক নয়। পাঁচজনের সঙ্গে সামলে-সুমলে সামঞ্জস্য করে আপনাকে চলতে হবে, পাঁচজনকে সুখী করতে হবে, হাসি খেলার আয়োজন করতে হবে, স্নেহ করতে ভালোবাসতে হবে, শত্রুর সাথে লড়তে হবে—আরও কত কী করে তবে না খানিকটা আনন্দ জুটবে আপনার।

এবার রাজীব খুশি হয়ে ওঠে।

হাঁ হাঁ, এটা ঠিক বলেছেন ভাই। একেই বলছেন সৃষ্টি করা ? তা হলে তো ঠিক আছে কথাটা ! এটাকেই তো আমি বাঁচা বলছিলাম ! নইলে কলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁচাটা কী আর বাঁচা !

রাখাল অস্বস্তি বোধ করে !

এত সহজে আগাগোড়া বুঝে ফেলার মতো সোজা কথা সে বলেনি। তার নিজের কাছেই সবটা স্পষ্ট নয় বলে অস্বস্তি আরও বেশি হয়। এত সহজে স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে গেল রাজীবের কাছে কথাটা ? তার মনে কত সংশয় কত অস্পষ্টতা--রাজীব আঁচ কবে ফেলল আসল কথাটা ?

রাখাল ধরতে পারে না যে তার সঙ্গে রাজীবের এটাই তফাত—সে সংশয়ী আর রাজীব বিশ্বাসী। সংসারে ধনীত্ব আর দারিদ্র্য—এটাই তো আসলে তাদের এত কথা বলার মূল কথা। জীবনই তাদের আনন্দ, তার বাড়া আনন্দ আর নেই। বহু জীবনকে দীন করে পঙ্গু করে কিছু জীবন এই পূর্ণতা এই সার্থকতা আত্মসাৎ করতে চায়,—মানুষের সুখ বলো আনন্দ বলো তার মূল সমস্যা ওইখানেই। নইলে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে মানুষ, আজও এগিয়ে নিয়ে চলেছে—একে বলা যায় জীবনে আনন্দসৃষ্টির প্রক্রিয়া। এই সত্যের ঝাপ্‌টা লেগেছে রাখালের বিশ্লেষণী মনে—সেই ঝলকমারা আলোয় সে মানে খুঁজছে একটি নীড়াশ্রয়ী মানুষের জীবনে আনন্দ আসে কীসে আর কেন।

সংশয়ের জের তাই তার মিটছে না। রাজীবের এ সব বালাই নেই। সংঘাত সংকীর্ণতা অসম্পূর্ণতা নিয়ে নীড় বেঁধে ঘর করার যেটুকু আনন্দ তাতেই সে বিশ্বাসী—টাকার অভাবটা না থাকলেই হল !

রাখাল নিজেও ওইটুকুই চায়—যথাসম্ভব গা বাঁচিয়ে সাধনাকে নিয়ে সংসার করাব—আনন্দটুকু। কিন্তু সে ভাবে অনেক বড়ো বড়ো কথা।

তার চিন্তা আর কাজে, আদর্শ আর জীবনে, সামঞ্জস্য নেই।

তাই তার সংশয়ও ঘোচে না।

৩

এখনও ভোরেই বিশুকে পড়াতে যায়।

আগে মাঝে মাঝে খালি দেবতার প্রসাদের ভাগ পেত এ বাড়িতে, আজকাল নিয়মিত চা-জলখাবার জোটে।

আগে চা জলখাবার দেওয়া হত না তাকে সম্মান করেই ! জমিদার-গিন্নি হলেও বিশুর মা হঠাৎ পূর্ববঙ্গের গাঁ থেকে উৎখাত হয়ে শহরে এসেছে, শতাধিক বছরের পুরানো। ধারার জের টেনে টেনে সেখানে চলছিল জীবনযাপন,—ক্রিয়াকর্ম ব্রতপূজা গুরুসেবা ইত্যাদি সমেত।

রাখাল উঁচুজাত, ছেলের বিদ্যাদাতা গুরু। ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া তাকে কি আর কিছু খেতে দেওয়া চলে ?

গুরুদেব সম্পর্কে বিশুর মার সংস্কার ভাঙেনি। তবে সংস্কারটার ডালপালা নতুন জীবনের বাস্তবতা কিছু ছেঁটে ফেলায় ছেলের প্রাইভেট টিচারকে গুরুস্থানীয় করে রাখাব বদলে স্নেহ দিয়ে একটু কাছের মানুষ করে ফেলেছে।

ঘরের লোকের চা-জলখাবারের ভাগ তাকে দিতে এখন আর বাধে না বিশুর মার।

স্নেহ আর চা-জলখাবার জুটছে রাখালের, আগে যে অসাধারণ শ্রদ্ধা আর সম্মান পেত সেটা ঘুচে গেছে। শুধু বিশুর মা নয়, এ বাড়ির প্রায় সকলের কাছেই।

নির্মলা পর্যন্ত তাকে যেন আর সমীহ করে না।

এই সরলা ও মুখরা ক্ষীণাঙ্গী বিধবা তরুণীটিকে সেদিন পর্যন্ত রাখাল বিশুর মার নিজের বোন বলেই জানত। সম্প্রতি জেনেছে যে সে তার জ্যাঠতুতো বোন।

নির্মলা নিজেই তাকে জানিয়েছে। নির্মলাই প্রতিদিন তাকে চা-জলখাবার এনে দেয়। একটা মানুষকে জলটুকু খেতে দেওয়াও কি ঝি চাকরের মতো বাজে মানুষের কাজ ?

বিশু সেদিন সেই সময়টাতেই নীচে গিয়েছিল। বিশুকে নীচে দেখেই নির্মলা তাড়াতাড়ি শুধু খাবারটা নিয়ে এসেছিল, নইলে সাধারণত চা আর খাবার সে একসাথেই আনে।

রাখালের সঙ্গে একা কথা বলার জোরালো ঝোঁক আছে নির্মলার।

সরলভাবে সে নিজেই জানিয়েছে রাখালকে যে নিশ্চিন্ত মনে প্রাণে খুলে কথা কইতে না পেলে কি আলাপ করে সুখ হয় ?

নির্মলা বলেছিল, জানেন, এই ঘরবাড়ি জমিদারি সব আমার পাওনের কথা। বিষয় ছিল আমার বাপের, বিশুর বাপের না। কেমন ছিল কইরা উইড়া আইয়া জুইড়া বইল অবাক হইয়া ভাবি।

সতীশবাবুর জমিদারি নয়?

নির্মলা হেসেই আকুল।

জামাইবাবুর জমিদারি ? কী কথা যে কন ! জমিদারি ছিল ঠাকুরদাদার। আমাব বাপেরে দিয়া গেছিল, ত্যাজ্যপুত্র করছিল দিদির বাপেবে। বুঝলেন না ?

হঠাৎ শুনে জটিল ব্যাপারটা সত্যি বোঝেনি রাখাল।

আপনার বাবা—দিদিব বাবা— ?

দুই ভাই ছিল। ঠাকুরদাদার দুই পোলা।

রাখাল তবু তাকিয়েছিল জিজ্ঞাসুভাবে।

নির্মলা হেসে বলেছিল, আঃ, আপনে তো জানেন না কিছুই। কথাডা কী, আমাব বাপ ছিল ঠাকুরদাদার বড়ো পোলা, দিদির বাপ ছিল ঠাকুরদাদার ছোটো পোলা। বুঝলেন না ?

হ্যাঁ, এবার বুঝলাম।

দিদির বাপ, মানে আমার খুড়া, জোর কইরা কইলকাতা আইছিল। কলেজে পড়বো বিলাত যাইবো খিস্টান হইবো, এইসব মতিগতি ছিল দিদির বাপের। লেখাপড়া শিখবা বিদ্বান হইবা, ঢাকা কলেজে পড়ো না গিয়া তুমি ? তা না, কইলকাতা আইসা পড়নের ঝোঁক চাপল দিদির বাপের। আমার বাপ ঢাকা কলেজে পড়ছিল। দুই-তিনবার ফেল কইবা আর পড়ে নাই, বাড়িতে আইসা বইয়া ছিল। কাণ্ডটা দ্যাখেন ভাইবা, আমার বাপে বিয়া করছিল আমার মায়ের সতিনরে, পোলাপান হয় নাই কয়েক বছর। ঠাকুবদা খুড়ারে হুকুম দিছিল, তুমি বাড়ি আইসা বিয়া কর। দিদির বাপের কী তেজ ! কইয়া পাঠাইল যে বাড়িও ফিরুম না বিয়াও করুম না।

নির্মলার কথা বলার ভঙ্গিটি অতি মনোরম। যাকে বলে চোখে মুখে কথা কওযা, কথার সঙ্গে চোখে মুখে ভাবের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে চলা। হাতও কাজে লাগে কিন্তু সেটা হাতে নাড়া হয় না, কথার টানের ওঠা নামার সঙ্গে সহজ ভঙ্গির মুদ্রা রচনা করে।

কথা বলার চেষ্টা যেন তার ক্ষীণ দেহের একটা আবেগ ব্যাকুলতারও রূপায়ণ।

শুধু কথা বলার ভঙ্গি নয়, কথার সুরটিও তার মিষ্টি।

তার কথা শুনতে বড়ো ভালো লাগে রাখালের।

বিশু ফিরে আসার পরেও নির্মলা তার কাহিনি বলে যায়। বিশু গোড়ায় উপস্থিত থাকলে এ সব কথা হয়তো সে তুলতই না। কিন্তু এতটা এগিয়ে বিশুর খাতিরে এখন আর মাঝখানে থামতে সে রাজি নয়। বিশু শুনুক যা খুশি ভাবুক। যদি বলে দেয়, দিক !

নির্মলা গ্রাহ্য করে না !

নির্মলার কাকাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয়। বিয়ে করা নিয়ে বাপের সঙ্গে বিবাদ করে ছমাসের মধ্যে সেই বিয়েই সে করল, ঢাকার এক সাধারণ উকিলের মেয়েকে। কে জানে এর মধ্যে আরও কী

রহস্য ছিল ? যাই হোক, বিয়ের এক বছরের মধ্যে জন্মে গেল বিশুর মা। নির্মলার বাবা পরপর তিনবার বিয়ে করেছিল—ছেলেপিলে আর হয় না। শেষে চারবারের বার নির্মলার মাকে বিয়ে করার পর জন্মাল নির্মলা।

বাপের জমিদারি পাওয়া উচিত ছিল নির্মলার। কিন্তু ঠাকুরদাদা আর তার বাপ মারা যাবার পর ত্যাজ্যপুত্র খুড়াটি এসে জমিদারি দখল করে বসল। তাকে নাকি ত্যাজ্যপুত্র করা হয়নি, কোনো দলিল নেই।

মুখের কথার মূল্য নাই, নাই ? বাপে কইল তুমি আমার পোলা না, তোমারে এক পয়সা দিয়া যামু না। খুড়া কইল, তোমার সম্পত্তি আমার কাছে গোরক্ত, মাতৃরক্ত। সেই মানুষটা দিব্যি উইড়া আইসা জুইড়া বইল জমিদারি, তারে যে বাপে ত্যাগ করছিল তার দলিল নাই !

সাদাসিদে বাস্তব কাহিনির মধ্যে যেন পুরাণের আমেজ মেলে। মধ্যযুগের জীবনধারার জের টেনে চলেছে মানুষ আজকের দিনেও। এত ওলট-পালট হয়ে গেল জগতে, এক রাষ্ট্রে জমিদারি ফেলে আরেক রাষ্ট্রে পালিয়ে এল সতীশ, তবু সে রয়ে গেল জমিদার ! সেই যে কবে চাষির মাটিতে কামড় দিয়েছিল জমিদার, প্রলয় ঘটে গেলেও সে কামড় যেন আলগা হবার নয় !

বাড়িতে ঢুকবার সময় বাইরের রোয়াকে দুজন প্রৌঢ়বয়সি মুসলমানকে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখছিল রাখাল,—একজন থেলো হুঁকোয় টানছিল তামাক। দেখলেই বোঝা যায় সতীশের চাষি প্রজা, কাল পাকিস্তান থেকে এসেছে, রাত্রে এ বাড়িতেই ছিল। মাঝে মাঝে এ রকম দু-একজন চাষিকে এসে দু-একদিন থাকতে দেখা যায়। বাইরের ঘরে ওদের শোয়ার জন্য পৃথক তক্তাপোশের ব্যবস্থা আছে।

খাওয়ার জন্য পৃথক থালা বাসনের বাবস্থা আছে, খাওয়ার পর নিজেরাই ধুয়ে মেজে সাফ করে রাখে।

কোথায় সেই জমিদারি—জমিদার এসে আস্তানা গেড়েছে কোথায়। কে জানে এখানে বসে সে কী করে চালাবে জমিদারি, কী করে ভোগ করবে অন্যে যে জমি চাষ করে তার পুরুষানুক্রমে পাওয়া স্বত্ব !

দোতলার ঠাকুর ঘরেই আজও সে বিশুকে পড়ায়। প্রতি পূর্ণিমার বিশেষ পূজাব দিন বিশুর মার শোবার ঘরে পড়াবার ব্যবস্থা হত, যে সুযোগে রাখাল বিশুর মার গয়না কখানা সরাতে পেরেছিল। সে ব্যবস্থা রহিত হয়ে গেছে।

পূর্ণিমা তিথিতে ছাত্রকে আর তার পড়াতেই হয় না। রাখালকে বলে দেওয়া হয়েছে, ওই দিন তার ছুটি।

বিশুর মার শোবার ঘরের বন্ধ দরজায় আজকাল তালা ঝুলতে দেখা যায়।

কে জানে কতদিন পরে বিশুর মা টের পেয়েছিল যে তার ক-খানা গয়না কমে গেছে। একদিন হঠাৎ তার শোবার ঘরের দরজায় তালা দেখে বুকটা ছাঁত করে উঠেছিল রাখালের।

প্রতি পূর্ণিমায় তার ছুটি। বিশুর মার ঘরের দরজায় তালা!

বিশুর মা কী জেনেছে যে গুরুর মতো শ্রদ্ধেয় বিদ্যাদাতা রাখাল নিয়েছে গয়না ক-টা।

কিন্তু দিন যায় কিছুই বোঝা যায় না। কারও কাছে আকারে ইঙ্গিতেও শোনা যায় না যে বিশুর মার ঘর থেকে রহস্যজনকভাবে দুহাজারেরও বেশি টাকা দামের সোনার গয়না উধাও হয়ে গেছে।

বিশুর মার কথা আর ব্যবহার থেকেও কিছু টের পাওয়া যায় না।

ব্যবহার খানিকটা বদলে গেছে বিশুর মার ' কিন্তু একজন গয়না চুরি করেছে সন্দেহ জাগলে কথা ব্যবহারের যে রকম পরিবর্তন হওয়া উচিত, মোটেই সে রকম নয়। বরাবরই বিশুর মার কথায়

ব্যবহারে প্রকাশ পেত স্নেহের ভাব, আগে তারই মধ্যে থাকত একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব, ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ না করার সংযম।

এটাই শুধু অন্তর্হিত হয়েছে।

তার মুখ শুকনো দেখলে আগে বিশুর মা বলত, তোমারে য্যান কাহিল দেখায় বাবা ?

আজকাল সে উদ্‌বেগের সঙ্গে বলে, রাখাল ! মুখ শুকনা যে ? অসুখ করছে না কি ?

আগে শুধু উপর উপর জিজ্ঞাসা করত রাখালের ঘর সংসার আপনজনের কথা। আজকাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নেয়।

নিজের হাতে তৈরি করা পিঠা পায়েস খেতে দিয়ে সামনে বসে তার নতুন ব্যাবসা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে খুঁটিনাটি এত কথা জেনে নেয় যে তার শতাংশ জানবার আগ্রহ সাধনার দেখা যায়নি।

ব্যাবসায় কত টাকা লাগিয়েছে এবং টাকা কোথায় পেয়েছে, শুধু এই কথাটা সে ভুলেও জিজ্ঞাসা করে না।

অন্য সব কথা শুনে বলে, বেশ করছ রাখাল। লক্ষ্মী সাইধা ঘরে আসেন না, তেনাবে আনন লাগে।

চিন্তিত ও গম্ভীর দেখায় বিশুর মাকে। খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। আনমনে বলে, লক্ষ্মীর আবার যাওনের মন হইলে ঠেকান দায়। আমাগো দ্যাখো না ? সব ফেইলা থুইয়া চইলা আইলাম। আদায়পত্র নাই, টাকা আননের হাঙ্গামা, প্রজাগো মতিগতি বিগড়াইয়া গেছে—

হঠাৎ নিজের কথা বন্ধ করে বিশুর মা ডাকে, নির্মলা ? রাখালেরে আরেকটু পায়েস দিয়া যা।

পায়েসে থাকে সিদ্ধ করা চাল—জিনিসটা এঁটো। ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া যাকে কিছু দেওয়া যেত না, আজ তাকে বিশুর মা যত্ন করে নিজের হাতে রাঁধা পায়েস খাওয়ায় !

শুধু তাই নয় ! জিজ্ঞাসা করে, আমার রাঁধা পায়েস বউমা খাইবো না ?

কেন খাবে না ! আমি তো খেলাম ?

বিশুর মা হাসে।—তুমি ব্যাটাছেলে, মাইয়ালোকের বাছবিচার বেশি থাকে না ?

বিশুর মা কি জেনেও চুপ করে আছে ? তুচ্ছ করে বাতিল করে দিয়েছে তার গয়না চুরির অপরাধ ? সন্দেহ হলেও জোর করে মন থেকে দূর করে দিয়েছে সন্দেহটা ?

শুধু সন্দেহ করে অবশ্য মুখে কিছু বলা যায় না সোজাসুজি। কিন্তু এ রকম আত্মীয়ের মতো সুমিষ্ট ব্যবহার কি করা যায় আর সেই মানুষটার সঙ্গে ? কথা বলার বদলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকতে সাধ যায় না ?

ছেলের মাইনে করা মাস্টার ! ইচ্ছা হয় না তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দিতে ?

অথবা সত্যই বিশুর মা তাকে মনেপ্রাণে এতখানি স্নেহ করে বসেছে যে প্রাণঘাতী অভাবের তাড়নায় সে যা করে ফেলেছে সেটা তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে ? সামান্য গয়না যা গেছে সে তো আর ফিরবে না, লজ্জা দিয়ে তাকে দমিয়ে দিলে লাভ হবে না, তার চেয়ে সে সামলে-সুমলে উঠুক—একটা অপরাধ করে ফেলেছে বলেই নিজেকে অমানুষ ভেবে সে যেন তলিয়ে না যায় ?

অথবা খটকা যা কিছু সব তার নিজের মনের ? পূর্ণিমার দিন পূজার সমারোহ হয় শুধু এই জন্যই তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়েছে, গয়না হারিয়ে গিয়েছে বলেই শুধু সাবধান হবার জন্য ঘরের দরজায় তালা পড়েছে, গয়না হারানোর ব্যাপারে তার সম্পর্কে কিছুই ভাবেনি বিশুর মা ?

সেটা অসম্ভব নয়। কবে কখন কীভাবে গয়না কটা গেছে বিশুর মা টের পায়নি। একদিন কিছুক্ষণের জন্য সে শোবার ঘরে একলা বসে ছিল শুধু এই জন্য তাকে সন্দেহ করার কথা হয়তো কল্পনাও করতে পারে না বিশুর মা !

রাখাল বাজারে যায়। বাজারটা বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই দোকানে চলে যাবে।

বাড়ি ফিরতে সাধনা বলে, তোমার বিশুর মা একবাটি পায়েস, এই এত পিঠে আর একখানা কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে।

বেশ ভালো একখানা রঙিন শাড়ি। দেখে কিন্তু খুশি হতে পারে না রাখাল।

এই একখানা শাড়ি দিতে মরবে না বিশুর মা। যাকে স্নেহ করে তার বউকে এ রকম দশখানা শাড়িও সে দিতে পারে ! কিন্তু এ তো শুধু একটা দুর্বলতার নমুনা। অনেককে স্নেহ করে অনেককে দরাজ হাতে দান করার যে স্বভাব জমিদার-গিন্নি বিশুর মার ছিল, এ শুধু এখনও সেটা বজায় থাকার নমুনা। জমিদারি ফেলে পালিয়ে এসেও সব দিকে বিরাট চাল বজায় রেখে চলেছে বিশুর মা। বেহিসাবি অর্থহীন চাল—শুধু জের টানা।

সাধনা বলে, ছেলের মাস্টার, তাকে এত খাতির !

রাখাল একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ সে চটে যায়। বলে, যা-তা বোলো না। খাতির আবার কী ? উনি আমায় মায়ের মতো স্নেহ করেন।

সাধনা আশ্চর্য হয়, আহত হয়। তারপর সেও রাগ করে। বলে, বড়োলোকের শখের স্নেহ ! আমি এ কাপড় নেব না। তোমার মনিব গিন্নির কাপড় তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

রাখাল গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি না নাও, আমি নেব। লুঙ্গি করে পরব।

জানিয়ে দিয়ো আমি কাপড় নিইনি।

তোমার দরকার থাকলে তুমিই জানিয়ে দিয়ো।

খুব তাড়াতাড়িই রাগটা পড়ে যায় সাধনার। স্নান করে রাখাল বেরিয়ে যাবার আগেই। গা মুছে ঘরে এসে রাখাল দেখতে পায়, শাড়িখানা পরে সাধনা দেয়ালে টাঙানো আয়নায় দেখবার চেষ্টা করছে তাকে কেমন মানিয়েছে।

সাধনা একটা বড়ো আয়না চেয়েছিল। মানুষ-প্রমাণ আয়না, যার সামনে দাঁড়ালে চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়।

তুমি আমাকে দেখছ—আগাগোড়া দেখছ। তুমি কী দেখছ আমি সবটা দেখতে পাইনে। শুধু মুখটা দেখি, ঘাড়টা দেখি, কোনো রকমে চুলটা বাঁধি।

নিজেকে দেখে করবে কী ?

তুমি কী দ্যাখো সেটা দেখব। দাও না একটা বড়ো আয়না কিনে ?

বেশি দিনের কথা নয়। খোকা যখন জন্ম নেবার প্রথম নোটিশ জানিয়েছে ইঙ্গিতে।

ও রকম আয়না একটা কিনে দিত রাখাল। কী ভাগ্য, ঘটনাচক্রে কেনা হয়নি ! তখনকার সেই সুগঠিতা সুললিতা রূপলাবণ্যময়ী সাধনা এই ক-বছরে রোগা হয়ে কালচে মেরে লাবণ্য হারিয়ে কী দাঁড়িয়েছে সেটা শুধু সেই চোখ দিয়ে দেখছে তাই ভালো। তার সহ্য হয়।

বড়ো আয়নায় আগে নিজেকে নিজের চোখে দেখে রাখলে আজ সেই আয়নায় নিজেকে দেখে সাধনা নিশ্চয় পাগল হয়ে যেত।

তুমি পায়েস খাবে না ?

এক পেট খেয়ে এসেছি।

এত পায়েস কী করব ! নষ্ট করার চেয়ে বিলিয়ে দেওয়াই ভালো ! খোকাকে একটু ধরবে, পাঁচ মিনিট ?

দেরি করো না কিন্তু।

সাধনা হাসিমুখেই বলে, কেন, আপিস আছে নাকি তোমার !

মুখে তার হাসি দেখতে পায় বলেই অগত্যা রাখাল চুপ করে থাকে, নইলে হয়তো রাগের চোটে আবার একটা কড়া কথা বলে বসত।

তার দোকান সম্পর্কে সাধনার অবজ্ঞা আর উদাসীনতা মাঝে মাঝে গায়ে তার জ্বালা ধরিয়ে দেয়। কারবারের জন্য কীভাবে টাকা জোগাড় করেছে সেটা না হয় নাই জানল সাধনা। এই দোকানের কল্যাণে বীভৎস দারিদ্র্যের কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছে, এটা কী খেয়াল থাকে না তার ? এমন অনায়াসে অবজ্ঞাভরে বলতে পারে যে দোকানে যাবে সে জন্য আবার তাড়া কীসের ?

হয়তো দোকানের মূল্য আছে সাধনার কাছে, তার দোকানে যাওয়া না যাওয়ার বিশেষ গুরুত্ব নেই। রাজীব দোকান চালায়, রাজীব সব করে—তার দোকানে যাওয়াটা নিছক শখের ব্যাপার। তার গেলেও চলে না গেলেও চলে।

এটা ভাবলে জ্বালা আরও বেশি হয় রাখালের। সেই সঙ্গে বোধ করে একটা খাপছাড়া ভোঁতা বেদনার পীড়ন। চাকরি আর মাস্টারি করা ছাড়া সাধনা তার আর কোনো যোগ্যতায় বিশ্বাস করে না বলে নয়, সাধনার কাছে শ্রদ্ধা পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নই তার মনে আসে না। এ শুধু মানসিক বেদনা বোধ, শোক দুঃখ আতঙ্কের মতোই বাস্তব কিন্তু চিনে জেনে নেবার মতো স্পষ্ট নয়।

নিজের জন্য খানিকটা পায়েস তুলে রেখে সাধনা পায়েসের বাটিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় তাকিয়ে যায় আশার দিকে।

ভাত চড়িয়ে আশা তরকারি কুটছিল, সঞ্জীবকে তার অপিসের ভাত বেঁধে দিতে হয়। কত সমারোহ ছিল তার রান্নার, সে সব আজ চুলোয় গেছে। ধার করে করে সঞ্জীব তাকে আরামে বিলাসে রেখেছিল, আজ সে নিরাভরণা হয়ে দিন কাটায়, একটার বেশি তরকারি রাঁধে না।

মাছ খায় একবেলা, সপ্তাহে একদিন কী দুদিন।

আশাকে পায়েসের ভাগ দিতে ইচ্ছা হয় সাধনার কিন্তু সাহস পায় না। আশা হয়তো অপমান বোধ করবে !

পুকুরপাড় ঘুরে সাধনা যায় উদ্‌বাস্তু কলোনিতে। আজকাল ওখানে যাতায়াত তার বেড়েছে। দুর্গার নতুন সংসারটা দেখে আসবার আগ্রহটাই তার সবচেয়ে প্রবল। পঁচিশ টাকায় পার করা মেয়ে, তারই কাছে ভোলার মার মাকড়ি বাঁধা রেখে জোগাড় করা পঁচিশ টাকা !

আজও ভোলার মা মাকড়িটা ছাড়িয়ে নিতে পারেনি।

দুর্গা বলে, আসেন দিদি, বসেন।

পায়েস দেখে বলে, ওমা ! নিজের হাতে পায়েস আনছেন ? আমারে ক্যান ডাইকা পাঠাইলেন না দিদি, গিয়া নিয়া আইতাম ?

তাতে কী, আমি নিয়ে এলে দোষ আছে কিছু ?

না না, দোষের কথা কই নাই।

বিয়ের পরেও দুর্গার চুলের আধা রুক্ষতা অদৃশ্য হয়নি। নিরুপায় নিরাশ্রয় এক মানুষের মেয়ে পঁচিশ টাকার বিয়ের অনুষ্ঠানের মারফত এসেছে আরেক নিরুপায় মানুষের ঘরে, একরাশি চুলে তেলের কমনীয়তা সে কোথা থেকে কী দিয়ে কেমন করে আনবে ! সাধনা ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি যে রাখালের বেকারত্ব তার চুলেও ক্রমে ক্রমে রুক্ষতা এনে দিচ্ছিল—রান্না করার এবং মাথায় দেওয়ার দুটো তেলের শিশিই খালি দেখে তাকে তখন হিসাব করে বেছে নিতে হত কোন তেলটা আনতে হবে।

মুখের শুকনো ভাবও ঘোচেনি দুর্গার। মনের আনন্দ আর আহ্লাদে বুঝি এ শুকনো ভাব ঢাকা পড়বারও নয়, অতি বাস্তব অভাবের এটা সৃষ্টি তবে শুকনো মুখেও তার ঘনিয়ে আছে একটা সুখের উত্তেজনা, চাউনি হয়েছে আরও ঘন ও গভীর।

সাধনা জিজ্ঞাসা করে, বিষ্ণু ঘরে নেই ?

ওই ব্যাপারে গেছে।

ব্যাপার জানে সাধনা। এই জমি থেকে ছোটো কলোনিটা উৎখাত করার একটা অপচেষ্টা চলেছে। জমিটা প্রভাত সরকারের। তার প্রকাণ্ড বাগানওলা বাড়িটার গা ঘেঁষে বহুকাল জঙ্গল হয়ে পড়েছিল জমিটা, কোনোদিন কারও কোনো কাজেই লাগেনি। সামান্য কিছু খাজনার বিনিময়ে আশ্রয়হীন মানুষগুলিকে জঙ্গল সাফ করে কাঁচা ঘর তুলে বাস করতে দেবার প্রস্তাব সে খুশি হয়েই গ্রহণ করেছিল। সিকি মাইল তফাতে নাগদের মাঠে হোগলার ঘরের যে প্রকাণ্ড কলোনিটা গড়ে উঠেছে, সেখানকার বাসিন্দাদের নিজেদের সমিতি আর স্থানীয় উদ্‌বাস্তু সমিতি মিলিতভাবে প্রস্তাবটা দিয়েছিল। ওই কলোনির বাড়তি লোক আর নবাগত কয়েকটি পরিবার এখানে এই ছোটো কলোনিটি গড়েছে।

জঙ্গল ঢাকা পোড়ো অব্যবহার্য জমিটাকে চোখের সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ছোটো ছোটো ঘর উঠে ছবির মতো রূপ নিতে দেখে প্রভাতের মাথায় কে জানে কী এক নতুন পরিকল্পনা এসেছে জমিটাকে অন্য কাজে লাগাবার, এখন সে কলোনির বাসিন্দাদের তুলে দিতে চায়। অনেকটা দূরে, শহরতলির প্রায় শেষ প্রান্তে আর একখণ্ড জমি সে এদের দেবে, নিজের খরচে ঘরগুলি সেখানে সরিয়ে দেবে।

সে জায়গাটা ভালো নয়। জমিটা রাস্তার ধারেই বটে এবং রাস্তার এ ধারে কয়েকখানা ঘরবাড়িও আছে, কিন্তু জমিটা শুধু নিচু মাঠ আর জলা, খানিক তফাতে রেললাইন।

কলোনির লোকেরা ওখানে উঠে যেতে রাজি হয়নি।

এই নিয়ে একটা গোলমাল চলেছে।

দুর্গার সঙ্গে কথা কইতে কইতে কলোনির নানাবয়সি কয়েকটি মেয়ে বউ এসে দাঁড়ায়। এদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সাধনার পরিচয় ঘটেছে।

সকলের সঙ্গে সে আলাপ করে। ভুবনের বউ রাজু প্রায় সমবয়সি, তার কাছে খবর নেয় ভুবনের কাজ হয়েছে কিনা। দীনেশের ষাট বছরের বুড়ি মাকে জিজ্ঞাসা করে, দীনেশের বউ পদ্মর জ্বর কমেছে কিনা। তেরো বছরের তুলসীর কাছে জেনে নেয় তার মা কী করছে। এই সব খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে করতে উঠে পড়ে কলোনি থেকে তাদের তাড়াবার চেষ্টার কথা।

দীনেশের বুড়ি মা বলে, আমাগো মইরাও শান্তি নাই !

সাধনা বলে, সত্যি, এ কী অন্যায় জুলুম !

এদের সঙ্গে সুখদুঃখের কথায় মেতে গিয়ে সাধনা ভুলে যায় যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরবে বলে সে রাখালের কাছে ছেলেকে রেখে এসেছে।

আধঘণ্টারও বেশি দেরি হয়ে যায় তার বাড়ি ফিরতে।

বাড়ি ফিরে দ্যাখে, তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বাসন্তী গল্প করছে শোভার সঙ্গে, রাখাল বেরিয়ে গিয়েছে।

বাসন্তী বলে, বাঃ ভাই, বেশ ! কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? যা রাগটা রেগেছে তোমার কত্তাটি ! ছি ছি, কথা কইতে কইতে একেবারে ভুলে গিয়েছি !

বেশ করেছ। রোয়াকে বসে গম ঝাড়ছি, মুখ অন্ধকার করে রাখালবাবু তোমার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে হাজির। গম ঝাড়ছি দেখে বললেন, ও, আপনিও কাজে ব্যস্ত ! আমি বললাম, এ কাজ দুঘণ্টা বাদে করলেও চলবে, ও বেলা করলেও চলবে, কী বলবেন বলুন না ? বললেন তোমার কথা—আসছি বলে ছেলেকে গছিয়ে দিয়ে তুমি নাকি ভেগেছ, উনি বেরোতে পারছেন না। আমি বললাম, আমার কাছে রেখে যান না খোকাকে ? বললে তুমি বিশ্বেস করবে না ভাই, ছেলেটাকে দড়াম করে রোয়াকে বসিয়ে দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। আমিই যেন অপরাধ করেছি ! খোকা বেচারা কেঁদে যায় আর কী, কত কষ্টে যে ঠান্ডা করেছি তোমার ছেলেকে।

রসিয়ে রসিয়ে কথা কইতে বড়ো ভালোবাসে বাসন্তী। কথা বলার এমন একটা নাটকীয় উপলক্ষ পেয়ে তার যেন খুশির সীমা নেই। এতক্ষণ বোধ হয় সবিস্তারে শোভার কাছে বিবরণ দিচ্ছিল, সাধনা এসে পড়ায় আরেকবার বলার সুযোগ পেয়েছে।

পরনে তার বেনারসি, জর্জেটেব ব্লাউজ ! দেয়ালের ও পাশ থেকে একই বাড়ির একদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আর একদিকের দরজা দিয়ে এ পাশে আসবার জন্য সে বেনারসি শাড়ি আর জর্জেটের ব্লাউজ পরেনি, এই দামি জামা কাপড়ে রানি সেজেই সে কুলো দিয়ে রেশনের গম ঝাড়ছিল।

রাজীবের জেল ঠেকাতে আর নতুন করে ব্যাবসা গড়ে তুলতে সে শুধু জমানো টাকা আর গায়ের গয়নাই দেয়নি, তার জন্য কাপড় কেনা নিষেধ করে হুকুম জারি করেছে।

দামি দামি ভালো ভালো শাড়ি জমেছে অনেক, সর্বদা পরে পরে সেগুলি সে ছিঁড়ছে। অসময়ে তার জন্য কম দামি কাপড় কেনার পয়সা খরচ করারও দরকার নেই রাজীবের।

বলে, দুবছর চালিয়ে দেব।

রাজীবের জন্য, নিজের স্বামীর জন্য। দেশ জুড়ে কাপড়ের হাহাকারের জন্য যদি তার এই সিদ্ধান্ত হত যে যারা উলঙ্গিনি হতে বসেছে তারা যতদিন কাপড় না পায় আমি একখানা কাপড়ও কিনব না, তাঁতের রংবেরঙের শাড়ি থেকে জর্জেট বেনারসি পর্যন্ত জমানো শাড়িগুলি আটপউরে কাপড়ের মতো ঘরে পরে ছিঁড়ে প্রায়শ্চিত্ত করব এতদিন কাপড়-চোরদের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য !

সাধনা ভাবে, এ সব কথা কি উঁকিও মারে না বাসন্তীর মনে ?

সাধনা কিনা সদ্য সদ্য ঘুরে এসেছে উদ্‌বাস্তু কলোনি থেকে নিজের চোখে দেখে এসেছে মেয়েরা সেখানে কী দিয়ে কীভাবে লজ্জা নিবারণ করছে, জেনে এসেছে মালতী কেন আজ তিনদিন ঘর থেকে বার হতে পারে না—বেনারসি পরা বাসন্তীকে দেখে কথাটা তাই তার জোরের সঙ্গে মনে পড়ে। স্বামীর জন্য—বিপদগ্রস্ত স্বামী যাতে আবাব গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে, সামলে সুমলে নিতে পারে, আবার ফিরিয়ে আনতে পারে সোনার গয়না আর জর্জেট বেনারসি কিনে দেবার সামর্থ্য—বাসন্তীর পণ শুধু এই জন্য !

মোটাসোটা আঁটোসাঁটো ফরসা সুন্দরী স্বামী সোহাগিনি বউ। স্বামী বই সে জানে না !

পাঁচ মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টারও বেশি দেরি করে ফেলায় নিজেকে সত্যই অপরাধিনী মনে করে দ্রুতপদে সসংকোচে সাধনা বাড়ি ফিরেছিল। ভাববার চেষ্টাও করেছিল কীভাবে কী বলে ক্রুদ্ধ রাখালের কাছে কৈফিয়ত দেবে।

বাসন্তীর কাছে রাখালের কীর্তিকাহিনি শুনতে শুনতে তার মুখে মেঘ নেমে আসে।

তবু সে চুপ করে থাকে।

তার চুপ করে থাকা আর তার মুখের কঠিন ভাব ভড়কে দেয় বাসন্তীকে। সে একটু শঙ্কিত ভাবেই দরদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এ রকম কী করতে আছে ভাই ? কিছু হয়েছে নাকি ? তা যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য ভাবনা নেই। যতই রাগ হয়ে থাক, ফিরে আসতে আসতে রাগ অনেকটা

জুড়িয়ে যাবে। যা ঘটেছিল বললেই তখন মিটে যাবে ব্যাপার। বরং উলটো তুমিই ভাই একহাত নিতে পারবে মানুষটাকে, বলতে পারবে, এখুনি আসব বলে গেলাম আর ফিরলাম না, একবারটি দেখতে হয়তো বিপদে আপদে পড়েছি নাকি, কী হল আমার ? ডাকাতে ব্যাংক লুঠছে, একটা মেয়েছেলেকে একলা পেয়ে—

তুমি আর পেনিও না। দিনের বেলা দশজনের মধ্যে কী আবার হবে ? কলোনির ওদের সাথে কথা কইতে কইতে দেরি হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গেছে, কী করা ? তাই বলে এ রকম গালাগালি করবে ! আমি শুধু ছেলে আগলে থাকব, আমার অধিকার নেই আধঘণ্টা বাইরে থাকার ? চাকরি তো নয়, দোকানে যাবে। একটু দেরি করে দোকানে গেলে কি পৃথিবী রসাতলে যেত ? ভারী তো বিড়ির দোকান !

সাপের ফণা তোলার মতো মুখ উঁচু করে বাসন্তী বলে, ছি, ভাই, ছি ! যার থেকে ভাতকাপড় তাকেই তুমি অমন তাচ্ছিল্য কর ! বিড়ির দোকান বলে তোমার ঘেন্না ! আমি তো বিড়িওয়ালার বউ, আমায় তবে নিশ্চয় ঘেন্না কর !

সাধনা বিপাকে পড়ে নরম সুরে বলে, আমি তাই বলেছি ? তোমার সব উলটো মানে। আপিস তো নয়, নিজেদের দোকান, আধঘণ্টা দেরি করে গেলে কী হয় ! আমি যে এদিকে খেটে মরছি, আমার ছুটি চাই না ? আমি আধঘণ্টা ছুটি নিলেই দোষ ?

বাসন্তী গালে হাত দেয়। তুমি থেকে একেবারে তুই-এ নেমে আসে। বলে, ছুটি নিয়েছিস ? ছুটি ? তোর নিজের সোয়ামি, নিজের ঘর সংসার, তোরই সব, তুই আবার ছুটি নিবি কার কাছে ?

সাধনা একটু হাসে, তা বইকী, আমারই সব, আমিই হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আধঘণ্টা হাওয়া খেতে গেলে তাই মেজাজে আগুন ধরে যায় !

হাওয়া খেতে গেছিলি ? বলে গেছিলি, আমি আধঘণ্টা হাওয়া খেতে গেলাম ? কাজে বেরোবে মানুষটা, একটু ধরো বলে ছেলেকে চাপিয়ে দিয়ে গেলি উধাও হয়ে ! রাগ তো করবেই মানুষটা, একশোবার করবে। নিজেই তো বুঝিস রাগ করবে। নিজেই তো তুই ইচ্ছে করে রাগিয়েছিস !

বলতে বলতে আবেগে উত্তেজনায় থমথম করে বাসন্তীর মুখ। এ পর্যন্ত কখনও সাধনা তার এ রকম ভাবান্তর ঘটতে দেখেনি। কড়া সুরে বাসন্তী বলে, ওই এক ধুয়া উঠেছে শুনি, আমরা নাকি দাসী বাঁদি। যতই সুখে রাখুক সোহাগ করুক, আসলে আমরা চাকরানি ! ওনারাই কত্তা, মালিক, খুশি হলে মাথায় রাখেন খুশি হলে পায়ের নীচে মাড়ান। এমনি হই বা না হই, আসলে দাসী বাঁদি ! এ আসল আবার কীরে বাবা ! বেশ তো, দাসী হলে দাসী বাঁদি হলে বাঁদি—তাই যদি রীত হয় সংসারের, তাই সই ! তা নিয়ে মাথায় ঘা করে আর করছি কী ? কিন্তু সব নাকি ওনাদের খুশিতে হয় ! আমরা কি না পুতুল, ওনাদের হুকুমে উঠি বসি, খুশি অখুশি খাটাই না মোটে ! এমন ছিষ্টিছাড়া ইস্তিরি তো সংসারে দেখিনি ভাই ! সবাই আমরা খুশি খাটাই, কর্তালি করি। আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের কায়দায় আমরা জোর খাটাই।

আশার দিকে চেয়ে বাসন্তী লজ্জার সঙ্গে হাসে, আশাদি চুপ করে শুনছেন, আমি বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম।

আশা সত্যই এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি।

আগেও সে কম কথা বলত, বেকারের বউ সাধনার সঙ্গে এক রকম ভালোমন্দ কোনো কথাই বলত না। তার এই অবজ্ঞায় কীভাবেই যে মাঝে মাঝে জ্বলে যেত সাধনার গা, এমন একটা উগ্র ইচ্ছা জাগত গায়ে পড়ে আশাকে অপমান করবার।

কিন্তু সে আশা আর নেই।

এখন সে মনের দুঃখে চুপচাপ থাকে এটা জানা থাকায় তার নীরবতায় কেউ ক্ষুণ্ণ হয় না। আগে সে চলত দূরত্ব বজায় রেখে, আজকাল নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে।

বাসন্তীর কথা শুনে আশা বলে, আপনার কথা শুনতে বেশ লাগে।

খুব বকবক করি, না ?

তাতে কী, প্যানপ্যান তো করেন না। একজন কম একজন বেশি কথা কইবে, তাই তো উচিত।

সাধনা ভাবে, এতই সামান্য কী তফাতটা ? হুড়মুড় করে দুর্দিন এসে ঘাড়ে চেপেছে দুজনেরই, বাসন্তী বরং অভাবে পড়েছে আশার চেয়ে অনেক ভালো অবস্থা থেকে। বাসন্তী কাতর হয়নি, খানিকটা সামলে নিয়েছে। সে ভুলতে পারে, হাসতে পারে, বকবক করতে পারে। আশা যেন কাবু হয়ে পড়েছে একেবারে, মনের জোরে সর্বদা নিজেকে তার খাড়া রাখতে হয়।

সে নিজে ? তার যখন ছিল দুর্দশা, এরা দুজন ছিল সুখে। আজ এদের অবস্থা গেছে বদলে, তার শেষ হয়েছে অসহ্য অভাবের দিন। নিজে সে বদলায়নি ?

৪

বর্ষা আসি আসি করছে।

এলে বাঁচা যায়। গরম অসহ্য হয়ে উঠেছে মানুষের।

প্রতিবারই মনে হয়, এবারেব গবম বুঝি আর সয় না। কিন্তু এ যেন শুধু কথা ফেনিয়ে বলার মতো বাড়িয়ে মনে হওয়া। কে না জানে যে গরম প্রতিবারই অসহ্য মনে হয় কিন্তু দিব্যি সয়ে যায় মানুষের, ফ্যানের বদলে যাদের শুধু ভাঙা হাত পাখা সম্বল, তাদের আরও সহজে।

এবার কিন্তু সত্যই অসহ্য হয়েছে। নতুন রকম ভীষণ রকম গরম পড়েছে বলে নয়, জীবনটাই অনেক নতুন আর বাড়তি শোষণে সহ্যশক্তিতে ভাঁটা পড়িয়ে দিয়েছে বলে। বেঁচে থাকাটাই এমন ভয়ানক কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে গরমের কষ্টটা মনে হচ্ছে প্রকৃতির ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের মতো !

গরমকে এয়ার কন্ডিশনড্ করার স্বাদটা এ পাড়ার কয়েকজনের চোখে দেখা আছে। কয়েকটা সিনেমায় বাস্তবকে মার্কিনি আর খানিকটা ব্রিটিশ ধরনে উড়িয়ে দেবার প্রচারের সঙ্গে ঘণ্টা দুই গরম দেশে গরমকালে সর্বাঙ্গীণ শীতলতা ভোগ করতে দেওয়া হয়।

সাধনা বাসন্তী বা আশারা কেন, বাসন্তীর ঝি বকুল পর্যন্ত অনেকবার এ ঠান্ডা সহ্য করেছে !

ঝির কোলে মেয়েকে দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে পাশে বসিয়ে বাসন্তী সিনেমা দেখত। যাত্রা থিয়েটার দেখতে যাবার স্বদেশি সেকেলে ফ্যাশনকে সে বিদেশি সিনেমায় যাওয়া পর্যন্ত টেনে এনেছিল।

এখন অবশ্য সে সিনেমাব নেশা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, বকুলকেও ছাড়িয়ে দিয়েছে।

দুঃখের দিনে সিনেমায় গিয়ে দুদণ্ড দুঃখ ভুলে থাকা যায়, অভাবের অনেক জ্বালা থেকে একটু রেহাই পাবার জন্য গরিবেরাই বেশি সিনেমা দ্যাখে—এ সব কথার মানে বোঝে না বাসন্তী। কেন রে বাবা, এত খাতির করা কেন দুঃখকে ? আনন্দ করার জন্য নয়, দুঃখকে একটু এড়িয়ে যাবার জন্য সিনেমায় যেতে হবে ?

সিনেমা ছাড়ার চেয়ে বকুলকে ছাড়তেই বরং তার কষ্ট হয়েছে ঢের বেশি।

বকুল কেঁদেকেটে অনর্থ করে বলেছিল, মোকেও শেষে ছাঁটাই করলে মা ? এত বছর খাটছি তোমার সংসারে ?

বাসন্তীও কেঁদে ফেলেছিল।—আমরাও যে ছাঁটাই হয়েছি বাছা ? তোকে পুষব কী করে ? মাসে তুই দুবার তিনবার মাইনে নিয়েছিস, একবার দেবার সাধ্যি যে আমার ঘুচে গেছে লো হারামজাদি !

আমি এক টুকরো মাছ খেলে তুই দু-টুকরো খেতিস, আমায় যে ডাল দিয়ে ডালের বড়া দিয়ে চালাতে হচ্ছে মা ?

কেঁদোনি মা। পায় পড়ি তোমার। ঝাঁটা মেরে দূর করে দাও মোকে, তুমি কেঁদোনি। আচ্ছা মা, এমন ছিষ্টিছাড়া অঘটন কেমন করে ঘটল বলো দিকিন, কে ঘটাল ? এতকালের চাকরানিটাকে বিনে মায়নায় ভাতকাপড়ে রাখতে পারবে না, এমন দশা কেন হল তোমার ? সারা দেশে কি শনির নজর পড়েছে ?

স্বাধীন হতে গেলে এ রকম হয়।

স্বাধীন হইনি তবে ? স্বাধীন হলে কী হবে ? তুমি ফের রাখতে পারবে মোকে ?

আবার হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বকুল বলেছিল, কবে তবে আমরা স্বাধীন হব মা ? কবে সেদিন আসবে মা ?

পরনে তার বাসন্তীরই সাতাশ টাকা দামের পুরানো একটা তাঁতের শাড়ি। প্রায় নতুন শাড়িটা। কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল বকুল। সাতমাসের অকাল প্রসবের রক্তে ভেসে গিয়েছিল তার ছাপা শাড়িটা, মাস তিনেক আগে বাসন্তীই একটি মাসও আর টিকবে না বলে সংকোচের সঙ্গে যে শাড়িটা তাকে দান করেছিল।

বাসন্তী ব্যবহার করলে একমাসেই ছাপা শাড়িটা ছিঁড়ে ফেঁসে যেত সন্দেহ নেই, তিন-চারদিন পরে পরেই সে লন্ড্রিতে সাফ করতে দিত শাড়িটা। বকুল তিনমাস একটানা ব্যবহার করেছে, দু-এক জায়গায় সামান্য মোটা সেলায়ের চিহ্ন পড়া ছাড়া কোথাও একটা নতুন ফুটো, পয়সাব মতো ফুটোও হয়নি শাড়িটাতে।

কাপড়টা খুলে ফেলে সাতাশ টাকার তাঁতের শাড়িটায় জড়িয়ে বকুলকে পাঁজাকোলে তুলে এনে তার দামি পাটিতে শুইয়ে দিয়েছিল।

ডাক্তার ডেকেছিল ষোলো টাকা ভিজিটেব।

অ্যাম্বুলেন্স না পেযে হাসপাতালে পাঠিযেছিল পাডার একজনের গাড়িতে সাত টাকা ভাড়া দিয়ে। ভাড়া হিসাবে নয়, পেট্রোলের দাম হিসাবে প্রভাত নির্বিকার চিত্তে সাত টাকা আদায় কবেছিল। তবু, তার নামটা বাসন্তী প্রকাশ করে না।

বকুল ঝির জন্য তার শোকটা আন্তরিক। নিজেই আজ সে ঘর ঝাঁট দেয় বাসন মাজে বলে নয়। এ সব সে করছে নিজের খুশিতে রাজীবের আপত্তি উপেক্ষা করে, গায়ের জোবে।

রাজীব বলে, একটা ঠিকে ঝি রাখতে পারি না ভেবেছ নাকি ?

বাসন্তী বলে, তুমি আর কথা কোয়ো না। পার্টনার যাকে বোকা পেয়ে পথে বসায় তার মুখে আবার কথা ! নবাবি যখন করতে হয় আমিই করব, তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না ! বুঝলে ?

লোলুপ চোখে রাজীব তাকে দেখে। একযুগ ধরে তার প্রেমে ভাটা পড়ল না, দিনদিন যেন নেশার মতোই চড়ছে।

মেঝে ঝাঁট দিতে দিতে বাঁকা চোখে বাসন্তী তাকিয়ে নেয়।

ঠিকে ঝিদের ঝাঁটা মারি। যেদিন পারব আবার বকুলকে রাখব।

লোকের বাড়ি ঝি আসে, ঝি চলে যায়—আগে বাসন্তী বুঝতে পারত না এ ব্যাপারের মানে। এখন খানিকটা টের পেয়েছে, বকুলকে ছাড়িয়ে দেবার পর।

ঝি পুরানো হওয়া আজকাল অসাধারণ ব্যাপার। পুরানো দিনের মতো আদর দিয়ে আপন করে সে ঠিকে ঝি বকুলকে এত বছরের পুরানো করেছে, কিন্তু সেটা আজ কজন পারে ? সে নিজেও আজ পারছে না।

গিন্নিদের আর ঝিদের মধ্যে শুধু পয়সা আর খাটুনি লেনদেনের চাঁছাছোলা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। দোষ কোনো পক্ষেরই নয়। নিজেদেরই জোটে না গিন্নিদের, তিন বাড়ি খেটে ঝিদের ভরে না পেট।

সাধনাকে সে বলে, তাই বটে ভাই। অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট। ঝিরা টিকবে কীসে ? ছাঁকা মাইনে, বাঁধাধরা ছাঁকা কাজ, দুটো মিষ্টিকথা পায় না। ঝিকে মিষ্টিকথা মানুষ বলবেই বা কোন ভরসায় ? আজ এটা কাল ওটা চেয়ে বসবে—দেবার সাধ্যি কই ? ছাঁকা মাইনে দিয়ে রাখতে পারলে আমি কি বকুলকে ছাড়াই ! না চাইতে এটা ওটা কত কী পেয়েছে, দুটো একটা টাকা যখন তখন চেয়ে নিয়েছে, মাইনে থেকে কখনও কাটিনি। আজ কোন মুখে শুধু মাইনেটা ধরে দেব ?

যা বোঝে না তা নিয়ে মাথা ঘামায় না বাসন্তী, যেটুকু বোঝে সহজভাবে সোজাসুজি বোঝে। তার এই সহজ বাস্তববোধ মাঝে মাঝে বিচলিত করে দেয় সাধনাকে।

অভাবে তারও স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। চাকুরে স্বামীর সঙ্গে যে উগ্র ব্যবহার কল্পনাতেও আনতে পারত না, স্বামীটি বেকার হতেই তার চেয়ে বেশি উগ্রচণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অভাব আশাকে করে দিয়েছে ঠিক তার বিপরীত—নির্জীব নির্বাক মূর্তিমতী হতাশার মতো।

অথচ কত সহজভাবে বাসন্তী মেনে নিয়েছে অভাবকে !

কত অনায়াসে বাতিল করে দিয়েছে আগের দিনের জের অতীত সুখের জাবর কেটে দুঃখ দুর্দশাকে আরও বেশি অসহ্য করা। সেই বাসন্তী বিশেষ কাবু না হয়েই রাঁধে বাড়ে বাসন মাজে—মেয়েকে রাখে ; রানির মতো যার আলস্য উপভোগের ঢং দেখে সেদিনও গা জ্বলে গিয়েছে সাধনার !

কিন্তু কেন ? কেন বাসন্তীর পক্ষে এটা সম্ভব হল ? সে যা পারেনি, আশা যা পারছে না, বাসন্তী কেন তা পারবে ?

এ প্রশ্নের জবাব সাধনা পায়। বাসন্তীর কাছেই পায়।

কিছুদিন পরে বাসন্তীর চোখে মুখে সে দেখতে পায় ক্লেশের ছাপ, ক্লান্তির চিহ্ন। তার পরিপুষ্ট সর্বাঙ্গের অত্যধিক লাবণ্য ধীরে ধীরে খরচ হয়ে যাচ্ছে টের পাওয়া যায়।

এই তবে আসল মানে বাসন্তীর এত সহজে এত অনায়াসে দুঃখকে বরণ করার ? জীবনীশক্তি সে সঞ্চয় করেছিল অনেক, তার বা আশার যে সুযোগ কোনোদিন জোটেনি।

জমানো গয়না জমানো টাকা দিয়ে সে স্বামীকে উদ্ধার করেছে বিপদ থেকে। জমানো স্বাস্থ্য আর অনাহত আনন্দ ভরা মন নিয়ে নেমেছে অভাবে সঙ্গে লড়াই করতে।

তাজা দেহ তাজা মনকে ক্ষয় করার সুযোগ পেয়ে বাসন্তী সতেজে খাড়া থাকতে পেরেছে। তাদের মতো আগে থেকেই ওর দেহ আর মনের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়নি।

তাই সা [illegible] িক।

ওই গরম সহ্য হওয়া আর অসহ্য হওয়ার মতো একই ব্যাপার। জীবনীশক্তি বজায় থাকলে গ্রীষ্মও যেমন সয়, দুঃখও তেমনি সহজে কাবু করতে পারে না মানুষকে। বাসন্তী মোটাসোটা মানুষ, গরমে তবু তাদের চেয়ে তার কষ্ট হয়েছে কম।

অভাব তাকে কাবু করতে পারছে না এখনও।

দুজনের অতীত জীবন মিলিয়ে দেখতে গিয়ে মনে মনে সাধনা থ বনে থাকে। এতদিন তার ধারণা ছিল যে আগে নয়, রাখালের চাকরি যাবার পর সম্প্রতি তারা দুঃখের স্বাদ পেয়েছে। আগে নাকি তারা সুখে ছিল ! আজ এমনই চরম দুরবস্থা যে তুলনার ফাঁকিতে এই পরম মিথ্যাটাও সত্যের মতো মনে হয়।

অভাব ছিল না কবে ? কেরানির মেয়ে কেরানির বউ সে আর তার মতো অন্য সকলে কবে জেনেছে প্রাচুর্যের স্বাদ, কবে মুক্ত থেকেছে আতঙ্ক আর দুর্ভাবনার আবহাওয়া থেকে ? কোনোমতে বেঁচে থাকাটাই চিরদিনের অভ্যাস, দেহমনের সর্বাঙ্গীণ ঘাটতিই চিরন্তন প্রথা—অবনতি হতে হতে চাকরি গিয়ে রাখাল বেকার হয়ে পড়ামাত্র একেবারে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াতে হওয়ায় মনে হত সুদিনই ছিল বুঝি আগেকার কোনোমতে টিকে থাকার দিনগুলিও !

বাসন্তী এতকাল এড়িয়ে এসেছে এই অপূর্ণতার চাপ। পিছিয়ে সে আছে অনেক দিক দিয়ে, যে সব বিশ্বাস ধারণা সংস্কারকে বাতিল করে দিয়ে তাদের মতো মানুষেরাও এগিয়ে গেছে এখনও সেসবের গুদাম হয়ে আছে তার মনটা, কিন্তু জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির অভাব সে জানেনি, পরিবেশের সঙ্গে নিত্য নতুন সংঘাত বাধেনি তার পিছিয়ে পড়া জীবনের।

এই পর্যন্তই ভাবতে পারে সাধনা। বাসন্তীর সঙ্গে নিজের এই একপেশে অসম্পূর্ণ তুলনা তাকে উন্মনা করে দেয়, ঈর্ষা মেশানো বিষাদ আর নৈরাশ্য জাগায়।

এত দাম জীবনে প্রাথমিক মোটা প্রয়োজনগুলির ? জীবনকে রসালো আনন্দময় করার জন্য এত জরুরি এই ভিত্তি শক্ত করে গাঁথা ?

অনভ্যস্ত টানাটানি আর অবিশ্রান্ত খাটুনি যেন রাজীবের সঙ্গে বাসন্তীর নতুন এক ধরনের প্রণয়লীলা ! তাদের স্থূল অমার্জিত ঘন গাঢ় রসালো প্রণয়ের যেন নতুন একটা পর্যায় আরম্ভ হয়েছে অভাবের দিন শুরু হওয়ার সঙ্গে। বিলাসব্যসন ত্যাগ করে রান্না করা বাসন মাজা ঘর ঝাঁট দেওয়ায় মেতে গিয়ে রাজীবকে যেন আবার নতুন করে জমিয়েছে বাসন্তী।

দুজনের হাবভাব কাবু করে দেয় সাধনাকে !

মুখে শ্রান্তির ছাপ পড়েছে বাসন্তীর কিন্তু রসে আহ্লাদে প্রাণটা যেন তার থইথই করছে !

তার কাছে গোপন করে না বাসন্তী। নালিশ জানায়। মনের মানুষের সোহাগের বন্যায় হাবুডুবু খেতে খেতে সখীর কাছে দম নেবার অবসরটুকুতে থমথমে আনন্দের ভঙ্গিতে নালিশ করে !

বুড়ো বয়সে এমন করে পিছনে লেগে থাকে ভাই ! কষ্ট করছি দেখে সোহাগ বাড়িয়েছেন ! জ্বালাতন হয়ে গেলাম।

জ্বালাতন বইকী !

ঈর্ষা থেকে আসে আত্মগ্লানি। স্থূল অমার্জিত জীবন ? ওদের সারা বাড়ি খুঁজে রামায়ণ মহাভারত আর দু-একখানা সতীর অমুক সতীর তমুক ছাড়া বই মেলে না একখানা ? চিঠি লিখতে বসলে কলম ভাঙার উপক্রম হয় বাসন্তীর ?

কী এসে গিয়েছে তাতে ওদের !

আর কী লাভ হয়েছে তাদের বই মাসিকপত্র খবরের কাগজ পড়ার সাধ আর চিন্তা করার সাধ্য থেকে, কিঞ্চিৎ সভ্যতা ভব্যতা আর মার্জিত রুচি থেকে !

অভাব অনটন পর্যন্ত ওরা তলিয়ে দিয়েছে স্থূল আনন্দ আর উন্মাদনায়।

আর অভাব মিটে গেলেও তাদের জীবন হয়ে আছে নিরানন্দ প্রাণহীন একঘেয়ে দিন কাটানো।

বাস্তব দুঃখের সঙ্গে সখীর এই অবাস্তব বাকচাতুরি আর ছেলেখেলা কোথায় ভাবিয়ে তুলবে সাধনাকে, তার বদলে তার জাগে ঈর্ষা আর খেদ।

বহুকাল ধরে দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে তারা কী হয়েছে আর সদ্য সদ্য দুঃখের সঙ্গে পরিচয় শুরু হওয়ায় বাসন্তীরা কী হয়েছে—তারই মধ্যে সে করছে তুলনা !

দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা নিয়েও সে যে ভেঙে পড়ার উপক্রম করেছিল রাখালের বেকারত্বের ধাক্কায়, সে অভিজ্ঞতা না নিয়েই যে বাসন্তীকে শুরু করতে হয়েছে দুর্দিনের যাত্রা এটা খুব সরল সহজ বাস্তব হিসাব।

কিন্তু এটা মনেও আসে না সাধনার।

সে ভাবে না যে সঞ্চিত বাড়তি শক্তি তো বাসন্তীর শেষ হয়ে যাবে দুদিনেই, কীসের জোরে তখন সে বইবে অনভ্যস্ত দুর্দশার বোঝা ?

ঝি-গিরি রাঁধুনিগিরি দাইগিরি করেও বঞ্চিত সংকুচিত অপূর্ণ জীবনকে প্রেম দিয়ে রস দিয়ে কাব্য দিয়ে আনন্দময় করার চিরন্তন উপদেশটাই হাতেনাতে সবে পালন করতে শুরু করেছ বাসন্তী। ক-দিন আর লাগবে ফাঁকিটা প্রকট হতে ?

ইতিমধ্যে বাসন্তীদের নীচের তলায় একদিন ভাড়াটের আবির্ভাব ঘটে—প্রৌঢ়বয়সি চরণ দাস। হরেকৃষ্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কাজ করে। তার স্ত্রী রাধা কালো এবং রোগা, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। সঙ্গে আসে রাধার বিধবা বুড়ি মা আর আঠারো উনিশ বছরেব ভাই গৌর। সেও ওই কারখানায় ঢুকেছে চরণের চেষ্টায়।

নীচের তলাটা যেন হঠাৎ মানুষে আর কলরবে ভরে যায়। দুখানা ঘরে এতগুলি মানুষ !

বাসন্তী কল্পনাও করতে পারে না।

বাড়িভাড়া প্রায় তিন ভাগের দু ভাগ কমিয়ে দেবার জন্য বাসন্তীই উৎসাহী হয়ে তার সংসারটা গুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেড়খানা ঘর আর খোলা ছাতটুকুতে।

ভাড়াটে বাহিনী দেখে তার সত্যি সত্যি রাগের সীমা থাকে না।

তোমাব এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই ? আর তুমি ভাড়াটে পেলে না ?

রাজীব ভড়কে গিয়ে বলে, কেন কী হল ? কোনো হাঙ্গামা করেছে নাকি, বজ্জাতি ?

ওবা এতগুলি লোক আমায় জানালে না কেন ?

রাজীব আমতা আমতা করে বলে, আমি কী জানতাম ? বন্ধু একে জুটিয়ে দিলে, বললে যে লোক খুব ভালো, কোনোরকম গোলমাল করবে না। চরণবাবুকে শুধিয়েছিলাম ওরা লোক কজন, কী বিত্তান্ত। তা আমায় বললে যে স্বামী-স্ত্রী আর কটি ছেলেপিলে।

বাসন্তী ঝংকার দিয়ে বলে, তবে তো খুব ভালো লোক, গোড়াতেই মিছে কথা বলেছে। যেমন তুমি, তোমার বন্ধুও জোটে তেমনি।

তা, ওরা লোক বেশি তো আমাদের কী এমন অসুবিধে ?

আহা মরি, যা বলেছ ! নীচের তলায় হাট বসালে, আমাদের কী অসুবিধে ! আমি থাকব না এখানে, তুমি অন্য বাড়ি খোঁজ করো।

অনেকদিন বাদে আজ রেগেছে বাসন্তী, রাগ করে মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলেছে।

কোঁদল করা নয়। আগের মতো কোঁদল করতে বোধ হয় ভুলেই গেছে বাসন্তী। তবু তার কাছে একটা মুখ ঝাম্‌টা পেয়ে রাজীবের খুশির সীমা থাকে না।

খুশি হয়ে করে কী, এই সকালবেলাই বাসন্তীর স্থায়ী কড়া হুকুম অগ্রাহ্য করে বাজার থেকে প্রায় সোনার মতোই দুর্মূল্য আস্ত একটা ইলিশ মাছ নিয়ে আসে !

খুশি হলে হোক। নইলে এই নিয়ে ঝগড়া করুক। রাজীবের মনটা ছটফট করছে বাসন্তীর কোঁদলের স্বাদ পাওয়ার জন্য।

মাছ দেখে বাসন্তী মুখ বাঁকিয়ে, আড়চোখে তাকায়। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলে !

রাজীব কৃতার্থ হয়ে যায়।

ঘুষ দিচ্ছ ? এত বড়ো মাছটা যে আনলে, কে খাবে ? তিনবেলা করব আমি—কাল বাসি মাছ খাওয়াবো।

মাছ খাওয়ার লোকের অভাব আছে নাকি তোমার ?

সেই হিসাব ধরেছ ? একা একা ভালো জিনিস খেতে বিশ্রী লাগে ?

লাগে না ?

আজকাল আর বিশ্রী লাগে না গো, লাগে না। নিজের জোটে না, পরকে দেব !

মাছ দেখে হেসে ফেলে রাজীবকে কৃতার্থ করেছিল বাসন্তী, হালকা সুরে হলেও শেষ কথাটা বলে সেই আবার তাকে আহত করে।

বাসন্তীর মুখে অভাবের উল্লেখ শুনলেই তার আঘাত লাগে না—এভাবে বলা হলে লাগে !

একটু ম্লান গম্ভীর মুখেই সে দোকানে যায় সেদিন।

দেখে বাসন্তীরও মনটা যায় খারাপ হয়ে !

ধীরে ধীরে সে নীচে নামে।

তফাত থেকে দেখেই নিজের বাড়িতে মানুষের যে ভিড়টা তার অসহ্য ঠেকেছে, সেই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে সে দেখবে সইয়ে নেওয়া যায় কিনা।

ঘর গুছানো আর রান্নাবান্না নিয়ে তারা ব্যস্ত তখনও ঘরে অনেক জিনিস এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে, রাধা আর তার বড়ো মেয়ে প্রণতি কোমরে আঁচল জড়িয়ে লেগেছে সেই বিশৃঙ্খলার পিছনে।

মালপত্রের মতোই এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে বসে ছড়িয়ে আছে ছয়টি ছেলেমেয়ে—বড়োটির বয়স দশ-এগারোর বেশি নয় !

প্রণতির বয়স পনেরো-ষোলো হবে।

ঘর গুছোচ্ছেন ?

হ্যাঁ, দেখুন না চেয়ে, কী ঝঞ্ঝাট দিব্যি ছিলাম, কী যে পোকা ঢুকল মাথায়। নিজেব বাড়ি ভাড়া দিয়ে দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকো। কোথায় রাখি এখন এত জিনিস ?

সেটা মিছে নয়। তাকালেই বোঝা যায় জিনিসপত্রগুলি শুধু চরণদাসের একার জীবনে সঞ্চয় করা নয়, বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে জমছে। জীর্ণ পুরানো একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য কত জঞ্জালও যে আছে। ফেলতে বোধ হয় মায়া হয়।

আপনাদের নিজেদের বাড়ি ছিল নাকি ?

তবে না তো কী ? কত বললাম, একখানা ঘর অন্তত নিজেদের জন্য রাখো, তাতে বাড়তি জিনিসপত্র থাকবে। তা নয়, সবটা বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিলেন।

কোলের ছেলেটি দোলায় ঘুমোচ্ছিল। দোলা টাঙানো হয়েছে সর্বাগ্রে। এমন আচমকা চিৎকার করে ছেলেটা কেঁদে ওঠে যে বাসন্তী চমকে ওঠে।

কী হল ?

ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে মুখে মাই গুঁজে দিয়ে রাধা বলে, কিছু হয়নি।

বসতে বলে না কেন কে জানে ! বোধ হয় ভেবেছে, এক বাড়িতে থাকে, দরকার হলে নিজেই বসবে ! ছোটোখাটো রোগা কালো মা-টির জন্য বাসন্তী মায়া বোধ করে, কিন্তু ছেলেমেয়ের পালটি দেখে তার অস্বস্তিরও সীমা থাকে না। দিনরাত এরা হট্টগোল করবে—এইটুকু বাচ্চাটার পর্যন্ত কী গলা ফাটানো কান্না !

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না বাসন্তী।

৫

বাসন্তীও মাঝে মাঝে সাধনার সঙ্গে পাড়া বেড়াতে বেরোয়।

নীচের তলার হইহই কিচিরমিচির ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি তার সহ্য হয় না। বাইরে বেরিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

মাঝে মাঝে সে তার সহজ বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সাধনার মনের নানা প্রশ্নের জবাব খোঁজার সূত্র ধরিয়ে দেয়।

মল্লিকদের শোভার বিয়ে না হওয়ার রহস্য সে জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দেয় সাধনাকে।

মল্লিকদের বাড়ি লোক অনেক। অনেক লোক মানেই অনেক হাঙ্গামা, অনেক কাজ। বাড়ির মেয়েরা সারাদিন ব্যস্ত আব বিব্রত হযে থাকে, অবিশ্রাম খাটে।

বুড়ো রাজেন মল্লিক পেনশন পায়। দুই ছেলে চাকরি কবে, এক ছেলে ডাক্তারি পড়ে, এক ছেলে বখামি করে ঘুরে বেড়ায়, আরেক ছেলে পড়ে স্কুলে। শোভার বড়ো বোনের বড়ো ছেলেটিও এখানে খরচ দিয়ে থেকে কলেজে পড়ে, তার বাবা মফস্বলেব শহরের ডাক্তার। বড়ো ছেলের পাঁচটি ছেলেমেযে, মেজো ছেলের দুটি এবং আরেকটি শিগগির হবে। এ ছাড়াও থুড়থুড়ে একজন বুড়ি থাকে বাড়িতে, শোভার সে পিসিমা, রাজেনের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো।

তা ছাড়াও মাঝে মাঝে আত্মীয়কুটুম্ব আসে।

তবে দু-চারদিনের বেশি থাকে না। যাবা আসে তারা নিজেবাই এটা ভালো করে বোঝে যে আজকের দিনে এর চেয়ে বেশি চাপ দিতে গেলে সহ্য হবে না, আত্মীয়তা কুটুম্বিতাব বাঁধন ছিঁড়ে যাবে।

বড়ো মেয়ে মেজো মেযে মাঝে মধ্যে দু-একমাস থেকে যায়, খরচ দিযে। বড়ো জামাই ডাক্তার, মেজো জামাই মোটামুটি ভালোই চাকরি করে।

ছেলেদের চাকবি-বাকরি পড়াশুনা সবই শহবে। দেশেব সম্পত্তি বেচে দিয়ে রাজেন এই ছোটোখাটো বাড়িটা কিনেছিল। বাড়িটা রাজেনের, শুধু এই একটি সূত্রে বাঁধা হয়ে এতগুলি প্রাণীর জীবনযাত্রা এখানে একত্র হয়ে আছে।

মোটামুটি মিলে মিশেই আছে। ঝগড়াঝাঁটি যা হয় তার চেহারা এখনও পারিবারিকই বটে। বড়ো স্বার্থের সংঘাত ঘটবার কারণ এখনও ঘটেনি।

রাজেন পেনশন পায, বাড়িটাও তারই।

কিন্তু ভাঙন ঠেকাবে কে ? কাল যা ভেঙে দিতে চায় ? ভাঙনের পোকা কুরে কুরে ক্ষয় করেছে ভিতরে ভিতরে, তলায় তলায়। নজর করলে বাইরে চোখে পড়ে এই ধরনের পাবিবারিক প্রাচীনতা আর জীর্ণতা। অন্ধবিশ্বাসী তবু আশা করে, হয়তো আবও অনেককাল টিকে যাবে !

স্কুল কলেজ আপিস, বুড়োবুড়ি কাচ্চাবাচ্চা, অসুখ-বিসুখ পূজাপার্বণ—এলোমেলো বিশৃঙ্খল সংসারযাত্রায় কোনোরকমে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপাত করতে হয় মেয়েদের। অবশ্য যার যতখানি করণীয় এবং যে যতখানি না করে পারে তারই হিসাবে।

রান্নাকরা বাসনমাজা কাপড়কাচা ছেলেধরা সেলাইকরা—নানাকাজে শুধু হাত লাগাতেই হয় না শোভাকে, নানাকাজ সম্পন্ন হওয়ার দায়িত্বও তাকে নিতে হয়।

সেই তো শুধু ঝাড়া হাত-পা এ বাড়িতে, জোয়ান বয়সি সুস্থ সমর্থ মেয়ে। শোভাও মনে করে না তাকে বেশি রকম খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে, অন্যায় ভার চাপানো হয়েছে তার ঘাড়ে। নিজেদের বাড়িতে যতটা পারে খাটবে না মেয়েছেলে, চালু রাখবে না সংসার ?

অনাদর অবহেলা নেই। ডাল তরকারি যদি কম পড়ে যায়, হাঁড়িতে ভাতে টান পড়ে, সেটা শুধু তার একার বেলা নয়, কারও ইচ্ছাকৃত নয়। যে দিনকাল যে ব্যবস্থা রেশনের আর যে দাম কালোবাজারি চালের, পুরুষ আর ছেলেপিলেদের খাওয়ার পর মেয়েদের বেলা ও রকম কম পড়বেই।

তার পাতেই বরং বেশি ভাত দেবার চেষ্টা হয়, বউদি ডালের বাটি কাত করে দেয় তারই পাতে।

সবাই যেমন পরে সেও তেমনি পরে সেলাইকরা কাপড়। বউদিদের চেয়ে বরং তার কাপড়টাই আসে আগে, না চাইতে তার জামার ছিট কিনে আনে ভায়েরা।

শোভার কেন বিয়ে হয় না আবিষ্কারের চেষ্টায় এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাধনা পরিবারটিকে পরীক্ষা করেছে।

বাসন্তী বলে, ওমা, তা আনবে না ? মায়ের পেটের বোন, বাপ বেঁচে রয়েছে, ছেলেপিলের জামার ছিট এনে সেলাই করিয়ে নেবে শুধু ?

তাই বটে। ছিট শুধু শোভার একার জন্য আসেনি, শুধু নিজের জামাটিই সে সেলাই করবে না !

চা করে বড়ো বউ নিজে এনে দেয় ননদকে।

শুনে বাসন্তী বলে, ওমা, তা দেবে না ? একলা নিজে ক-টাকে সামলাবে ? ননদ যদি না বোগা ছেলেটার ঝঞ্ঝাট পোয়াত, রাতে ঘুমোতে না পেয়ে মরে যেত না বড়ো বউ !

এই জন্য বাড়িতে আদর শোভার ? সবার জন্য খেটে মরে, সবার দায় সামলায়, তাই তার খাতির ? বিনা মাইনেতে এমন প্রাণ দিয়ে খাটবার লোক মিলবে না বলে ?

না না, ছি ! খাটতে না পারলে, আলসে কুঁড়ে হলে কি ফেলে দিত ? সবাই হয়তো এতটা সন্তুষ্ট থাকত না, এইমাত্র। বোন বলেই আদর-যত্ন করে, সবার জন্য এত করে বলে আরও খুশি সবাই, এইমাত্র। মেয়েটাও কি ও সব ভেবে খেটে মরে ? নিজের বাপভায়ের সংসার বলেই খাটে।

মুখে তর্ক করে না সাধনা, মনে মনে বলে, সে তো নিশ্চয় ! বাপভায়ের সংসার বলে প্রাণের তাগিদে প্রাণপাত করে খাটে বলেই তো তার এত দাম ! হাজার টাকা মাইনে দিয়েও তো এমন লোক মিলবে না যে আপনজনের জন্য করছি জেনে এমনভাবে প্রাণ দিয়ে করবে !

কিন্তু তাই বলে বাপ মেয়ের, ভায়েরা বোনের, বিয়ে না দিয়ে আইবুড়ো করে ঘরে রেখে দেবে নিজেদের স্বার্থে ?

বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি গেলে সবাই মুশকিলে পড়বে, তাই বুঝি বিয়ে দেবার গরজ নেই ?

বাসন্তী হেসে ফেলে, ধেত, কী যে সব অদ্ভুত কথা তোমার মনে আসে ভাই ! বাপ ভাই কখনও তা করতে পারে ? বিয়ে দিতে পারলে বরং দায় চুকবে, হাঁপ ছাড়বে !

তবে ?

সুবিধামতো পাত্র পায় না, এই আর কী। যা দিনকাল ! তা ছাড়া, শুধু খাটতেই পারে মেয়েটা, আর কী আছে যে ভালো ছেলের পছন্দ হবে ? ওদের এখন উঁচু নজর—এদিকে মেয়ের যে চেহারাও নেই, লেখাপড়া গানবাজনাও শেখায়নি, সেটা খেয়াল রাখে না।

যে দিনকাল ! ওরা যেমন পাত্র চায় সে রকম পাত্রের পছন্দসই পাত্রী নয় শোভা !

শোভার সেজো বোন প্রভা কদিন হয় বাপের বাড়ি এসেছে। তার স্বামী রামনাথও এসেছে সঙ্গে।

মল্লিকদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে আজ সাধনা বিশেষভাবে আলাপ করে রামনাথের সঙ্গে, ভালোভাবে লক্ষ করে প্রভার হালচাল। এমন কিছু অসাধারণ সুপাত্র নয় রামনাথ, মানানসই বয়স, মোটামুটি চেহারা ও স্বাস্থ্য, মোটামুটি ভালো কাজ করে। শোভার চেয়ে প্রভাও এমন কিছু বেশি লেখাপড়া গানবাজনা শেখেনি, দেখতেও সে বোনের তুলনায় এমন কিছু রূপসি নয়। রামনাথ নিজেই তাকে দেখে পছন্দ করেছিল—দশ বছর আগে দাবিদাওয়াও তাদের পক্ষে ছিল সাধারণ।

আজ রামনাথের মতো পাত্র অনেক বেশি দুর্মূল্য ! শোভার মতো মেয়েকে আজ যদি আরেকজন রামনাথ বিয়ে করেও, অন্যদিক দিয়ে পুষিয়ে দিতে হবে তাদের বর্ধিত মূল্য !

শুধু বেকার বেড়েছে বলে নয়, যত উপার্জন হলে বুক ঠুকে বিয়ে একটা করে ফেলা যায় সেটা আকাশে চড়ে গিয়েছে বলে, খাদ্যবস্ত্রের মতোই ঘাটতি দেখা দিয়েছে সাধারণ যোগ্য পাত্রের !

তাই এসেছে এই উদাসীনতা। যেমন চায় তেমন বিয়ে দেবার সাধ্যও তাদের নেই।

চোখকান বুজে যেমন তেমন একজনের হাতে সঁপে দেওয়া যায় শোভাকে। আগের দিনে দরকার হলে তাই দিত। এই আশা থাকত যে যতই খারাপ হোক বিয়ে, যত সামান্যই জুটুক যে জন্য বিয়ে দেওয়া জীবনের সেই সার্থকতা – বাপের বাড়ি আইবুড়ো হয়ে জীবন কাটানোর চেয়ে সে অনেক ভালো ! বর বুড়ো হোক, সেদিক থেকে ব্যর্থ হোক মেয়ের জীবন, খেয়ে পরে সংসারে গিন্নি হয়ে দিন কাটাবার সুখটা সে পাবে। অথবা জোয়ান বয়সি অকেজো অপদার্থ হোক বর—তার বাপ দাদা ভালো ঘরের মানুষ, তারা স্বামীর দিকটি ছাড়া অন্যদিকে সুখে রাখবার চেষ্টা করবে মেয়েকে।

আজ আর এ সব ভরসা নেই। ভালো বর ছাড়া কোনোদিকে আশা করার কিছু নেই যে বাপের বাড়ি কুমারী হয়ে পড়ে থাকার দুর্দশার চেয়ে বিয়ে দিলে অন্তত সামান্য একটু ভালো হবে মেয়ের জীবনটা ?

প্রভার সঙ্গে কথা কইতে কইতে শোভার উপর বাড়ির মানুষের নির্ভরতা লক্ষ করে মনে মনে সাধনা সায় দেয়। দশটা ঝি দশটা বাঁধুনি দশটা দাইয়ের মতোই তাকে ছাড়া গতি নেই এ বাড়ির ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষের—এর চেয়ে আর কী চরম ব্যর্থতা কল্পনা করা যায় একটি বিকাশোন্মুখ নারী জীবনের !

কিন্তু এর চেয়েও বীভৎস ভয়ানক ব্যর্থতা সহজেই কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে এ দেশে। গায়ের জোরে ঋষির মন্ত্রের অচ্ছেদ্য বাঁধনে চিরকালের জন্য বেঁধে ওকে যে কোনো একটা পুরুষের দাসী করে দিলে ওই নতুন তাঁতের শাড়িটি হয়তো আর ওর গায়ে উঠবে না, মাছের টুকরো না পেলেও ঝোল আর আলুর টুকরো দিয়ে পেট ভরে যে ভাত খেয়েছিল ও বেলা তার বদলে নুনভাত না পেয়ে উপোস করেই দিন কাটবে !

ও শোভা !—সাধনা ধৈর্য হারিয়ে ডাকে,—বাড়িতে একটা লোক এলে বুঝি ফিরে তাকাতেও নেই ?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজেনের ডাক শোনা যায়, শোভা ? আমার ওষুধটা দিয়ে গেলি না মা ?

এবং অন্যদিক থেকে বড়ো বউ বরদার সকাতর আহ্বান আসে, ও ঠাকুরঝি ? দুধ-বার্লিটা এনে দাও ? একেবারে খেয়ে ফেলল যে আমায় ?

খলে পুতা দিয়ে বাপের ওষুধটা মাড়তে মাড়তে শোভা কাছে এসে দাঁড়ায়। নীরবে মাথা নেড়ে একবার ইঙ্গিত করে যেদিক থেকে বাপের ডাক এসেছে, আরেকবার ইঙ্গিত করে যেদিক থেকে এসেছে বরদার সকাতর আবেদনের হুকুম। ক্লিষ্টক্লান্ত স্বরে বলে, কেমন আছেন ?

বিয়ে হলে চুলোয় যেত, প্রত্যক্ষ -রণের জ্বলন্ত আগুনে। বিয়ের নামে সঁপে না দিয়ে বাপ-দাদা তাকে ভাজাভাজা করছে বাপ-দাদার উপর নির্ভরশীল তেইশ-চব্বিশবছরের কুমারীত্বের তপ্ত তেলে।

শোভা ? ওষুধ খাবার সময় যে পেরিয়ে গেল মা !

ঠাকুরঝি, দুটোতে মিলে যে চেঁচাচ্ছে ভাই !

শোভা চেঁচিয়ে বলে, আসছি।

সেটা দুদিকেরই জবাব হয়।

দাঁড়িয়ে থেকে শোভা বলে, দেখছেন তো, খেটে খেটে সময় পাই না। আপনাদের বাড়ি যাব ভাবি, হয়ে ওঠে না।

দেখছি বইকী বোন ? পাঁচ-দশটা স্বামী আর বিশ-পঁচিশটা ছেলেমেয়ে নিয়ে বিরাট সংসার চালাচ্ছ।

প্রভা মুখে একটা পান পুরে দিয়ে বলে, ওকে আমি একমাসের জন্য নিয়ে যাব। খাটিয়ে খাটিয়ে একেবারে কালি মারিয়ে দিয়েছে চেহারায়। যেমন বুদ্ধি হয়েছে বাবার, তেমনি স্বার্থপর হয়েছে দাদা। বিয়ের যুগ্যি মেয়েটাকে কোথায় একটু ভালো খাইয়ে শুইয়ে বসিয়ে রেখে সুশ্রী করবে, ঝিয়ের মতো চেহারা করিয়েছে।

রামনাথ সিগারেট ধবিয়ে বলে, সুধীরবাবুর ছেলেটার সঙ্গে জুটিয়ে দিতে বলেছিলে তুমি – চুপ করো তুমি '

ঠিক কথা। শোভাব সামনে সত্যই বলা উচিত নয যে কোনো এক বাবুব কোনো এক ছেলের সঙ্গে তাকে জুটিয়ে দেবার কথা তারা ভেবেচিন্তে পবামর্শ করে এসেছে !

মনে তার আশা জাগবে, নানা স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করবে ! তারপর যদি কোনো কাবণে বিয়েটা না হয় ?

ছেলেকে বাড়িতে ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছিল, আশার জিম্মায়। এমন সে প্রাযই রেখে যায় আজকাল। আশা আপত্তি করে না, বিরক্ত হয় না। তার নিজের ছেলেপিলের ঝঞ্ঝাট নেই, বাড়ি থেকে এক বকম বেরোয় না, সাধনার ছেলেটাকে একটু দেখলে দোষ কী ?

বরং ভালোই লাগে ছেলেটিকে নিযে থাকতে। মনটা একটু অন্যদিকে যায।

কী পরিবর্তনটাই ঘটে মানুষের ! কী অদ্ভুতভাবেই উলটে যায মানুষের সঙ্গে মানুষেব সম্পর্ক ! চব্বিশ ঘণ্টা এক বাড়িতে থেকেও যার সঙ্গে কথা কইতে বিরক্তি বোধ হত, যেচে আলাপ করতে ঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়ালে আয়নায যাকে দেখেও মুখ ফিরিয়ে তাকাত না, আজ সে খুশি হয়েই তার ছেলেকে পাহারা দেয় তাকে একটু নির্বিবাদে পাড়া বেড়াবার সুযোগ দিতে '

এমন বিশেষ কোনো উপকার সাধনা তার করেনি যে কৃতজ্ঞ হযে থাকবে, কোনো প্রত্যাশাও রাখে না তাদের কাছে। সাধনাদের দিক থেকে এই প্রত্যাশার ভয়েই কিছুদিন আগে আরও বেশি করে সে ওদের এড়িয়ে চলত !

আজ উলটে গেছে অবস্থা। আশা টের পেয়েছে, তাদেব মতো মানুষের জীবনে দারিদ্র্য আর দরিদ্রকে এড়িয়ে চলা যায় না। একটা জেল তৈরি করে নিজেকে সেখানে কয়েদ করতে হয়।

সাধনার সঙ্গে সে প্রাণ খুলে সোজাসুজি এ সব কথাও বলে। তাদের আগের দিনের সম্পর্কের কথা।

সে বলে, গরিবরাই বরং ফাঁকতালে চায় না, হাত পাতে না। এ দেশে তাহলে ভিখিরিই গিজগিজ করত। তোমার দুর্দশা দেখে সত্যি কষ্ট হত ভাই, বিশ্বাস করবে ? কিন্তু ভাবতাম, নরম দেখলেই আজ এটা চাইবে কাল ওটা চাইবে, হঠাৎ এসে বলবে বড়ো বিপদে পড়েছি, কটা টাকা দাও। তুমি চাইতে না বলে আবার রাগও হত !

সাধনার মুখে হাসি ফোটে।

ও সব টের পেতাম। কখন কী চুরি করি এ ভয়টাও তোমার ছিল।

এক মুহূর্ত ঠোঁট কামড়ে থেকে আশা জোর দিয়ে বলে, মিছে বলব কেন ? সত্যি সে ভয় ছিল। রাজার হস্ত করে সমস্ত গরিবের ধন চুরি—কবিতাটা মুখস্থই করেছিলাম ছেলেবেলা, সত্যিকারের চোর কারা চিনিনি। ভাবতাম যার নেই, সেই বুঝি চুরি করে দায়ে ঠেকে !

এত খোলাখুলি কথা কয, কিন্তু আশাব মনেব নাগাল যেন পায না সাধনা। ভেতবটা যেন তাব আডালেই থেকে যায। বোঝা যায ভেতবে তাব তোলপাড চলছে দুঃখ আব বিষাদেব—কিন্তু তাব বকমটা যেন বহস্যময।

আশা নিজে থেকে কথা কয কম। সাধনা তাকে কথা বলায।

আশা হতাশায ঝিমিযে গেছে, প্রাণপণ চেষ্টায খাডা বাখছে নিজেকে, কিন্তু সেটাই কি সব ? ভবিষ্যৎ তো অন্ধকাব হযে যাযনি তাব। সঞ্জীব চাকবি কবছে, দেনা শোধ কবে দাযমুক্ত হতে যতদিনই লাগুক একদিন তাব আগেব অবস্থা ফিবে আসবে। চিবদিন সে কষ্ট পাবে না।

এমনভাবে কেন তবে মুযডে গেছে আশা ?

কষ্ট সইতে পাবে না, সে জন্য ঝিমিযে যাক, বিমর্ষ হযে থাক, কখনও ভুলেও কি হাসতে নেই, দু-দণ্ডেব জন্য সজীব হতে নেই ভবিষ্যৎ সুখেব দিনেব কথা ভেবে ?

সাধনা বলে, আমাদেব সত্যি মনেব জোব বডো কম।

কে বললে ?

দুঃখ-কষ্ট পেলেই আমবা দমে যাই। সুখেব দিনও যে আবাব আসবে সেটা ভাবি না।

আসবে ভাবলেই কি দুঃখ ঘুচে সুখেব দিন আসে মানুষেব ?

ভাবলেই আসে না তা ঠিক। কিন্তু একদিন তো আসবেই ? দুঃখ তো চিবস্থাযী নয ?

নয ? এ দেশে কত লোকে দুঃখে জন্মে দুঃখেই মবে তুমি জানো ?

সাধনা একটু বিপাকে পডে ভাবে, এব মনটা তো বডোই বাঁকা। কাদেব সুখ দুঃখেব কথা বলছি নিশ্চয বুঝেছে, অথচ না বোঝাব ভান কবে টেনে আনল দেশেব লোকেব কথা।

তবে সেও একটু সাধাবণভাবে ভাসাভাসাভাবে কথাটা তুলেছে বইকী। যেন সাধাবণ সমস্ত মানুষেব সাধাবণ সুখ দুঃখেব কথা বলছে।

সাধনা তাই খানিকক্ষণ একদৃষ্টে দেযালে টাঙানো সঞ্জীবেব বাঁধানো ফটোটাব দিকে চেয়ে থাকে। মানুষেব সঙ্গে বোঝাপডাব কাববাব কবতে কবতে বেশ চালাক হযে উঠেছে সাধনা আজকাল।

আমাদেব সুখ দুঃখেব কথা বলছিলাম। তোমাব আমাব কথা। মিছিমিছি কেন যে আমবা পব হযে থাকি ? প্রাণ খুলে দুটো কথা কইলেও তো প্রাণটা হাল্কা হয ? আমবা একজন কি সিঁদ কেটেছি আবেকজনেব সুখেব ভাণ্ডাবে ?

তখন ভবা দুপুব বৈশাখী নিদাঘ দুঃখী আশাকে বোজ এ সময খানিক্ষণ ঘুম পাডিযে বাখে। তাব সুখেব ভাণ্ডাবে না হোক দুপুবেলাব ঘুমেব ভাণ্ডাবে সাধনা আজ সিঁদ কেটেছে।

নতমুখে মেঝেতে হাত বেখে বসেছিল আশা। তাব চোখ দিযে টপ্‌টপ্ কবে কযেক ফোঁটা জল মেঝেতে ঝবে পডতে দেখে সাধনা ভাবে,—সেবেছে।

তবে মিছেই সে এতদিন সখিত্ব কবেনি বাসন্তীব সঙ্গে। মনে অতি ক্ষীণ একটু দ্বিধাব ভাব জাগে মাত্র, তাতে শেষ পর্যন্ত আটকায না। এগিযে গিযে আঁচল দিযে সে চোখ মুছিযে দেয আশাব। কিন্তু না বলে একটা মিষ্টি কথা, না দেয তাকে লজ্জা পাবাব সুযোগ।

সেই অহংকাবী আশা আজ আচমকা কেঁদে ফেলেছে কিন্তু কিছুই যেন আসে যায না তাতে।

যে আঁচল দিযে তাব চোখ মুছিযেছে সেই আঁচল দিযেই সে তাব ঘাড আব কণ্ঠাব কাছ থেকে মযলা ঘষে তুলে আনে। চোখেব সামনে ধবে বলে, মেযেমানুষেব গাযে এত মাটি পডলে মযলা জামাকাপডেব মতো তাকেও ধোপাবাডি দেযা উচিত।

চোখ সজল হলেও মুখে হাসি ফোটে আশাব।

ধোপাবাডি নয, হাসপাতাল।

ওমা, তাই বলো।

সাধনা নিজের কান মলে।—ছিঃ আমাকে, একশো ছিঃ ! সাধে কী বাসন্তী বলে আমি মেয়েমানুষ নই ? একবাড়িতে থাকি আমার চোখেও পড়ল না ?

আশা চুপ করে থাকে।

যা মনে হত আশার মুখের গোমড়া ভাব, এখন সেটাই সাধনার চোখে ধরা পড়ে তার শ্রান্ত বিষণ্ণ মুখের স্বাভাবিক পাণ্ডুরতা হয়ে।

ভয় পেয়েছ ?

না।

ভাবনা হয়েছে ?

আশার মুখে আবার একটু ক্ষীণ হাসি ফোটে।

সাধনা বলে, তা ভাবনা হয় নানারকম। কিন্তু তুমি নেতিয়ে পড়েছ কেন ভাই ? বাপের বাড়ি ঘুরে এসো না ?

আশা বলে, বাপের বাড়ি আমি যাব না এ অবস্থায়।

সাধনা বুঝতে পারে সে তার কোন অবস্থার কথা বলছে। তার সন্তানসম্ভাবনার অবস্থার কথা নয়। যেতে পারলে ভালোই হত বাপের বাড়ি, কিন্তু বাপের দেওয়া একটি গয়না পর্যন্ত তার গায়ে নেই, ভিখারিনির মতো কী করে সে যাবে বাপের বাড়ি ?

আশার কাছে আত্মীয়স্বজন আসে খুব কম। আজ বলে নয়, চিরদিনই এদিক থেকে আশাকে কেমন বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে সাধনার।

দু-একজন আত্মীয় ছাড়া কলকাতায় আপনজন আশার কেউ নেই। তার বাপের বাড়িও পশ্চিমে শ্বশুরবাড়িও পশ্চিমে।

আপনজনের অভাবটা আজকাল আশা অনুভব করছে।

মাঝে মাঝে এমন বিচ্ছিরি লাগে ! মনে হয় সবাই বুঝি সীতার মতো আমায় বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছে।

স্বামীর সঙ্গে পাঠিয়েছে।

সাধনা হাসে। হাসি কথায় সে আশাকে একটু তাজা রাখতে চেষ্টা করে।

কথা কইতে কইতে কড়া নড়ে বাইরের দরজার। দরজা খুলে সুবেশ সুদর্শন অচেনা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখে সাধনা জিজ্ঞাসা করে, কাকে খুঁজছেন ?

পিছন থেকে আশা বলে, শচীনবাবু ! আসুন, ভেতরে আসুন।

সাধনাকে পরিচয় দেয়, ইনি আমার ভগ্নিপতি—মাসতুতো বোনের।

সাধনা নিজের ঘরে যায়, শচীন যায় আশার ঘরে। বেশিক্ষণ বসে না মানুষটা, মিনিট কুড়ি পরেই বেরিয়ে যায়। সদর দরজা বন্ধ করে আশা এসে বসে সাধনার ঘরে।

তার মুখ দেখে সাধনা ভড়কে যায়।

মানুষটা এসে এইটুকু সময়ের মধ্যে যেন তুলি দিয়ে নতুন কালো বিষাদ আর হতাশা লেপে দিয়ে গিয়েছে আশার মুখে। শূন্যদৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে।

কী হল ভাই ?

এবার আমার গলায় দড়ি দেবার পালা।

গলায় আমাদের দড়ি দেওয়াই আছে। আবার কী হল ?

আশার মুখে এক মর্মান্তিক হাসি ফোটে :—আবার উনি ধার করছেন। আমায় না জানিয়েই করছেন।

উনি বলে গেলেন বুঝি ?

হ্যাঁ। ওঁর কাছেও গিয়েছে টাকার জন্য। দু-তিনবার।

সাধনা একটু ভেবে বলে, এক হতে পারে, সঞ্জীববাবু হয়তো ভেবেছেন আত্মীয়ের কাছে টাকা নিয়ে বাইরের দেনাটা সাফ করে দেবেন। আত্মীয়ের কাছে অতটা কড়াকড়ি হবে না, সুদ লাগবে না, ধীরেসুস্থে শোধ করে দেবেন।

আশা ফাঁকা চোখ তুলে তাকায়।

এ রকম কিছু ভাবলে কি আর আমায় না জানিয়ে ভাবত ? সে বুদ্ধি ঘটে থাকলে কী আর এ দশা হয় !

কে জানে এ কী ঝোঁক মানুষের, কোথা থেকে আসে ? যে পথে প্রতিকার নেই জানে, আরও বিপদ ঘটবে জানে, অন্ধ হয়ে সেই পথেই চলে ?

মাস দুই আগে সঞ্জীব এই শচীনের কাছে টাকা ধার করেছিল, আশাকে জানায়নি। গতমাসেও আরেক অজুহাতে কিছু টাকা ধার করেছিল। গতকাল আবার টাকা চাইতে গিয়েছিল, নানাকথা মনে হওয়ায় শচীন আজ তার কাছে এসেছিল ব্যাপারটা বুঝতে।

আশাকে সে শক্ত হতে উপদেশ দিয়েছে। এ নাকি বড়ো পিছল পথ, গড়িয়ে চলতে শুরু করলে থামা যায় না।

উপদেশ দিয়ে সঞ্জীবের বদলে আশার হাতে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল।

আশা টাকা নেয়নি। বলেছে, যার দরকার তাকে দেবেন। আমার টাকার কোনো দরকার নেই।

পৃথিবীটা যেন কেমন লাগছে ভাই, চিনতে পারছি না। অসম্ভব ব্যাপাব সব সম্ভব হচ্ছে। মাথাটা ঘুবছে বলে ? আমি একরকম ভাবি, আসলে দেখি সব উলটো বকম হয় !

এতটা হাল ছেড়ে দিয়ো না।

হাল আছে না কী যে ধরব ? আমায় সুখে রাখতে না জানিয়ে দেনা করেছিল, আমাব সুখ ! গযনা দিয়ে জীবন দিয়ে দেনা শুধছি, অসহ্য হলে ভাবছি, আহা, আমার সুখের জন্য মানুষটা পাগল, আমি কষ্ট না করলে কে করবে ?

একটা অদ্ভুত হাসি ফোটে আশার মুখে, আমার কষ্ট দেখেই আবার ধার করছে নিশ্চয়। আমার সুখের জন্য ! জানে তো সামলে ওঠার আগে আমি মরে গেলেও সুখ নেব না, একটু মাছ পর্যন্ত আমি আনতে দিই না, টাকাটা অগত্যা নিজের সুখের জন্য খরচ করছে।

সাধনারও নিজেকে বড়ো নিস্তেজ অসহায় মনে হচ্ছিল। ম্লান মুখে সে জিজ্ঞাসা করে, চাকরিটা ঠিক আছে তো ? না, এই ভাবে—?

চাকরি ঠিক আছে। ও সব কিছু নয়। আসল ব্যাপার আমি বুঝে গিয়েছি। আমার জন্যে না ছাই, নিজেরই আরাম বিলাস ছাড়া চলে না, কষ্ট সয় না। আগে অজুহাত ছিলাম আমি, এখন আর অজুহাত লাগছে না।

নিজের কপালটা টিপে ধরে আশা।—সে দিন দুটো পাঞ্জাবি করালে। টাকা পেল কোথায় ? না, এক বন্ধুর কাছে পাওনা ছিল, শোধ দিয়েছে। একটু ছিঁড়েছিল জামা—রিপু করে সেলাই করে দুমাস অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু না, তা হয় না, সেলাই করা জামা গায়ে আপিস করা যায় না ! একটা করালেই হত একবারে ? না, দুটো করালেই সুবিধে—খরচ কম লাগে, বেশিদিন টেঁকে, অমুক হয়, তমুক হয়।

খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে থাকে আশা। বলে, তোমায় বলব কী ভাই, ও সব কথা মুখ ফুটে বলতে গেলেও নিজেকে হীন মনে হয়। তুমি তো দেখে আসছ, কী রাঁধি কী খাই ? তুমি তো দেখছ,

চেহারা কী হয়ে এসেছে ? ভেতরে ভেতরে টের পাই শরীবে কত জোর কমেছে। মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে ওঠে। তোমাদের সঞ্জীববাবুর জন্য এমন ভয় হত গোড়ার দিকে, এই খেয়ে আপিসের খাটুনি খেটে মানুষটা কি বাঁচবে ? মাঝে মাঝে জামায় মাংসের ঝোলের দাগ দেখতে পাই। পকেট থেকে সিনেমার টিকিট বেরোয়। দেখে কী স্বস্তিই যে পেতাম। ভাবতাম, ভাগ্যে অনেক বন্ধু আছে, মাঝে মাঝে হোটেলে খাওয়ায়, সিনেমা দেখায়। আমি যার দেনা শুধতে ঘরে শুকিয়ে আমসি হচ্ছি, সে ধার করে সিনেমা দেখবে হোটেলে মাংস খাবে—কেউ তা ভাবতে পারে ? পারে কেউ ?

দুজনেই চুপ করে থাকে।

আকাশ-পাতাল ভাবে সাধনা। আশা একটুও কাঁদে না কেন ? সব শেষ হয়ে গেছে, কেঁদেও আর লাভ নেই, এ ভাব তো ভালো নয় !

তার ছেলের গালে টোকা দিয়ে আশা আদরের সুরে বলে, দেখি ? রাগ হয়েছে, দেখি ? মা মেরেছে, রাগ হয়েছে, দেখি ?

শিশু মুখের একটা শেখানো ভঙ্গি করলে সে হাসে।

যেন কিছুই হয়নি !

সাধনা ভেবেচিন্তে বলে, একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো। ভুল যদি বুঝে থাক, তুমি নিজেই ভুল বুঝেছ। কেউ যদি ঠকিয়ে থাকে, তুমি নিজের বোকামিতেই ঠকেছ ! আমি তাই বলি কী, গায়ের জ্বালায় ঝগড়া না করে, সোজাসুজি পষ্টাপষ্টি কথা কয়ে বোঝাপড়া করে নাও।

কথা কওয়ার আর কী আছে ?

আছে বইকী ? শুধু মানুষটাকে দেখো না, অবস্থাটাও খেয়াল করো।

আশা মুখ বাঁকায়। অর্থাৎ তার চেয়ে আজ কার অবস্থা খারাপ ?

ওর মনের জোর নেই এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। উপায় কী বলো ? তুমি তো আব গড়েপিটে মানুষ করোনি তাকে। মানুষটা কষ্ট সইতে পারেন না, সইতে শেখেননি। কী এমন হাতিঘোড়া চান ? ধার যে করেন, ফুর্তি করতেও নয়, বদখেয়ালে উড়িয়ে দিতেও নয়। দুটো জামা পরবেন, একটু সিনেমা দেখবেন, ভালোমন্দ এটা-ওটা খেয়ে খিদে মেটাবেন। আসলে এ তো সামান্য চাহিদা। বরাবর পেয়ে এসেছেন, এখন পান না, সে দোষ তো সঞ্জীববাবুর নয়। নিরুপায় হলে কষ্ট করতেই হয় মানুষের, সেটাই উনি পারছেন না। তোমার মনে জোর আছে তুমি পারছ, ওঁর সে জোরটুকু নেই। নইলে যতটা খারাপ ভাবছ, অতটা খারাপ নয়।

তুমি যে উকিলের মতো ওকালতি করলে !

সঞ্জীববাবুর উকিল নই, আমি তোমার স্বার্থই দেখছি। মানুষটা ভালো কিন্তু ভদ্রলোকের মনের জোর নেই—এটা তোমাকে মানতেই হবে। মেনে সেইরকম ব্যবস্থা করতে হবে, সব দিক যাতে বজায় থাকে।

আশা তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, এর পরেও বজায় থাকবে ? কী করে বজায় থাকে। সর্বনাশ হতে বসেছিল, চাকরিটা পর্যন্ত যেত। আমি অতি কষ্টে ঠেকিয়েছি। আবার কে ঠেকাবে ? মনের জোর তো আর আকাশ থেকে আসবে না।

সাধনা বলে, আমিও তাই বলছি। এটুকু তোমায় বুঝতেই হবে ভাই। তুমি নিজে কষ্ট করে ব্যবস্থা করে সামলাতে পারবে না। একবার চেষ্টা করেছ বেশ করেছ, পরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেল। তুমি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মনের জোর এনে দিতে পারবে না। নিজে বিপদে পড়ে পোড় খেয়ে নিজের মনটাকে নিজেকেই ঠিক করতে দিতে হবে ওঁকে। যার দায়িত্ব তাকেই সব ছেড়ে দাও। যা কিছু আসল ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তুমি যতটা পারো সামলে-সুমলে চলবে, সাহায্য করবে।

ফল কী হবে সে তো জানা কথা ! নিজেও ডুববে, আমাকেও ডোবাবে।

সে তো এমনিও ডোবাবেন, ওমনিও ডোবাবেন, তুমি কিছু করতে পারছ কী ? ডুবতে বসলে বরং বাঁচার চেষ্টা আসবে, মনটা শক্ত হবে।

আশা সংশয়ভরে বলে, এততেও যার শিক্ষা হল না, সে কি শিখবে কোনোদিন ?

সাধনা ভরসা দিয়ে বলে, শিক্ষা হতে দিলে কই তুমি ? বিপদে পড়তে না পড়তে সামলে দিলে। কষ্ট যা করার তুমি করছ, তার গায়ে কি আঁচ লাগছে ? মনে যত কষ্ট হোক, অনুতাপ আপশোশ হোক, ওটা শিক্ষার ব্যাপার নয়। হাতে-নাতে শিখতে দিতে হবে। চাকরি যায় যাবে, চাদ্দিকে দেনা করে করবে। তোমার কপালেও দুঃখ আছে অনেক। কিন্তু কী এমন সুখে আছ ? ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে কদিন চালাবে ? তার চেয়ে মানুষটার চেতনা হোক, দুজনে মিলে আবার উঠবে।

আশা তো বোকা নয়। সাধনা এত কথায় যা বোঝাতে চেয়েছে, সে দুকথায় তাব আসল মানেটা তুলে ধরে।

বলে, সোজা কথায়, আমাকে কর্তালি ছাড়তে বলছ। সরলা অবলা বউ হব, স্বামীর ওপর নির্ভর ? সে আনবার মালিক এনে দেবে, আমি রেঁধে দেব। কোথা থেকে কী করে আনছে সে ভাবনা তার।

সাধনা একটু হাসে।

হাবা সাজতে কি পারব ?

পারবে। পারতে হবে। আজ মিলেমিশে বোঝা বইতে চায় না, জোর করে বোঝার ভাগ নেওয়া কি খুব সম্মানের ? দেখলেই তো, ওতে লাভ হয় না, বোঝা নিয়ে টানাটানি মারামারিই ঘটে। ঘরে চুপচাপ ভালোমানুষটি সেজে থাকেন, বাইরে গিয়ে নিজের মূর্তি ধরেন। তার চেয়ে যেমন চান তাই হোক। দুদিন যাক, টের পাবেন, নিজেই ডাকবেন পাশে এসে দাঁড়াও, হাত মেলাও।

আশা বুদ্ধিমতীর মতো বলে, কথায় তো হল। দেখি কাজে কী হয় !

বাসন্তী সব শুনে বলে, তুইও যেমন ভাই, জলের মতো সব বুঝিয়ে মীমাংসা করে দিলি। একটা নীতি খাড়া বেখে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা ঘর-সংসার করতে পারে ?

তুই তো করছিস। ছিটেফোঁটা সুখ চাই না, হলে আগের মতো, নইলে নয়। ঝি পর্যন্ত রাখিস না।

বাসন্তী গালে হাত দেয়।—এটা নীতি নাকি ? আশাদি যে কষ্ট করে আসছে, ওর নাম নীতি করা বুঝি ? দরকার হয়েছে, উপায় নেই, তাই আমিও এ সব করছি. আশাদিও করছে। কিন্তু তুই আশাদিকে যে পরামর্শ দিয়েছিস ভাই সে একেবারে খাসা নীতি ! তুমি ও রকম ছিলে আজ থেকে এ রকম হবে, নরম হয়ে থাকবে, রাগ হলে ঝগড়া কববে না, নালিশ করবে না. কিচ্ছু করবে না ! তাই নাকি মানুষ পারে ?

জোরে জোরে মাথা নাড়ে বাসন্তী, উহুঁ, পারে না। তাছাড়া কার যে দোষ তুই ধরতেই পারিসনি। ওর জন্যেই তো মানুষটা ফের বিগড়েছে।

তাই নাকি ?

তাই। একশোবার তাই। কর্তালি করেছে তো কী হয়েছে ? তুমি বউ, বউ হয়ে কর্তালি করো না যত পারো, মাস্টারনি হয়ে কর্তালি করতে যাও কোন বুদ্ধিতে ? বউ হবার সাধ্যি নেই, শাসন করার গুরুঠাকুর ! না খেয়ে না পরে আমি কী কষ্টটাই করি ! আমি মনে মনে কী বলি জানো ? বলি, আহা, মরি মরি ! হাসি নেই, কথা নেই, মুখটা যেন ভাতের হাঁড়ি, বাড়িতে যেন দশটা রুগি মরো-মরো।

চব্বিশ ঘণ্টা এমনি ভাব—অমন কষ্ট নাই বা কবতে তুমি ! তাব চেযে হেসে দুটো কথা কইলে মানুষটাব বেশি উপকার হত।

বাসন্তী কথা বলছিল উনান সাজাতে সাজাতে। আবদার জানিয়ে বলে, মুখে একটা পান গুঁজে দে না ভাই ?

পান মুখে এলে চিবিয়ে গালে রেখে বলে, এটুকু যদি বোঝাতে পাবতে, কাজ হত। মানুয তো লোহায় তৈরি নয় ? ঘরে একটু আদর পেলে স্বস্তি পেলে ও মানুষটা কখনও ধার করে বন্ধু নিয়ে সিনেমা দেখত, হোটেলে খানা খেত ? তারা অন্য জাতের লোক। ঘবে তারা গোবেচারি সেজে থাকে না বউয়ের ভয়ে, বউকে লাথি মেরে গয়না নিয়ে ফুর্তি কবতে যায।

কথাটা লাগসই মনে হয়। কিন্তু খটকা যায না। এতই কি সহজ এ ব্যাপাবের শেষ কথা ?

একজন বাইরে লড়বে, ক্ষতবিক্ষত হবে, ঘরে ফিরলে আরেকজন তাকে একটু আরাম দেবে বিরাম দেবে ক্ষতে মলম লাগিয়ে দেবে মমতার—বাস, আর কিছুই চাই না ?

এতখানি সহজ আর ব্যক্তিগত এ লড়াই ?

ঘর হল পুরুষ সৈনিকের দেহমনেব হাসপাতাল আর মেয়েরা হল তাদেব নার্স ?

তাই তো ছিল এতকাল ! লডাই তবে একেবারে ঘরেব মধ্যে এসে পডছে কেন ? ভাঙন ধবছে কেন এই অপরূপ ব্যবস্থায ?

এক-একটি নীড় তো এক-একটি দুর্গ বিশেষ ছিল রোজগেরে স্বামীর। তার মনেব মতো হাসি আনন্দ আদর মমতা তাব জন্য তৈরি হয়েছে সেখানে ! মেয়েরা বিগড়ে গিয়ে বিদ্রোহিণী হযে তো ভেঙে ফেলেনি সে দুর্গ, ওলট-পালট করে দেযনি পুরুষের লড়াই কবে ঘরে ফিরে শান্তি আর স্বস্তি পাবার ব্যবস্থা ?

হাসিমুখে দুটো কথা কইবে আশা ? পেটেব সঙ্গে প্রাণটা যখন জ্বলছে তখন নিজেব বগলে সুড়সুড়ি দিযেও হাসি আনতে পারে মানুষ ?

হাঁড়িতে ভাতের অভাবের জন্য মুখটা যখন ভাতেব হাঁড়ি—

ঘরে ফিরে সাধনা উনান ধরায়। হাঁড়ি চাপাতে হবে।

৬

রাখাল বলে, তোমাব সঙ্গে কথা ছিল।

সাধনা ভাবে, সর্বনাশ ! কী দুঃসংবাদ কে জানে !

হাত ধুয়ে কাপড়ে মুছতে মুছতে সাধনা এসে বসে। রাখাল তার ধোযা হাতে তুলে দেয় নযা প্যাটার্নের নতুন সোনার দুল।

এই কথা !

না, এটা আসল কথা নয়।

আসল কথাটা ব্যাবসা নিয়ে। এতদিন রাজীবের আগেকার দায় ছিল, সম্প্রতি সেটা শেষ হয়েছে। আর তাকে দফায় দফায় কিস্তির টাকা দিতে হবে না। টাকাটা সে কারবারে লাগাবে। রাখালকেও সে অনুরোধ করেছে, লাভের অংশ কম টেনে কারবারে লাগাতে।

সাধনা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে।

অত খুঁটিনাটি বুঝিনে আমি। আমায় কী করতে হবে বলো।

আগে হয়তো রাখাল আহত হত। প্রিয়া কবিতা বোঝে না জানালে নতুন কবি যেমন আহত হয়। শুরুতে প্রায় কাব্যসৃষ্টির উন্মাদনা নিয়েই সে নোংরা অশ্রদ্ধেয় বিড়ির পাতা শুখা তামাকের ব্যাবসা শুরু করেছিল, ধরাবাঁধা জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেটাই ছিল নতুন সৃষ্টির ঝোঁক।

আজকাল ও সব অভিমান তার ভোঁতা হয়ে গেছে।

সে বলে, আসল কথা, কিছুদিন কষ্ট করতে হবে।

করব !

তার এই নির্বিকার উদাসীন জবাবটা আঘাত করে রাখালকে।

শেষকালে কেঁদেকেটে ঝগড়া করে অনর্থ কোরো না। বেশিদিন নয়, কয়েক মাস একটু টানাটানি যাবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

বেশ তো।

তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে রাখাল হাতের মোটা চুরুটটা মুখে গুঁজে ধরায়। শুধু বিড়িপাতা শুখা আর সাধারণ চলতি সিগারেট নিয়ে তাদের কারবার—সম্প্রতি সে নিজে উদ্যোগী হয়ে কয়েকরকম চুরুট তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। কবে এককালে ছবি আঁকা পদ্য লেখার ঝোঁক চেপেছিল কিছুদিন, সেই বিদ্যা নিয়ে নিজে একটা চৌকো পিচবোর্ডে জ্বলন্ত চুরুট ধরা একটা হাত এঁকে তার নীচে লিখেছে, 'চুরুট খান : একটা চুরুট দশটা সিগারেট, পঞ্চাশটা বিড়ির শামিল ! দাম কত সস্তা পড়ে ! তিনবার চারবার নিভিয়ে খান একটা চুরুট !'

রাজীব সংশয়ভরে বলেছিল, ঠিক কথা লেখা হল কি ? এ রকম হলে সবাই তো চুরুট খেত !

রাখাল বলেছিল. এটা বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে বেঠিক কথা লিখতে হয়। ওটাই হল বিজ্ঞাপনের আর্ট।

বটে নাকি।

তবে ? একটা বিজ্ঞাপন দেখান তো আমায় যা স্রেফ ভন্ডামি আর মিথ্যা নয় ? কেমন করে বোকা লোককে ভাঁওতা দিয়ে ঠকানো যায়, এটাই হল বিজ্ঞাপনের আর্ট। নইলে কী করে বিজ্ঞাপন দিতে হয় তার এক্সপার্ট নিয়ে বিজ্ঞাপন দেবার বড়ো বড়ো কোম্পানি গড়ে ওঠে ? পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন থেকে মডার্ন বিজ্ঞাপন সব ওই এক ধাপ্পাবাজি।

রাজীব আমতা আমতা করে বলে, আপনিও শেষে ওই ধাপ্পাবাজি করে বসলেন ?

মোটেই না। আমি শুধু জানিয়ে দিলাম আমাদের এখানে চুরুটও পাওয়া যায়।

সাধনা কী ভাবছে বুঝতে না পেরে রাখালের মুশকিল হয়। রাগত মনোভাবটা দমন করে চুরুটে টান দিয়ে রাখাল বলে, রাজীবটা হল গিয়ে একেবারে সেকেলে ব্যাবসায়ী। আমি যেমন চাকরি করতাম, ও ঠিক তেমনি ব্যাবসা করে। বাপ-ঠাকুর্দার বাঁধা নিয়মে। জগৎ পালটায় তো ওদের নিয়ম পালটায় না। সকাল সন্ধ্যায় ধূপধুনো দেবার কী ঘটা ! কালীর ছবিকে প্রণাম করবে, গণেশকে প্রণাম করবে, তারপর মাথা ঠেকাবে কাঠের ক্যাশ বাক্সোটায়।

ক্যাশটাই তো আসল।

রাখাল হাসে, ক্যাশ ছাড়া বোঝেই না। ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত খোলেনি। লোহার সিন্দুক আছে, আবার ব্যাংক কেন ? আমিই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলিয়েছি।

নতুন দুল কানে লাগিয়ে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে সাধনা বলে, এটা না আনলেও চলত। এ সব ঝোঁক আমার কেটে গেছে। দ্যাখো না খালি গলায় ঘুরে বেড়াই ?

এ বৈরাগ্য চলবে না। আমি এদিকে কতরকম ভাবছি, বিকালের পড়ানোটা ছেড়ে দিয়ে আরও কোমর বেঁধে নেমে পড়ব, টাকা করব,—গয়না পরতে তোমার অরুচি জন্মাবে কী রকম ?

অনেক টাকা করবে ভাবছ না ? লাখ টাকা ?

লাখের বেশি নেই ?

সাধনা সোজা তার দিকে তাকিয়ে বলে, কী আশ্চর্য দ্যাখো, আমি জানতাম তোমার এ ঝোঁক আসবে ! খুব যখন টানাটানি চলছিল, তখন মনে হয়েছিল কথাটা। টাকার জন্য ভীষণ কষ্ট পেলে, এরপর তোমার রোখ চাপবে টাকা করার। তাই সত্যি হল।

আমি কিন্তু মোটে দু-চারমাস এ সব ভাবছি। রাজীবের সঙ্গে কারবারে না নামলে হয়তো কোনোরকমে দিন চালাবার চিন্তাই করতাম।

এ ঝোঁক তোমার আসতই। একটু সামলে নেবার অপেক্ষায় ছিলে।

তুমি চাও না টাকা ?

চাই ! গয়না পবব না পরব জানি না, চারবেলা ভোজ খাব আর দুঘণ্টা অন্তর নতুন নতুন কাপড় পরব !

টাকার চিন্তার চেয়ে টাকা করার চিন্তায় রাখাল আজ কম মশগুল নয়। টিউশনি, ফালতু রোজগার আর চাকরির ধান্ধায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে সময়ও তার এখন কম যায় না টাকা করায় চেষ্টায়।

একটা ব্যাপার বড়োই অদ্ভুত ঠেকে তার কাছে। আজ আরও বেশি টাকা করার নেশায় মেতে থাকার সঙ্গে আগের দিনের সেই দিবারাত্রি টাকার ভাবনা আর ছেলে পড়িয়ে চাকরি খুঁজে বেড়াবার ধান্ধায় মেতে থাকার মধ্যে সে যেন একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পায় ! টাকাব অভাবে কষ্ট পাওযাটুকু বাদ দিলেই যেন মিলে যায় নেশাটা। সেদিন টাকার চিন্তায় ডুবে থাকত নিরুপায় হযে, আজ স্বেচ্ছায় টাকার চিন্তায় ডুবে আছে !

টাকার চিন্তা ছাড়া একদণ্ড শান্তি নেই !

তবু, চারদিকের মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ বেড়ে গেছে। নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে তো পরিচয় ঘটছেই ব্যাবসা সূত্রে, জানাচেনা যাদের সঙ্গে সম্পর্ক একরকম উঠে গিয়েছিল তাদের সঙ্গেও আজকাল মাঝে মাঝে দেখা হয়, পাড়ার লোকের সঙ্গে চলে মেলামেশা আর মনে প্রাণে উদাসীন হয়ে থাকার বদলে স্বেচ্ছায় তাদের ভালোমন্দের খবর রাখা।

সাধনা যেমন জমিয়ে তুলেছে পাড়ায় মেয়েদের সঙ্গে সেরকম মেলামেশা নয়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে বসে বসে গল্প জমিয়ে মানুষের সঙ্গে ভাব করার সময় তার নেই।

কাজে যেতে আসতেই অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। কেউ বসে থাকে দাওয়ায়, কেউ সামনে পড়ে পথে, কারও সঙ্গে দেখা হয় মুদি দোকানে রেশন-খানায বাজারে, কারও সঙ্গে বাসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুদণ্ড কথা হয়, তাতেই আদান-প্রদান হয় আসল খবরগুলির, তাতেই বজায় থাকে এবং গড়ে ওঠে হৃদ্যতা।

কারও বাড়িতে অসুখ-বিসুখ, কাজে বেরিয়ে যাবার সময় একটু ঘুরে খবর জেনে যাওয়া যায় কয়েক মিনিট বাড়তি সময় দিয়ে।

দোকান যেদিন বন্ধ থাকে সেদিনও নিজের কাজে ঘরের কাজে তাকে ছুটোছুটি করতে হয়, তবু দেখা যায় পাড়ায় বা আত্মীয়বন্ধুর বাড়ি ক্রিয়াকর্মে গিয়ে সামাজিকতা বজায় রাখা থেকে পাড়ার বৈঠক বা আড্ডায় গিয়ে বসার জন্য সময়ের অভাব হয় না মোটেই।

এই মেলামেশার ফলে স্থানীয় নানারকম লৌকিক ব্যাপারে তাকে আজকাল ডাকা হয়। সে সবে অংশ নিতেও তার অসুবিধা হয় না।

এমনি পার্থক্য টাকার চিন্তায় হন্যে হয়ে বেড়ানো আর টাকা করার সাধকে সাধনায় দাঁড় করানোর মধ্যে !

সময় তখনও থাকত। কিন্তু আত্মীয়তা বন্ধুত্ব সামাজিকতার জন্য সময় দেবে কে ? সে ইচ্ছা আসবে কোথা থেকে ? মেলামেশার বদলে ঘরের কোণে একলা বসে চিন্তাজ্বরে মুহ্যমান হয়ে

থাকতেই তখন ভালো লাগত। দেখা হলে পাড়ার মানুষের কুশল জিজ্ঞাসার জবাব দিতে দাঁড়াবার তাগিদ জাগত না, হাঁটতে হাঁটতেই ছুঁড়ে দিত দুটো চলতি শব্দ—চলে যাচ্ছে !

কাজের মানুষ দশজনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার সময় পায় না—এ মিথ্যা অজুহাত ফাঁস হয়ে গেছে রাখালের কাছে।

সেও আজ কাজের মানুষ, ব্যস্ত মানুষ।

দশজনের জীবনকে সাধ্যমতো এই সম্মানটুকু দেওয়ায় যেন বিবেকের জ্বালাও তার খানিকটা শান্ত হয়েছে—যে দশজনে বিশুর মার গয়নার ব্যাপার জানলে তাকে চোর বলত।

সাধনার যে শান্ত নিষ্ক্রিয় উদাসীনতার ভাব আরেকটা দুঃস্বপ্নের মতো ঘনিয়ে এসেছিল তার জীবনে, দশজনের সম্পর্কে দুজনেরই মাথা ঘামাবার মাধ্যমে যেন তারও ঘোরটা কেটে গেছে আশ্চর্যজনকভাবে।

সাধনা বলে, শোভার বিয়ে ঠিক হল শেষ পর্যন্ত।

রাখাল বলে, শুনলাম ওর দাদার কাছে। আপশোশ করছিল, বোনের জন্য শেষে বুড়ো বর আনতে হল, লেখাপড়াও ভালো জানে না। কিন্তু উপায় কী, শোভার বয়সও তো বেড়ে যাচ্ছে।

সাধনা খুশি হয়ে বলে, তুমি শুনেছ সব ?

শুনেছি বইকী। তোমার কাছে শুনেছি, ওদের কাছেও শুনেছি।

বাসন্তীর সঙ্গে কত কথা হয়েছিল শোভার বিয়ের সমস্যা নিয়ে, কত পরিষ্কার মনে হয়েছিল সমস্যাটা। বরটি কেমন সমস্যা তা নয়, সমস্যা মোটামুটি খাওয়াপরা জোটার। আজ আবার বিষম খটকা লেগেছে সাধনার মনে। প্রায় ষাট বছরের বুড়ো ? শোভা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে ! মন খারাপ হবার লক্ষণও দেখা যায়নি !

অবুঝ কচি মেয়ে নয়। বুড়ো বরের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেবার তথাকথিত ব্যাপারও নয়। শোভা শুধু মুখ ফুটে না বললেই এ বিয়ে ভেঙে যায়।

কিন্তু না যে বলেনি ! জিজ্ঞাসা করা হলে বরং নীরবে সায় দিয়েছে।

মনের ঝাঁঝটা কথায় বেরিয়ে আসে সাধনার, বলে, মেয়ে নাকি এই বরের নামেই খুশি ! এ কী ব্যাপার, অ্যাঁ ? কোনো মেয়ে এমন বিয়ে চাইতে পারে ?

রাখাল তার জানা যুক্তিটাই দেখায় শোভার পক্ষে বলে বাপের বাড়ি চাকরানির মতো জীবন কাটাতে হয়। স্বামী বুড়ো হোক আর যাই হোক, নিজের সংসারে খেয়ে পরে থাকবে।

সেটাই কি সব ?

সব নয়, মন্দের ভালো।

সাধনা ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, আমার কিন্তু খারাপ লাগছে। খাওয়াপরার জন্য এ রকম একজনের পাশে শোয়ার চেয়ে স্বাধীনভাবে ঝি-গিরি করা ভালো নয় ?

ঝি-গিরি ? তুমি পাগল হলে নাকি ? আসলে তুমি নিজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছ ও মেয়েটাকে। ঘরের জন্য ও রকম বরের কথা ভাবতেও তোমার ঘেন্না হয়। কিন্তু শোভার কি সে তেজ আর চেতনা আছে ? ওর কাছে ঘর আগে।

আজও এমন মেয়ে রয়ে গেল কী করে ?

রেখে দেওয়া হয়েছে বলে !

এত কাণ্ড চারিদিকে, ওর মনে কি ধাক্কা লাগে না ?

লাগে। ঢেউ ওঠে, মিলিয়ে যায়। তবে এ তো নিষ্ফল হবার নয়, একদিন প্রতিক্রিয়া হবেই। অন্য মেয়ে হলে বিয়ের আগেই কেলেঙ্কারি করত, কারও সঙ্গে হয়তো বেরিয়েও যেত। ওর প্রতিক্রিয়া আসবে বিয়ের পর। যখন টের পাবে কীভাবে কী জন্য ঠকেছে।

কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও ! সুমতিদের মতো মেয়েরা আন্দোলন করে, সংগঠন গড়ে, সভায় বক্তৃতা দেয় –ঘরের কোণে নিরীহ গোবেচারি শোভারা মুখ বুজে উদয়াস্ত খেটে যায়, বিনা প্রতিবাদে নিঃশব্দে মেনে নেয় ভাগ্যে যেমন জোটে ঘর আর বর !

প্রাণটা জ্বলে যায় সাধনার।

আরও জ্বলে যায় নীলাম্বরী শাড়ি পরে শোভাকে আজ একা বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে।

দিদি আপনাকে যেতে বলেছে।

তা নয় বলেছে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো ?

আমি একটু নমিতাদের বাড়ি যাব।

সাধনা হেসে বলে, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তাই বুঝি বেরিয়েছ ঘর ছেড়ে ? খুব ফুর্তি হয়েছে, না ?

শোভার নত চোখ আর মৃদু হাসি দেখে গালে তার একটা চড় মারতে সাধ হয় সাধনার !

মুখভার করার প্রতিবাদটুকুও জানাতে পারে না ? ওর মনে ঢেউ ওঠে না ছাই হয় !

ওর ভাগ্য-মানা মনের ডোবায় ঢেউ তোলার সাধ্য নেই কালবৈশাখী ঝড়েরও !

নিজের বেলা যে রকম বিয়ের কথা ভাবতেও তার ঘেন্না হয়, সেই বিয়ে ঠিক হয়েছে বলে সেজেগুজে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে—জগৎকে যেন জানিয়ে দিতে চায় যে এতদিনে গতি হল তার !

দুর্গার কথা সে ভাবে। ঘর-হারানো গরিব পরিবারের মেয়ে পঁচিশ টাকার বিয়েতে শুধু বর পেয়েছে, ঘর-হারানো বর। ঘরের চেয়ে বড়ো হয়ে থেকেছে মানুষ। ঘর ভেঙে পড়ার অভিশাপ কি তবে আজ দরকার শোভার মতো মেয়েদের নিজেকে মানুষ বলে জানতে পারার জন্য ?

এতই বিতৃষ্ণা জন্মে মেয়েটার উপর, মানুষ হিসাবে এতই সে তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে যে তার কথা ভাববার প্রয়োজনও যেন তার ফুরিয়ে যায়।

নিজের এবং অন্যান্য জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ সংঘাত যে আলোড়ন তোলে তার মনে শোভা তার মধ্যে গুলিয়ে গিয়ে বাতিল হয়ে যায়।

আশা কী বোঝাপড়া করেছে সঞ্জীবের সঙ্গে কিছুই সে খুলে বলেনি সাধনাকে। গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করার সংকোচটাও সাধনা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

তবে মনে হয়, তার পরামর্শই গ্রহণ করেছে আশা। নরম হয়ে বিনীতা স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করছে।

পরিবর্তন বিশেষ কিছুই ঘটেনি সংসারযাত্রায়, সব দিক দিয়ে যে কঠোর আত্ম-নির্যাতনের ব্যবস্থা চালু করেছিল আশা সেটা মোটামুটি এখনও বজায় আছে, সঞ্জীব শুধু ভয়ে ভয়ে যেন আশার নতুন মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য বাজার থেকে আনছে একটু মাছ, কালোবাজার থেকে আনছে দু-একসের চাল।

একখানা নতুন শাড়িও সে কিনে দিয়েছে আশাকে।

আশা চুপচাপ মাছটুকু রাঁধছে, হাঁড়িতে চাল চড়াচ্ছে পেট ভরে খাওয়ার মতো, নতুন শাড়িটা গায়ে জড়াচ্ছে।

জিজ্ঞাসাও করছে না তুমি টাকা পেলে কোথায়, মুখ ফুটে প্রতিবাদও জানাচ্ছে না।

মুখখানা তার হয়ে আছে ম্লান এবং গম্ভীর। কথা সে বলছে আরও কম। সঞ্জীব যা বলে যা করে তাই সই, তার কিছু বলারও নেই করারও নেই।

নীরবে নিজের মনে নিজের কড়া দুঃখ ক্ষোভ আর বিদ্রোহের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে সংযত রাখছে।

সঞ্জীব আপিস চলে গেলে তার এঁটো থালা গেলাস কুড়িয়ে নিয়ে কলতলায় যেতে যেতে হঠাৎ ঝনঝন করে সেগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিছুক্ষণ ছটফট করে বেড়ায় ঘরে আর বাইরে। হঠাৎ বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে।

তারপর উঠে স্নান না করেই ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসে দু-একগ্রাস খায়—উঠে দাঁড়িয়ে ঘটির জল ঢকঢক করে মুখে ঢেলে লাথি মেরে ভাতের থালা মাছের বাটি ছিটকে সরিয়ে দিয়ে, ঘটিটা আছড়ে ফেলে ঘরে।

সাধনা আসছে টের পেয়েই ভেতর থেকে দড়াম করে বন্ধ করে দেয় দরজাটা।

আধঘণ্টা পরে অবশ্য নিজেই সে সাধনার ঘরে যায়।

শুধু একটু হাসে। সত্যই হাসে।

সাধনা সাহস পেয়ে বলে, পরামর্শ দিয়ে আমি বুঝি তোমার অনিষ্টই করলাম ভাই।

আশা তেমনিভাবে হাসে। বলে, শুনে রাগ কোরো না, তোমার পরামর্শ আমি এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বার করে দিয়েছি।

তবে—?

সে তুমি বুঝবে না।

সতীশের শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছিল। কোনো অসুখ নয়, শুধু ভাঙন। বিশুর মার ধোয়া মোছা গোবর লেপা ব্রত পার্বণ পূজা আর প্রসাদ ও দক্ষিণা বিতরণ বজায় থাকলেও সব যেন কেমন যান্ত্রিক হয়ে আসছিল ক্রমে ক্রমে।

আরেক দিন আরেক উপলক্ষে রাখাল পায়েস পিঠে পায়। কিন্তু সে যেন নেহাত তাকে না দিলে নয় বলে, আগে মহাসমারোহে দেওয়া হয়েছে বলে, কোনোরকমে নিয়মরক্ষার জন্য দেওয়া হল।

নির্মলা বলে, কইতে আমার মাথা কাটা যায় আপনের কাছে। গোবুগুলারে পশ্চিমা গোয়ালার কাছে বেইচা দিছে। কত কইলাম, দুধ দেয়, গোবু বেচেন ক্যান দিদি ? দিদি কয়, তুই মুখ বুইজা থাক মুখপুড়ি !

একটা নিশ্বাস ফেলে নির্মলা।

মুখপুড়ি কয় ! ক্যান, মুখ পুড়াইলাম কীসে ? জানি আপনে মানুষ না, দেবতা। জানি কোনোকালে ভুইলা আমার হাতখান ধরবেন না। ভাবি, না ধরলেন হাত, দেবতা মানুষ হইয়া জন্মাইয়াছেন আপনে, আপন ভাইবা আপনে দরদ দিয়া দুইটা কথা কইলে আবাগি আমার পাপের জন্ম ধন্য হইব।

নির্মলা কপাল চাপড়ায় ডান হাত দিয়ে।—দিদির বড়ো খাতিরের মানুষটা সতীশবাবু। কয়বার গুন্ডা ডাকাইতের নাখান হাত ধরছে দিদি জানে ? দিদি মন্দিরে পূজা দিবাব যায়, বুড়া রাক্ষসটা আমারে ডাইকা লইয়া যায় দিদির ঘরে।

নির্মলা কেঁদে ফেলে।—আপনে দেবতা। পায়ে ধইরা কইলেও হাত ধরেন না। আপনে ক্যান খাইটা মরেন ? আপনার ক্যান টাকা নাই ? আমি জানি, আপনাগের টাকা থাকে না। ডাকাইতগুলার টাকা ছাড়া কথা নাই, আপনে কী নিয়া পাল্লা দিবেনই? চুরি ডাকাতি আপনার কাম না।

রাখাল তার হাত ধরে। নিজের দেবতাত্ব ভুলে গিয়ে অবশ্য নয়।

নির্মলারও সে ভুল হয় না।

সহজে আর ভাঙবার নয় তার বিশ্বাস। ব্রতপূজা অন্তহীন আচারবিচার বাইরের নানা আড়ম্বরের আড়ালে মনুষ্যত্বহীনতার আড়ত জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে তার জীবন কেটেছে,

ছেলেবেলা বিধবা হয়ে আজ তার সাতাশ বছর বয়স। সে বিশ্বাস করতে পারত না যে নিজে যেচে হাত ধরে টানলেও মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে,—দেবতা ছাড়া এটা অসাধ্য।

রাখাল তাই তার কাছে সত্যই দেবতা।

রাখাল গভীর মমতার সঙ্গে বলে, যে সব দিন চলে গেছে, যেতে দাও। যে জেলখানায় আটক ছিলে সেটা ভেঙেই পড়ছে। আপশোশ করে লাভ কী হবে ? জীবন তো তোমার ফুরিয়ে যায়নি, এবার অন্যভাবে গড়ে তোল জীবনটা।

একটি হাত তার ধরাই থাকে রাখালের হাতে। অন্যহাতে চোখ মুছে সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

এই জীবন দিয়া আর কী করুম ?

জীবন কি ফেলনা মানুষের ? আমি তোমায় শিখিয়ে দেব কী করে নতুন জীবন গড়বে।

হাত টেনে নিয়ে নির্মলা গড় হয়ে তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

ষোলো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল নির্মলা, বাইশ বছর বয়সে বিয়ে হবে শোভার। দুজনেই তারা জানে না জীবন নিয়ে কী করবে। হতাশার সঙ্গে মানুষের উপর তীব্র একটা বিদ্বেষ আছে নির্মলার — জীবনের অভিজ্ঞতায় যার জন্ম। আশ্চর্য এই, শোভার হতাশাও নেই জ্বালাও নেই।

কেন জ্বালা নেই বলে গায়ের জ্বালায় সাধনা আক্ষেপ করেছে তার কাছে !

শোভারও একদিন আসবে হতাশা আর জ্বালাবোধ। অভিজ্ঞতার সঙ্গে আসবে। যে কৃত্রিম কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে তার মন সেটা কেটে গেলেই আসবে।

সাধনা বলে, ও মেয়েটার কথা বোলো না আমায়, ঘেন্না হয়। তোমার ওই নির্মলার জন্য মায়া হয়, বেচারির উপায় ছিল না। কিন্তু এ মেয়েটা কী ? ও তো আর বেড়াজালে আটক থাকেনি জন্ম থেকে !

সাধনার কাছে এতটুকু ক্ষমা নেই শোভার।

তার নিজের জীবনের সমস্ত বন্ধন সংকীর্ণতা অসহায়তা আর অপমানেরই প্রতীক হয়ে যেন দাঁড়িয়েছে মেয়েটা।

প্রভার সঙ্গে শোভা তার বাড়িতে বেড়াতে এলে ভদ্রতার খাতিরেও সে এই ঘৃণা আর অবজ্ঞা চাপতে পারে না।

শোভা টের পেয়ে বলে, সেজদি, আমি একটু ঘুরে আসছি।

সে চলে গেলে প্রভা হেসে বলে, আগে ঘর ছেড়ে বেরোত না। ক-দিন খুব যাচ্ছে বন্ধুদের কাছে। আজকালকার মেয়ে তো, বিয়ের আগে জামা-টামার প্যাটার্নটি পর্যন্ত নিজেরাই পরামর্শ করে ঠিক করবে !

প্রভার হাসিভরা মুখেও একটা চড় কষিয়ে দেবার সাধ জাগে সাধনার। বিয়ের নামে বেশ্যাবৃত্তি করার সুযোগ পেয়েছে বলে শোভা খুশি, প্রভাও খুশি বোনকে এই সুযোগ জুটিয়ে দিতে পারছে বলে !

ভোলার মা আজও ডিম বেচে। মাঝখানে গরমে ডিম তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেত বলে কিছুদিন ডিম বন্ধ রেখে তরকারি বেচেছিল। কুমড়োর ফালি, কাঁচা আম, কাঁচা লংকা, লেবু এই ধরনের তরকারি। দু-একপশলা বৃষ্টি নেমে গরম কমায় আবার সে ডিম বেচছে, তার সঙ্গে কিছু কিছু তরকারি বেচাটাও বজায় রেখেছে।

রাখাল বলে, তুমিও কারবার বাড়াচ্ছ ভোলার মা ?

উপায় কী কন ? লাভ থাকে না।

ঠিক বলেছ। আমাদেরও ওই দশা। মালের দর চড়ছে, লাভ জমে যাচ্ছে ওপরের দিকে, আমাদের কপালে ঢুঢু !

ভোলার মার কাছে একটা গুরুতর খবর শুনে সাধনা কলোনিতে গিয়েছিল, সেখানে দেখা হল সুমতির সঙ্গে।

সেও ওই বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে এসেছে।

বলে, আপনি প্রায়ই এদিকে আসেন শুনেছি।

আমি এমনি আসি এদের সঙ্গে কথা-টথা বলতে। কী হাঙ্গামা হয়েছে শুনছিলাম।

প্রভাতবাবু শাসিয়ে গেছে, নিজেরা না উঠে গেলে মেরে তাড়াবে।

তাড়ালেই হল ! পাড়ায় লোক নেই !

সাধনার উষ্ণতায় একটু আশ্চর্য হয়েই সুমতি তার দিকে তাকায় ! বলে, আমরাও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু লোক থাকলেই তো হয় না, তাদের একসাথে জোটাতে হয়। প্রভাতবাবুর ভাড়াটে লোক হঠাৎ এসে হাঙ্গামা করবে। বড়ো কলোনি হলে ভিন্ন কথা ছিল, এইটুকু কলোনি, ক-জন আর মানুষ। পাড়ার লোক আসতে আসতে এদের দফা শেষ হয়ে যাবে !

শুনে সাধনা চিন্তিত হয়ে বলে, প্রভাতবাবু শাসিয়ে গেছে, ওকেও শাসিয়ে দিলে হয় না ? দশজনে গিয়ে যদি আগে থেকে ধমকে দেয় যে এ সব কুবুদ্ধি চলবে না, ওর কি সাহস হবে হাঙ্গামা করতে ?

সুমতি আবার একটু আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনি তো মন্দ কথা বলেননি ! হাঙ্গামা হবার আগেই ঠেকাবার চেষ্টা করলে দোষ কী ? আমি আজকেই সমিতির সভায় তুলব কথাটা।

কথা বলতে বলতে শোভার কথা উঠে পড়ে।

সুমতি বলে, শোভার বিয়ে হচ্ছে জানেন ? মল্লিকদের বাড়ির শোভা ?

শুনেছি।

কী কাণ্ড দেখুন, মেয়েটা গিয়ে আমায় ধরেছে, বিয়ে বন্ধ করিয়ে দিতে হবে। এত লোক থাকতে আমায় গিয়ে ধরেছে, এই সেদিন আমি জেলে থেকে বেরিয়ে এলাম ! ওর বাড়ির লোকের সঙ্গে শুধু জানাশোনা আছে, এই পর্যন্ত। আমি বলতে গেলে তারা শুনবে কেন আমার কথা ? বরং অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। ওদের বাড়ির মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমার কথা বলার কী অধিকার ? শোভা ছাড়বে না, আমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সাধনা যেন আকাশ থেকে পড়ে শুনছিল, শোভা চায় না বিয়েটা হোক ?

তাইতো বলছে। তিনবার গিয়েছে আমার কাছে। কত বুঝিয়ে বলেছি তোমার মতো নেই এটা জোর করে বাড়ির লোককে জানিয়ে দাও। নিজে না পারো, বউদিরা আছে, দিদি আছে, তাদের কাউকে দিয়ে বলাও ? তা, বলে কী, বলতে টলতে ও পারবে না, বলে কিছু লাভ নেই। কী ভীরু বলুন তো মেয়েটা ? বলে কি না, আপনি তো নানাকাজ করেন, আমায় একটা কাজ জুটিয়ে দিন। তার মানে বুঝেছেন ? বাড়িতে লড়াই করার সাহস নেই, চুপিচুপি পালাবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে আমায়। বলতে বলতে কেঁদেই ফেলল মেয়েটা। নিজে কিছু করতে পারবে না, আমাকে করতে হবে। আমি আন্দোলন করি কি না, তাই বুঝি ভেবেছে একটা আন্দোলন করে ওর বিয়েটা ঠেকাতে পারব !

সাধনা বলে, কী আশ্চর্য ব্যাপার ! আমি তো ভাবছিলাম, মেয়েটার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু নেই, বিয়ে হলে হোক না হলে না হোক সব সমান ওর কাছে। তাই তো ! বাড়িতে মুখ ফুটে কিছুই বলে না, আপনাকে গিয়ে ধরেছে !

বলুন তো ? শক্ত মেয়ে হয় পরামর্শ দেওয়া যায়। আত্মীয়বন্ধু হলেও বরং চেষ্টা করা যায়।

সাধনা চুপ করে ভাবে।

সুমতি কথা পালটে বলে, প্রভাতবাবুকে আগেই ধমকে দেওয়া উচিত। পাড়ার লোক ডাকতে গেলে রাখালবাবুর আসা চাই কিন্তু।

রাখালবাবুকে বলবেন।

রাখাল মেলামেশা করে পাড়ার লোকের সঙ্গে কিন্তু হাঙ্গামার ব্যাপারে সে মাথা গলাবে এটা সে এখনও বিশ্বাস করতে পারে না।

সাধনা সোজা গিয়ে হাজির হয় মল্লিকদের বাড়ি। সময় অসময় খেয়াল থাকে না।

শোভা রাঁধছিল।

প্রভা বলে, আসুন, আসনু। এমন সকালবেলা হঠাৎ ? রান্না নেই ?

দুটি লোকের আবার রান্না। শোভা কই ?

মেজো বউ বলে, রাঁধছে বুঝি। বসুন না দিদি ? বীরেনবাবুর বউ আপনার খুব প্রশংসা করে।

সাধনা হেসে বলে, প্রশংসা মানে নিন্দা তো ? আমি শোভাকে একটু ডেকে নিতে এসেছি।

এখন ? দরকারটা কী দিদি ?

সাধনা নির্বিবাদে মিছে কথা বলে, একটা খাবার করেছি, একটু চেখে আসবে।

চালাক কম নয় সাধনা। অন্য কারণে ডাকলে হয়তো প্রভারাও কেউ সঙ্গে যেত, এমনিই যেত। কিন্তু খাবার খেতে যখন শোভাকে একলা ডাকা হয়েছে, আর কেউ যাবে না জানা কথা, নিরিবিলি সে কথা কইবার সুযোগ পাবে শোভার সঙ্গে।

খাবার অবশ্য সে আনতে দেয় শোভার জন্য। ময়রা দোকান থেকে তৈবি খাবার। বলে, খাবার খেতে ডাকিনি কিন্তু, তোমার বিয়ের কথা বলতে ডেকেছি। আমার কাছে লুকোবে না কিছু। লজ্জা করবে না।

শোভা মুখ বুজে থাকে।

তুমি চাও না তো এ বিয়ে হোক ?

শোভা একটুখানি মাথা নাড়ে। না-চাওয়াটা যেন তার তেমন জোরালো নয় !

সত্যিই চাও না, না, শুধু একটু অনিচ্ছার ব্যাপার ? যদি ঠেকানো যায় ভালোই, না গেলে আর উপায় কী—এ রকম ভাব নয় তো তোমার ? চুপ করে থেকো না ভাই, স্পষ্ট করে কথা কও।

চাই না তো। আমি মানুষ না ?

সাধনা খুশি হয়ে বলে, মানুষ যদি তো চুপচাপ আছ কেন ? স্পষ্ট জানিয়ে দাও এ সব জোরজবরদস্তি চলবে না। তুমি না চাইলে কেউ বিয়ে দিতে পারে তোমার ? বাইশ বছর বয়স হয়েছে, এমনিতেই তো তুমি স্বাধীন, আইন দিয়ে তুমি বিয়ে ঠেকাতে পার। সকলে রেগে যাবে, বাড়িতে অশান্তি হবে, এ ভয়েই যদি মুখ বুজে থাক, তবে আর তুমি মানুষ রইলে কীসে ? একটা বিপদ ঠেকাবে, সে জন্য ঝঞ্ঝাট পোয়াবে না ?

শোভার মুখে একটা নিরুপায় হতাশার ভাব দেখা দেয়। একবার সে চোখ তুলে তাকায়। ছোটো একটি নিশ্বাস ফেলে।

আপনারা বুঝছেন না। সুমতিদিও খালি এই কথা বলছে। জোর করে তো বিয়ে দিচ্ছে না।

তবে তুমি ভাবছ কেন ? মুখ ফুটে জানিয়ে দাও, বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে।

আপনি বুঝবেন না। মুখ ফুটে কী জানাব ? কী বলব বাবাকে দাদাকে ? আমার যে কিছু বলার নেই।

সাধনা খানিক চুপ করে থাকে।

সত্যি বুঝতে পারছি না তোমাব কথা।

শোভাও একটু চুপ করে থেকে বলে, কত বছর ধরে চেষ্টা করছে তো, এর চেয়ে ভালো জুটল না। কোন মুখে বলব এটাও বাতিল করে দাও ? যখন জিজ্ঞেস করবে, আমি তাহলে কী করব, আমার গতি কী হবে, কী জবাব দেব ?

বলবে যে তুমি আইবুড়ো থাকবে।

খাওয়াতে পরাতে পারবে না জানিয়ে দেবে।

পারতে হবে। কেন তোমায় লেখাপড়া শেখায়নি, মানুষ করেনি ?

শোভা আশ্চর্য হয়ে বলে, কী বলছেন ? এ কথার মানে হয় ? বোনেদের যেমন শিখিয়েছে, যেমন মানুষ করেছে, আমাকেও তেমনি করেছে। অবস্থাটা পালটে গেছে বলেই তো, নইলে বাবার কী দোষ, দাদার কী দোষ ? পাবলে তারা আমার বোনেদের মতো আমারও উপায় করে দিত। কী অবস্থা হয়েছে সেটা বুঝি তো। কোন মুখে বলব ?

সাধনা নিশ্বাস ফেলে। কঠিন দেখায় তাব মুখখানা। শোভাকে খাবার দিয়ে বলে, খেয়ে নাও। খাবার খাওয়াবো বলে ডেকে এনেছি।

শোভা খায় এবং তার খাওয়ার বকম দেখেই বোঝা যায় পেটে তার চনমনে খিদে। আহা, তা হবে না ? বাইশ বছরের জোয়ান মেয়ে, তারও যদি না জোরালো খিদে পায়, তবে তো ধরে নিতে হবে মেয়েছেলে ব্যাটাছেলে নির্বিশেষে মানুষ ডিসপেপটিক হয়ে জন্মায়।

রাত্রে সবে রাখাল বাড়ি ফিরেছে, প্রভাত সরকাবের বাড়ি যাবার জন্য তাকে ডাকতে আসে।

খবর পাওয়া গেছে, আজ শেষরাত্রেই খুব সম্ভব প্রভাতের ভাড়া করা লোকেরা কলোনিতে হানা দেবে। এ বিষয়ে সোজাসুজি কথা বলার জন্য স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক এখুনি তার বাড়িতে যাবে।

যাবে নাকি ?—সাধনা জিজ্ঞাসা করে।

ঘুরে আসি।

জামা কাপড় না ছেড়েই রাখাল বেরিয়ে যায়।

প্রভাত বাইবের ঘরেই ছিল। বসে বসে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করছিল তিনজন লোকের সঙ্গে। তাদের মধ্যে বামাচবণকে দেখেই রাখাল চিনতে পারে।

রাজীবের ভক্তির সুযোগে শ-পাঁচেক সিগারেট ধারে বাগাতে সেই যে দোকানে গিয়েছিল, তারপর লোকটিকে আর দ্যাখেনি রাখাল। চেহারাটা কিন্তু স্পষ্ট মনে ছিল।

লোকটা যেন বাস্তব জ্ঞানের প্রতীক, তাই একবার দেখলেও অঞ্জনের মতো চোখে লেগে থাকে।

পাড়ার জন পনেরো ভদ্রলোককে এত রাত্রে হঠাৎ তার বাড়িতে হাজির হতে দেখে প্রভাত বেশ খানিকটা ভড়কে যায়।

কী ব্যাপার ?

সুমথের বয়স কম। কলেজে পড়ে। সেই মুখ খোলে সবার আগে। বলে, আমরা খবর পেলাম আপনি নাকি ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে এই কলোনির লোকদের পেটাবেন। আমরা তাই এসেছি—

প্রভাত চটে বলে, যেখান থেকে উড়ো খবর পেয়েছ, সেখানে গেলেই হত ?

রাখাল তাড়াতাড়ি দু-পা এগিয়ে বলে, না না, কথাটা তা নয় প্রভাতবাবু। ছেলেমানুষ ঠিক বলতে পারছে না। কলোনির লোকেরা বলছে, আপনি ওদের মারধোর করে তাড়াবেন বলে

শাসিয়েছেন। একটা গুজবও রটেছে যে আপনি নাকি গুন্ডা ভাড়া করে রেখেছেন। আমরা গুজব শুনেই বিশ্বাস করে ছুটে এসেছি তা নয়। একজন ভদ্রলোক এ সব করবেন বলে আমরা বিশ্বাস কবি না। আমরা একটা অনুরোধ জানাতে এসেছি আপনাকে।

প্রভাত বলে, ও !

সুমথ বলে, অনুরোধ মানে ? এই মানুষটার কাছে অনুরোধ মানে ?

তার কথা কানে না তুলেই রাখাল বলে, আপনি কলোনির লোকদের উঠে যেতে বলছেন, আমরা চাই না এ নিয়ে কোনো হাঙ্গামা হয়। আপনি ওদের বুঝিয়ে হোক, অন্যভাবে হোক চলে যেতে রাজি করাতে পারেন, আমাদের কিছুই বলার নেই। পাড়ার মধ্যে আমরা হাঙ্গামা চাই না।

বামাচরণ প্রভাতের পিছন থেকে বলে, ইনিও কি হাঙ্গামা চান মশাই ? আপনারা বাজে গুজব শুনে ব্যস্ত হয়েছেন।

তবে তো কথাই নেই।

ফিরে যেতে যেতে অসন্তুষ্ট সুমথ বলে, একটু শাসিয়ে দেওয়া হল না, কিছু না, অনুরোধ জানিয়ে শেষ হয়ে গেল ?

রাখাল হেসে বলে, আবার কী রকম হবে শাসানি ? সাবধান, খববদাব, মাথা ফাটিযে দেব, এই সব বললে তুমি বুঝি খুশি হতে ? তার চেয়ে দশজন ভদ্রলোকের কাছে নিজেব মুখে জানাল ও সব ফন্দি এর নেই, সব বাজে গুজব, এটা ভালো হল না ? এ ভাবে হাঙ্গামা করার রাস্তা ওর বন্ধ হয়ে গেল না ?

বিনয় সেন বলে, ঠিক কথা। এ ভাবে বলাই ঠিক হয়েছে।

এদিকে প্রভাত জিজ্ঞাসা করে, কী করা যায় হে ?

বামাচরণ বলে, নাঃ, ও সব প্ল্যান চলবে না। আপনাকে তো বাস কবতে হবে এখানে, পাড়ার লোকদের নিয়ে। অন্য বুদ্ধি করতে হবে।

রাখালের কাছে কিছুই শুনতে হয় না সাধনার। খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণই সে জানতে পারে।

লজ্জায় তার যেন মাথা কাটা যায় !

রাখাল সকলকে সামলে দিয়েছে, ঠান্ডা করে দিয়েছে। প্রভাতকে ভালো করে শাসিয়ে দেবার সুযোগ কেউ পায়নি শুধু রাখালের জন্য !

গায়ে পড়ে নেতৃত্ব নিয়ে রাখাল বড়োলোক বজ্জাতটার কাছে শুধু অনুরোধ উপরোধেব প্যানানি গেয়ে এসেছে। কেউ একটু গরম হয়ে দুটো কড়া কথা বলতে গেলে তাকে থামিয়ে দিয়েছে, সকলকে সায় দিতে সে বাধ্য করেছে তার ভীরু সবিনয় নিবেদনে যে প্রভাতবাবু দয়া করে পাড়ার মধ্যে হাঙ্গামা করবেন না !

সুমথ বলে, আর বলবেন না সাধনাদি। আমি একটু শাসাতে গেলাম ব্যাটাকে, রাখালদা আমাকেই শাসিয়ে দিলেন !

যে তীব্র আর অসীম ঘৃণা সাধনা তার চোখে দেখতে পায় তাতে তার চমকে যাওয়ার কথা। কিন্তু সাধনাও আর আগের দিনের ঘরের কোণের সেই জীবটি নেই।

হঠাৎ সে প্রশ্ন করে, সুমতি তোমার কে হয় ?

এক মুহূর্ত চোখ পাকিয়ে চেয়ে থেকে সুমথ আচমকা হেসে ফেলে।

আমার নাম সুমথ, ওর নাম সুমতি, তাই বলছেন ? সুমতি আমার কেউ হয় না।

তোমাদের খুব ভাব দেখি কি না—

আমার চেয়ে দু-তিনবছর বয়সে বড়ো দু-ক্লাস উঁচুতে পড়ে।

সুমথ মুখে এমন একটা গম্ভীর ভাব এনে কথাটা বলে যে এবার সাধনা হেসে ফেলে।

মেয়েরা বয়সে একটু বড়ো হলে, দু-এক ক্লাস উঁচুতে পড়লে তাদের সাথে ভাব হতে পারবে না, এমন কোনো আইন আছে নাকি ভাই ?

তা অবশ্য নেই, ও সব গোঁড়ামিতে আমি বিশ্বাসও করি না। কিন্তু কী জানেন, মেয়েরাই কেমন যেন একটু—

ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দেয় ? পাত্তা দেয় না ?

সুমথ মুখ লাল করে বলে, আপনি কিছু বোঝেন না। আপনার শুধু ওই এক চিন্তা। ছেলে আর মেয়ের মধ্যে যেন আর কোনো রকম সম্পর্ক নেই। আমি কি পাত্তা চেয়েছি যে সুমতি পাত্তা দেবে না ?

আমি কি তোমার কথা বলেছি ? আমি সাধারণভাবে দশটি সাধারণ ছেলের কথা বলছি। তুমি নয় মহাপুরুষ, তোমার কথা বাদ দিলাম !

সুমথের মুখে যেন গুমোট নেমেছে মনে হয়।

দেখে সাধনা ভাবে, সেরেছে ! ঝগড়া করবে না তো, ছেলেমানুষি বিক্ষোভের ঝড় তুলে ? তারপর আবার কান্না শুরু হবে না তো, ছেলেমানুষি দুঃখের কান্না ?

কিন্তু সাধনা কি জানে নিজে সে কোথায় আছে আর কোথায় পৌঁছেছে এ যুগের বিদ্রোহী ছেলে !

তাকে অবাক করে দিয়ে বুড়োর মতো সুমথ বলে, আপনার কথাটা বুঝতে পেরেছি। আপনি বাঁশঝাড় দেখে বন চিনেছেন। বড়ো মেয়েদের জন্য অনেক ছেলের পাগলামি আসে বইকী, নিশ্চয় আসে ! অনেক ছেলে মানে কত ছেলে সেটাই আপনি জানেন না। ওরা কোন শ্রেণির ছেলে সেটাও হিসেব করেন না।

তাই নাকি !

তাছাড়া কী ? জোয়ান মদ্দ পুরুষের চেয়ে আপনারা এই সব কলেজি ছেলেদের বেশি ভয় করেন—এড়িয়ে চলেন। তাতে এই সব ছেলেরা আরও বেশি করে আপনাদের দিকে ঝোঁকে কি না, আরও বেশি পাগল হয় কি না, আপনারা তাই ভারী মজা পান, খুশি হন।

সাধনা গালে হাত দেয়।

কিন্তু ছেলে বলতে আজকাল ওদের আর বোঝায় না সাধনাদি, বুঝলেন ? সব ছেলের মধ্যে বড়োলোক আর পাতি বড়োলোক ছেলে ক-টা ? ওদের মধ্যে বাঁকা রোমান্সের ব্যারামটা ছড়ানো গিয়েছিল বলে সব ছেলে ওই ব্যারামে ভোগে বলা ভারী অন্যায় আপনাদের।

সাধনা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, সত্যি অন্যায়। যে বিষয়ে কোনোদিন ভাবিনি, সে বিষয়ে বড়ো বড়ো কথা বলার রোগ আমাদের সত্যি আছে ভাই। হাওয়ায় চড়ে বেড়াই তো আমরা।

তার এই বিনয়ে খুশি হয়ে সুমথ বলে, এবার ভাবছেন তো ? ভাবতে হচ্ছে তো আজকাল ? তবেই বুঝে দেখুন। আপনারা ঘরের কোণে জীবন কাটান, আপনাদের পর্যন্ত এ সব না ভেবে উপায় থাকছে না। ছেলেরা কী রকম ভাবনায় পড়েছে ভাবুন তো ? কী জানেন সাধনাদি, ছেলেদের দোষ নেই, ছেলেদের বিগড়ে দেবার জন্য ভীষণ চেষ্টা করা হয়।

সাধনা মৃদুস্বরে বলে, শুধু ছেলেদের নয় ভাই। পরশু দিন সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। কী ভিড় ! সিনেমা দেখে এসে মনে হচ্ছিল, দূর, এভাবে বেঁচে থাকাই মিছে। তার চেয়ে সব কিছু চুলোয় দিয়ে মজাদার রংদার কিছু করা যাক।

সুমথ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসে সাধনাকে। বলে, আপনাকেও গেঁয়ো ভাবতাম। মাপ চাইছি !

সাধনা অনুযোগ দিতে রাখাল হেসে বলে, এটা তোমার ছেলেমানুষি গায়ের জ্বালা। মারব কাটব ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব—এ সব বললেই কি বেশি শাসানো হত ? না গালাগাল দিয়ে অপমান করলে বেশি ভয় পেত ? দশজনের কথার জোরটা তুমি বুঝতে পারছ না। আমরা কেন আগে থেকেই ধরে নেব যে আমরা বলার পরেও নিজের মতলব হাসিল করার স্পর্ধা লোকটার হবে ? আগে থেকে ভয় দেখাতে যাব কেন ? তাতে আমাদেরই দুর্বলতা প্রকাশ পেত।

প্রভাতবাবু শুনবে তোমাদের কথা ?

শুনবে না ? ওর এটুকু বুদ্ধি নেই ? সবাই বারণ করলে সে কাজটা যে করা যায় না, মূর্খেও এটা বোঝে।

সাধনা যতটা জ্বালা বোধ করেছিল, রাখালের এই সামান্য কয়েকটি কথায় সেটা একেবারে জুড়িয়ে যাবে, এটা যেন তার পছন্দ হয় না। অথচ রাখাল ঠিক কথাই বলেছে—এটা না মেনেও উপায় নেই নিজের কাছে।

সাধনার তাই অন্য একটা জ্বালা আছে।

সে কি রাখালের চেয়ে সব দিক দিয়েই ছোটো ? বিদ্যায় বুদ্ধিতে বাস্তববোধে আত্মসংযমে কর্মনিষ্ঠায়—মনুষ্যত্বে ? মানুষ হিসাবে রাখালের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করার কথাটা জীবনে আজ প্রথম মনে আসে সাধনার। বেকার রাখালের সঙ্গে এতবড়ো প্রচণ্ড সংঘাত গেল, ভেঙে প্রায় চুরমার হবার উপক্রম হল তাদের জীবন—কিন্তু তখনও এ রকম তুলনামূলক আত্মসমালোচনার চিন্তা তার খেয়ালেও উঁকি মেরে যায়নি।

সে শুধু বিচার করেছে রাখাল কেমন মানুষ, কেমন স্বামী।

ভাঙনটা সামলে নেবার পর আত্মসমালোচনা অবশ্যই এসেছে। নিজের কতগুলি বড়ো বড়ো দোষ আর ভুল সে আবিষ্কার করেছে নিজেই। নিজের কাছে সে স্বীকার করেছে যে দোষ কেবল রাখালের একার ছিল না, নিজেও সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, ধৈর্য হারিয়েছিল, নিজের সুখ দুঃখ অর্থাৎ স্বার্থটাই সব চেয়ে বড়ো করে ধরেছিল।

কিন্তু রাখালের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেনি।

মানুষ হিসাবে তুলনা।

মানুষের যেগুলি গুণ, মানুষ হিসাবে যাতে পরিচয় মানুষের, রাখালের সঙ্গে নিজের সেই গুণগত তুলনা। কোন গুণটা তার বা রাখালের আছে বা নেই, কোন গুণটার বিকাশ কতখানি হয়েছে তার আর রাখালের মধ্যে।

একটু ভেবে দেখবার অবসর চেয়ে প্রাণটা যেন ছটফট করে সাধনার।

এ দেশের মেয়েরা পিছিয়ে আছে। সে তা জানে এবং মানেও। রাখালের তুলনায় সে কোনোদিক দিয়ে কতখানি পিছিয়ে আছে একান্তে একটু হিসাব করে দেখার জন্য তার যেন ধৈর্য ধরে না।

কিন্তু সারাদিন খেটেখুটে শ্রান্তক্লান্ত মানুষটা বাড়ি ফিরেছে, জামাকাপড় ছেড়ে পাঁচ মিনিট একটু বিশ্রাম করছে—এখন ওকে এটা ওটা এগিয়ে দেওয়া, আসন পেতে রুটি বেড়ে খেতে দেওয়া আর মন বুঝে ঘুমানোর আগে একটু গা ঘেঁষে যাওয়া ইত্যাদি কর্তব্যগুলি পালন না করে নিজের চিন্তা নিয়ে মশগুল সে কোন হিসাবে হয় ?

যার খাচ্ছে যার পরছে যার ভাড়া করা ঘরে মাথা গুঁজে আছে, মানুষ হয়ে তার জন্য একটু না করলেই বা চলে কী করে ?

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও আদান-প্রদানের একটা বাস্তব নিয়মনীতি আছে তো।

মন কিন্তু মানে না।

জ্যোৎস্না ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। রুটির থালা সাজিয়ে আনতে রান্নাঘরে যেতে যেতে উঠানটুকুতে যে জ্যোৎস্না পড়েছে সেদিকে তাকাতেও যেন ইচ্ছা হয় না, চোখ উঠে যায় জ্যোৎস্নায় আলোকিত ওই আকাশে। সাধনাও ভাবে যে এ কী আশ্চর্য ব্যাপার ? অন্ধকার রাত্রির সঙ্গে জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির তফাত তো এই যে পৃথিবীর ঘরবাড়ি মাঠ পুকুর গাছপালা অমাবস্যার অন্ধকারে ঢাকা থাকে আর পূর্ণিমার চাঁদের আলোমাখা রূপ নিয়ে ধরা দেয় চোখে—চোখ কেন পৃথিবীকে বাতিল করে আকাশে জ্যোৎস্নালোকের শোভা দেখে মুগ্ধ হয় ?

মেঘ আর চাঁদের আলোয় মেশানো শোভা হোক, অথবা নির্মেঘ আকাশের শোভা হোক ?

বাইরে কড়া নড়ে।

রুটির থালা হাতে দরজার কাছে গিয়ে সাধনা শুধোয়, কে ?

বন্ধ দরজার ও পাশ থেকে বামাচরণ বলে, প্রভাতবাবু এসেছেন। রাখালবাবুর সঙ্গে দুটো কথা কইবেন।

একমুহূর্ত ভাবে সাধনা।

প্রভাতবাবুরাই কি তবে তাকে একান্তে একটু চিন্তা করার ছুটি এনে দিল ?

অথবা কর্তব্য হিসাবে দরজা না খুলেই এদের বলবে, একটু দাঁড়ান, উনি খেতে বসেছেন, আসছেন ? বলে শ্রান্ত-ক্লান্ত ক্ষুধার্ত রাখালের সামনে রুটি-তরকারির থালাটা ধরে দিয়ে সে খেতে আরম্ভ করলে ধীরেসুস্থে বলবে যে বাইরে কে বুঝি তোমায় ডাকছে ?

শ্রান্তি ?

ক্লান্তি ?

ক্ষুধা ?

চুলোয় থাক সব !

সাধনা দরজা খুলে দেয়।

বলে, আসুন।

ভরা জ্যোৎস্নায় তার দিকে চেয়ে প্রভাত যেন থতোমতো খেয়ে ভড়কে যায় !

আমতা আমতা করে বলে, রাখালবাবু আছেন ?

তখন খেয়াল হয় সাধনার। হায়, ছুটি পাবার আশায় দিশে হারিয়ে সে একবারে ভুলে গেছে যে সে তার বউয়ের চাকরিতে ডিউটি করছে। আশারা শুয়ে পড়েছে দরজায় খিল দিয়ে। শায়া ব্লাউজ খুলে ফেলে রেশন-মার্কা সুপারফাইন নতুন শাড়িটা শুধু গায়ে জড়িয়ে সে রেশনের গমভাঙা রুটি আর আলুপেঁয়াজের তরকারি থালায় নিয়ে খেতে দিতে যাচ্ছিল রাখালকে।

কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। উপায় কী।

একটু দাঁড়ান, আমি ভদ্রমহিলা সাজি, বলে তো আর এদের সামনে শায়া ব্লাউজ গায়ে চড়ানো যায় না।

সাধনা স্পষ্ট সহজভাবে বলে, ভেতরে আসুন, উনি ঘরে আছেন। খেতে বসেছেন।

বলে সে নিজেই এগিয়ে যায়। তার নিজের হাতে তৈরি পাশাপাশি লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা আর সরস্বতীর বাহন হাঁস আঁকা আসনে উপবিষ্ট রাখালের সামনে থালাটা নামিয়ে দেয়।

বলে, প্রভাতবাবুরা তোমার সঙ্গে কথা কইতে এসেছেন।

বলে, প্রভাত আর বামাচরণকে ডেকে বলে, আসুন। ঘরে আসুন। চেয়ার-টেয়ার নেই, খাটেই বসুন দুজনে। উঠছ কেন তুমি ? খেতে খেতেই কথা বলো না এঁদের সঙ্গে।

বাইরে সাধনার বিছানার চাদরটা শুকোচ্ছিল, সেটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়।

আশা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলে, কে এল ?

সাধনা একটু গর্বের সঙ্গেই বলে, প্রভাতবাবু ওর সঙ্গে কইতে এসেছেন। কলোনির ব্যাপার নিয়ে বোধ হয়।

এতই আত্মসচেতন হয়েছে সাধনা আজকাল যে আশার কাছে এই গর্বপ্রকাশ তার নিজের কাছে ধরা পড়ে যায়। সে ভাবে, আমার হয়েছে কী ? কী নিয়ে আমি ফুটানি করলাম আশার কাছে ?

প্রভাতের মতো লোক তাদের বাড়িতে এসেছে বলে অথবা পাড়ার মধ্যে রাখাল নেতার সম্মান পেয়েছে বলে তার অহংকার—সাধনা বুঝে উঠতে পারে না। হঠাৎ হাতে খেলনা পাওয়ার মতো দুটো কারণেই যে বুকটা হঠাৎ তার বেশ একটু ফুলে উঠেছে, নিজেকে এতটা তলিয়ে বুঝবার সাধ্য সাধনার জন্মেনি।

তাহলে অনেক সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠত তার কাছে, অনেক সমস্যার মীমাংসা হয়ে যেত।

তার আত্মচিন্তা আর আত্মসমালোচনাও যে কোন চেতনার প্রক্রিয়ায় পাক খাচ্ছে সেটা ধরা পড়ে যেত তার কাছে। রাখালের সঙ্গে তুলনায় নিজেকে ছোটো মনে হবার বদলে কী যে তাকে পিছনে কোথায় ঠেলে রেখে দিয়েছে সেটা জানতে পারত।

কী কথা হয় শোনার জন্য আশাও দরজার কাছে তার পাশে দাঁড়ায়।

প্রভাত বলে, অসময়ে এসে আপনাকে আমরা বিরক্ত করলাম। আপনি খেয়ে নিলেই পারতেন।

রাখাল বলে, খাবখন সে জন্য কী। মেয়েদের বুদ্ধি তো, দুজন ভদ্রলোক বাড়িতে এসেছেন, পরে খাবারটা দিলেই হয়। বলে গেলেন, বুটি চিবোতে চিবোতে কথা বলো ! ভাত হলে তবু তাড়াতাড়ি গেলা যেত।

বামাচরণ বলে, তা যা বলেছেন দাদা ! বুটি চিবোতে চিবোতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। ক-বছর বাদে দেখবেন বাঙালির মুখের চেহারা পালটে গেছে। রোজ মুখের নতুন রকম ব্যায়াম হচ্ছে তো !

বলে সে সশব্দে হাসে।

প্রভাত বলে, তাহলে আর আপনার দেরি করিয়ে লাভ নেই, কথাটা সেরে ফেলা যাক। সেদিন আপনারা দশজনে গেলেন, সকলের সামনে আর তর্কের কথা তুললাম না। আপনারা ধরে নিয়েছেন, গোলমাল বুঝি আমিই করতে চাই। আমার মশাই হাঙ্গামা করে লাভ ? সে দিনকাল কি আর আছে যে জমিদারি দাপটে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেব ? কথাবার্তা বলে ন্যায়সঙ্গত একটা মীমাংসা হোক, তাই তো আমি চাই।

রাখাল বলে, সেটাই তো ভালো কথা।

আপনারা সেদিন আমায় বলে এলেন, হাঙ্গামা যেন না হয়। হাঙ্গামা করার কথা আমি ভাবিওনি। কিন্তু এদিকে কলোনির লোকেরা যে আমায় পিটোবে বলে শাসাচ্ছে সেটা তো আপনারা দেখছেন না ?

সে কী কথা ? কলোনির লোকেরা যদি গোলমাল করে, আমরা দশজনে ওদেরও নিশ্চয় শাসন করে দেব।

সাধনা চুপ করে থাকতে পারে না।

ভিতরে গিয়ে সোজাসুজি প্রভাতকে বলে, কিন্তু ওরাই বা মিছিমিছি আপনাকে পিটোতে চাইবে কেন প্রভাতবাবু ?

বিছানার চাদর জড়ানো ঘরের বউকে কলোনিবাসীর পক্ষ নিয়ে রুখে দাঁড়াতে দেখে প্রভাত একটু ভড়কে যায়। তার হয়ে বামাচরণ বলে, সেই কথাই বলছি আমরা। উচিত কী অনুচিত বিচার

করবে না, কোনো কথা শুনবে না, ওদের জিদ বজায় রাখবে। এইখানে জমি দখল করে থাকবে, আর কিছু বিবেচনা করতে রাজি নয়। নড়তে বললে মাথা ফাটিয়ে দেবে, মারামারি করবে।

ওরাই বা কোথায় যায় বলুন ? একবার নিরাশ্রয় হয়েছিল, কুঁড়েঘরে মাথা গুঁজে আছে। আবার কি নিরাশ্রয় হতে বলেন ওদের ?

ওই তো মুশকিল, ওরাও ঠিক একগুঁয়ের মতো কথা বলছে। আমরা ওদের নিরাশ্রয় হতে বলছি কী বলছি না—

যেখানে উঠে যেতে বলছেন, সেখানে মানুষ থাকতে পারে না।

বামাচরণ অসহায়ের মতো একটা নিশ্বাস ফেলে। গভীর আপশোশের সঙ্গে বলে, আপনিও সব কথা না শুনেই একটা সিদ্ধান্ত করে বসছেন—কী আর বলা যায় বলুন ?

রাখাল এবার বিরক্তি জানিয়ে সাধনাকে বলে, তুমি আবার তর্ক জুড়লে কেন ? ওরা কী বলছেন শোনা যাক আগে ?

সাধনা চুপ করে থাকে।

বামাচরণ প্রভাতের দিকে তাকায়।

প্রভাত বলে, তুমিই বলো।

বামাচরণ বলে, দেখুন, এ ভদ্রলোককে আপনারা একেবারে ভুল বুঝেছেন। কলোনির লোকেরাও ভুল বুঝেছে, আপনারাও ভুল বুঝেছেন। কলোনির ওদের ও জমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা এঁর মতলব নয়, ইনি যে প্ল্যান করেছেন সেটা ওদেরও মঙ্গলের জন্যই। এঁর কি স্বার্থ নেই ? নিশ্চয় স্বার্থ আছে, শুধু ওদের মঙ্গল করার জন্যই ইনি প্ল্যানটা করেননি। এঁর স্বার্থও বজায় থাকবে, কলোনির ওদেরও একটা স্থায়ী ভালো ব্যবস্থা হবে—এই জন্যই এঁর এত উৎসাহ।

প্ল্যানটা কী ?

বামাচরণ ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করে শোনায়। আসল ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয় কিন্তু সে এমনভাবে বলে যেন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে শ্রোতা দুজনের মাথায় ঢুকবে না।

কলোনির জমিতে প্রভাত একটা কারখানা গড়বে। স্টোভ, ল্যাম্প, লোহার উনান, বালতি ইত্যাদির কারখানা। কারখানার সঙ্গে সে তৈরি করবে খাটুয়েদের বসবাসের জন্য বড়ো একটা ব্যারাক। এই কারখানায় সে কাজ দেবে কলোনির লোকদের—যতজন কাজ করতে চায়। ব্যারাকের পাকা ঘরে তারা বাস করতে পাবে।

বামাচরণের ব্যাখ্যা শুনতে প্রভাত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। মুখপাত্র থামতেই সে বলে, ফ্যাক্টরির প্ল্যানটা আমার, অনেকদিনের লাইসেন্স নেওয়াই আছে। এইসব মানুষগুলির কথা ভাবতে ভাবতে যখন মনে হল যে ফ্যাক্টরিটা স্টার্ট করে দিলে এদেরও আমি একটা হিল্লে করে দিতে পারি তখন ভাবলাম, তাহলে আর দেরি করা উচিত নয়। এখানে আর ক-জন লোক থাকে ? সকলেই অবশ্য ফ্যাক্টরিতে আসবে না, কেউ কেউ এ দিক ও দিক অন্যকাজে ভিড়ে গেছেন। বেশির ভাগ লোককেই আমি কাজ দিতে পারব—বরং আরও লোক আমার দরকার হবে।

বামাচরণ বলে, বাইরের লোক কিছু নিতে হবেই। এরা সবাই আনাড়ি—কাজ শেখাতে হবে। কিছু কাজ-জানা লোক ছাড়া তো ফ্যাক্টরি চলবে না।

রাখাল বলে, আপনার এ প্ল্যানের কথা তো কেউ শোনেনি প্রভাতবাবু ?

শুনতে না চাইলে কাকে শোনাবো বলুন ? ওদের বলতে গেলাম, তোমাদের ভবিষ্যতে উপকার হবে, ছ-মাস আট মাসের জন্য জমিটা ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় থাকবে যাও। শুনেই সকলের মেজাজ গরম—তাড়াবার চেষ্টা করলে আমার মাথাটাই ফাটিয়ে দেবে ! কাকে কী বলব বলুন ?

সাধনা মৃদুস্বরে বলে, ওদের যেখানে যেতে বলছেন, কারখানাটা সেখানে করুন না ?

বামাচরণ একটু হাসে।

কর্তারা ওখানে করতে দেবেন না। ওখানে কী সব করা হবে, পাঁচ-সাতবছর পরে প্রভাতবাবুকেই ছেড়ে দিতে হবে জমিটা। টেম্পোরারি শেড ছাড়া ওখানে কিছু তোলার হুকুম নেই। বুঝলেন ?

সাধনা মুখ বাঁকিয়ে বলে, কী যে সব গোলমেলে ব্যাপার !

বামাচরণ সায় দিয়ে বলে, আর বলেন কেন ! গবর্নমেন্টের কোন কাজের মানেটা আমরা বুঝতে পারি ? সব গেলেমেলে ব্যাপার।

বামাচরণ মুখে গবর্নমেন্টের সমালোচনা শুনে সাধনা কী বলবে ভেবে পায় না।

রাখাল চিন্তিতভাবে বলে, সত্যিই যদি আপনি এটা করতে চান প্রভাতবাবু—

সত্যই চাই মানে—

রাখাল শান্তভাবেই বলে, ওভাবে নেবেন না কথাটা। আমি বলছি দশজনকে কনভিন্স করানোর কথা। আপনার প্ল্যান খুব ভালো, সকলের খুশি হয়ে মেনে নেবার কথা। কলোনির ওরা এত কষ্ট করছেন—কয়েকটা মাস একটু খারাপ জায়গায় গিয়ে থেকে যদি ভবিষ্যতের উপায় হয়, ওরা এককথায় রাজি হবেন। কিন্তু বোঝেন তো, নানালোকের মনে নানাপ্রশ্ন জাগবে। আপনি যদি শেষ পর্যন্ত কিছু না করেন—

প্রভাত বলে, তাহলে মীমাংসা কী করে হবে বলুন ? আমি কারখানা দেব, ওরা আমার জমি আটকে রাখবেন, এতো আর হয় না ! আমি বাধ্য হয়েই যেভাবে পারি ওদের তুলে দেবার চেষ্টা করব।

রাখাল বলে, সকলকে যদি ডাকা যায়, আপনার কথাটা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে রাজি আছেন ? কারখানায় ওদের সকলকে কাজ দেবেন, ব্যারাকে থাকবার ব্যবস্থা করবেন—এ সব জানিয়ে দেবেন ?

নিশ্চয় !

প্রভাত ও বামাচরণ চলে যাবার পর রাখাল খেতে বসলে সাধনা বলে, তুমি কত বড়ো দায়িত্ব নিলে বুঝতে পারছ ?

আমার কী দায়িত্ব ?

তুমিই তো ডাকবে সকলের মিটিং ? তোমার সেই মিটিংয়েই তো প্রভাতবাবু তার প্ল্যানের কথা বলবেন আর ওদের জমি ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে ? তোমাকে দায়ি করবে না লোকে ?

মুখের চিবানো রুটি গিলে রাখাল চিন্তিতভাবে বলে, তাই তো !

আজ সে আচমকা টের পায় যে দশজনের ব্যাপারে এগিয়ে গেলে দায়িত্ব এসে চাপবেই !

সে হয়তো স্থির করবে না কিছুই, কী করা উচিত বা অনুচিত কোনো পরামর্শই হয়তো দেবে না, শুধু প্রভাতের প্রস্তাবটা বিবেচনা করার জন্য অগ্রণী হয়ে দশজনকে একত্র জড়ো করাবে।

তবু, সেই দশজনের জমায়েতে যে সিদ্ধান্ত হবে তার জন্য বিশেষভাবে দায়িত্ব থাকবে তার।

কেন সে দশজনকে জড়ো করতে এগিয়ে গিয়েছিল ? চুপচাপ গা বাঁচিয়ে না থেকে কী তার প্রয়োজন হয়েছিল দশজনের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার ? নিজের কাজ করে যাক আর চুপচাপ নিজের ঘরের কোণে বসে থাক—কেউ তাকে কোন বিষয়ে দায়ি করবে না।

কিন্তু দশজনের ব্যাপারে এক পা এগোলে দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে না।

দশজনের ভালোমন্দ তো ছেলেখেলা নয় যে দায়িত্ব এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে ভালো করতে আসরে নামা যাবে।

নাম কেনা যাবে সস্তায় !

সাধনা তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে বলে, দ্যাখো, একার বুদ্ধিতে কিছু করা আমার মত নয়। মিটিং ডাকার কথাটা প্রভাতবাবুদের বলা তোমার উচিত হয়নি। আগে পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর ভালো মনে করলে জানালেই হত। তুমি হুট করে মিটিং ডাকার দায়িত্বটা নিয়ে বসলে !

তুমি থামো। দোহাই তোমার !

কেন, অন্যায় কথাটা কী বললাম ?

অন্যায় কথা বলোনি। আমায় একটু রেহাই দাও।

মেজাজ বিগড়ে গেছে রাখালের ! তার দায়িত্বের কথাটা সাধনা মনে পড়িয়ে দিয়েছে বলে নয়—মনে পড়িয়ে দিয়ে সমালোচনা জুড়েছে বলে। চুপ করে থাকলে রাখালের রাগ হত না। জের টেনে উপদেশ দিতে আরম্ভ করায় সেটা অসহ্য হয়ে উঠেছে রাখালের।

কারণ, সাধনার কথাগুলি যেমন ঠিক, তেমনি বেঠিকও বটে। এ কথা সত্য যে একার বুদ্ধিতে কাজ করা ভালো নয়— কিন্তু তাই বলে কখনও কোনো অবস্থায় কেউ কোনো ব্যাপারে নিজের বুদ্ধির দায়িত্ব নেবে না, তাহলেই বা চলে কী করে ?

দায়িত্ব যদি সে নিয়ে থাকে, নিয়েছে। সে জন্য এত সমালোচনা করা ও উপদেশ ঝাড়াব দরকার কী সাধনাব ? এই হল রাখালের বাগের কারণ।

সবশা মনটাও তার ভালো ছিল না। শরীরটাও ছিল খুব শ্রান্ত।

রান্নাঘবে হেঁশেল গুছানোই ছিল। তবু সেখানেই যায় সাধনা। আর কোথাও গিয়ে একটু একা হবার জায়গা তার নেই।

সে শুধু ছোটো নয়। রাখালও তাকে ছোটোই ভাবে। আজ তার চরম প্রমাণ মিলেছে। ঘবসংসার বা ব্যক্তিগত সুখদুঃখ স্বার্থের কথা নয়। কলোনির মানুষগুলি সম্পর্কে তার আগ্রহেব খবর বাখাল রাখে। ওদের ভালোমন্দেব প্রশ্ন নিয়ে ঘরোয়াভাবে তার সঙ্গে আলাপ করতে রাখাল নারাজ নয়– শুধু এ প্রশ্ন কেন, দাম্পত্য আলাপ-আলোচনার স্তরে দেশবিদেশের সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে রাখালের আপত্তি হয় না।

কিন্তু কলোনির ওই মানুষগুলির বাস্তব প্রত্যক্ষ সমস্যা নিয়ে দাম্পত্যালাপের বদলে সমালোচনা ও পরামর্শ শুরু করামাত্র ছোটো মুখে বড়ো কথা শুনেই রাখালের মেজাজ খিঁচড়ে গেছে।

প্রভাত ও বামাচরণকে সরাসরি ঘরে এনেছিল বলে রাখাল বিরক্ত হয়েছিল। ভেবেছিল, মেয়েমানুষের আর কত বুদ্ধি হবে ! বিরক্ত হয়েছিল কিন্তু রাগ করেনি। এখন সাধনা বুঝতে পারে রাখালের রাগ হয়েছিল তখন যখন সে যেচে মাথা গলিয়েছিল তাদের আলোচনায়, সবাসরি প্রভাতকে প্রশ্ন করেছিল, তর্ক জুড়েছিল।

আরও একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে সাধনার কাছে।

পাড়ায় এত লোক থাকতে প্রভাতেরা তাদের ঘরে এসেছে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে— আশার কাছে এ জন্য রীতিমতো সে গর্ববোধ করেছিল।

গর্ব সে একাই বোধ করেনি।

রাখালের কাছেও এ একটা স্মরণীয় ঘটনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নেতা হিসাবে গণ্য হবার অভিমানের স্বাদ পেয়েছে রাখাল—প্রভাত ও কলোনিবাসীদের সংঘাতের একটা মীমাংসা করার দায়িত্ব পেয়ে সে সুখী বই অসুখী হয়নি।

তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে সে ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল। আসলে একটা জটিল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার জন্য রাখালের দুশ্চিন্তা জাগেনি। কীভাবে সে কী ব্যবস্থা করবে এ সব কথাই সে ভাবছিল গভীরভাবে।

দুর্ভাবনায় নয়, এই ভাবনায় ক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল তার মুখ।

এ ব্যাপারে রাখাল এগিয়ে যাবে। কিন্তু তার উপদেশ ও পরামর্শ শুনতে সে রাজি নয়।

অথচ কাজে রাখাল সাধনার উপদেশ অনুসারেই চলে। সাধনা তাকে অন্যের সাথে পরামর্শ করতে বলেছিল এটা অবশ্য খেয়াল না রেখেই।

নিজেই সে হিসাব করে। এবং হিসাব করে পরদিন সকালে যায় সুমতির কাছে।

সুমথ তখন সুমতির কাছে সাধনার সঙ্গে তর্কাতর্কির গল্প করছিল।

সুমতি খুশিতে গদগদ হয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে না বলে রাখাল একটু ক্ষুণ্ণ হয়।

সুমথের উপস্থিতিটা তার পক্ষে বরদাস্ত করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুমতি বলে, আসুন রাখালবাবু। সকালবেলাই যে ?

একটু দরকারি কথা ছিল।

বলে সে সুমথের দিকে বিশেষভাবে তাকাতে আরম্ভ করতে না করতে সুমথ যেন অদৃশ্য হয়ে যায় !

কী কথা বলুন ?

সবকথা খুলে বলার ইচ্ছা রাখালের ছিল না। সুমতিকে মোটামুটি প্রভাতের প্ল্যানের কথা জানিয়ে মিটিং ডাকতে তার সাহায্য চাইবে ভেবেছিল।

কিন্তু সুমতির সঙ্গে পারা দায়।

সে জেরা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকথা জেনে নেয়।

তারপর মন্তব্য করে, ওদের কোনো মতলব আছে। নইলে এ প্ল্যানের কথা অ্যাদ্দিন চেপে রেখেছিল কেন ? ওদের তো নিশ্চয় জানাত, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই তোমাদের তাড়াচ্ছি !

রাখাল বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

তবে মিটিং ডাকার ভার নিলেন কেন ?

সুমতি শুধু প্রশ্ন করেছে। সাধনা স্পষ্ট নিন্দা করেছিল। কিন্তু দুজনের কথার সুর যেন একই !

রাখাল ভেবেচিন্তে বলে, মিটিং ডাকাই তো ভালো? আগে ওদের অন্যরকম মতলব ছিল, সে তো জানা কথাই। জোরজবরদস্তি করে সকলকে ভাগাবার ফিকির ছিল। কিন্তু যাই হোক, সে সব মতলব তো ছাড়তে হয়েছে। এখন সকলের সামনে যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে কারখানা গড়বে, সকলকে কাজ দেবে—খানিকটা করতে হবে নিশ্চয়। একেবারে ফাঁকি দিয়ে যেতে পারবে না।

ওদের বিশ্বাস কী ?

কিন্তু আর কী করার আছে বলুন ? এ ভাবে তবু ওদের খানিকটা বাঁধা যাবে, ওদের নিজেদের কথায়। কিছু না করে পারবে না কলোনির লোকদের জন্য। অন্যদিকে দেখুন, ওদের এ প্ল্যানটা না মানলে ওরা কি ছেড়ে কথা কইবে ? যেভাবে পারে কলোনির লোকদের তাড়াবেই। গুন্ডা লাগাবে, পুলিশ আনবে—

সেই ভয়ে—?

ভয়ে নয়। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে। আপনি আমি প্রাণপণ করেও ওদের কি রাখতে পারব এই জমিতে ? ধরুন আপনি আমি রক্ত দিয়ে ওদের ওখানে রাখলাম, কুঁড়েগুলি টিকিয়ে দিলাম। কিন্তু তারপর ? দু-চারহাত জমিতে হোগলার ঘর তুলে বুনো অসভ্যের মতো ওদের জীবন কাটবে, এটাই কি আমরা চাই ? প্রভাতবাবুর জমিতে এভাবে মাথা গুঁজে থেকেই কি এদের মোক্ষলাভ হবে ? মানুষ হয়েও এ রকম অমানুষের মতো বাঁচার জন্যই কি এরা লড়াই করবে, আর আমরা সেটাই আদর্শ বলে ধরে নেব ?

সুমতি চেয়ে থাকে।

রাখাল বলে, ভিখারিরা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে। ভিক্ষা না দিলে ভিখাবিরা বাঁচবে না, সকলে ওদের ভিক্ষা দিন—এই বলে কি আমরা আন্দোলন করব ? কলোনির ওরা বিপাকে পড়েছে সত্যি। কিন্তু আমরা কি কলোনিটা কোনোরকমে বজায় রাখতে আব সব ভুলে গিয়ে প্রাণ দেব ? এদিকে যে দুর্ভিক্ষে লাখ লোক মরছে ?

সুমতি বলে, আপনি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন।

রাখাল বলে, মাথা আমারও ঘুরছে। রামরাজ্যে হনুমান না হয়ে মানুষ হতে চাইলে মাথা ঘুরবেই।

পাড়ার দু-চারজনেব সঙ্গে রাখাল কথা বলে।

বীরেন ছাড়া বাকি ক-জনেই আপিসগামী মানুষ। একেবারে ঘড়ির কাঁটায বাঁধা জীবন—বাসে দারুণ ভিড় হয় বলে কত মিনিট বাড়তি সময় বিজার্ভ রাখা দরকার তাও হিসাবে বাঁধা। রাখাল সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে, তারাও অল্প কথায় সায় দেয়। রাখাল দায়িত্ব নিয়ে যা করবে তাতেই তাদের সমর্থন আছে।

দোকান বাজাব রেশন ইত্যাদি জরুরি কর্তব্য সারতে হবে আপিস যাওযাব আগে, বিস্তাবিত আলোচনাব সময় নেই ?

রাখাল আর সে রাখাল নেই। আগে সে ভেবে বসত যে সবাই এরা গা বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে চায়। গন্ডগোলে কাজ নেই ! কিন্তু আজ সে জানে যে এরা বড়োই বিব্রত এবং ব্যতিব্যস্ত কিন্তু কেবল সেই জন্য সমর্থন জানিয়ে পাশ কাটিযে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা এটা নয়।

তাকে এরা বিশ্বাস করে। এবা জানে এ ব্যাপারে তার নিজের কোনো স্বার্থ নেই। ভুল সে করতে পারে কিন্তু কোনোবকম মতলব হাসিল কবাব বজ্জাতি তার দ্বারা সম্ভব হবে না।

এটুকু বিশ্বাস যাকে করা যায় না তেমন কেউ এলে এদের রকম যেত বদলে, অগ্রিম ঢালাও সমর্থন জানিয়ে দেবার পবিবর্তে একেবারে অন্যভাবে অন্যভাষায় কথা বলত !

বিনয় যেন প্রায় কৃতজ্ঞতায় গলে গিযে বলে, হ্যাঁ দাদা আপনি একটু লাগুন, হাঙ্গামা-টাঙ্গামা যাতে না হয় দেখুন। আমরা আপনার সাথে আছি।

বাড়িওলা বীরেনের অনন্ত অবসর। সময় কাটতেই চায় না—অতিভোগে প্রায পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভোগশক্তির ভোঁতা মন্থর দিনগুলি কাটানোই তার দারুণ সমস্যা।

রাখালকে সে যেন আঁকড়ে ধবে। খুঁটিয়ে খুঁটিযে সে যেন জানাব চেষ্টা কবে বাখালও যা জানে না, কতরকম যে মন্তব্য করে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

রাখাল শেষে ধৈর্য হারিয়ে বলে, প্রভাতবাবু আর বামাচবণ তো আপনাব সঙ্গে পরামর্শ করে গেছেন দত্তমশাই। আপনি তো সবই জানেন ?

অন্য লোকে লজ্জা পেত কিন্তু লজ্জাশরম সবই ভোঁতা বীরেন দত্তের।

আহাঃ, সেই জন্যেই তো, সেই জন্যেই তো ! ওরা এক রকম বলে গেল বলেই তো জানতে চাইছি আসল ব্যাপারটা কী। আপনি তো আর মিছে কথা কইবেন না ? আপনার স্বার্থ কী ?

ভিজে কাপড়ে বিশ-বাইশবছরের একটি মোটাসোটা মেয়ে এসে বলে, বাবা, আদ্দেক নাইতে নাইতে কল বন্ধ করে দিল।

ক্রোধে লতিকার বিস্ফারিত চোখমুখ—দেহের গড়ন যেমন হোক মুখখানা প্রতিমার মুখের মতো সুন্দর—দিশেহারা রাগে এখন অবশ্য কুৎসিত দেখাচ্ছে। সাবানের ফেনা লেগে আছে গলায় আর কাঁধে-পিঠে।

কে বন্ধ করলে ? ব্যাটাছেলে ?

না। অঞ্জলি। বললে কী জানো ? ওপরের কলে নিজেদের কলে নাইবে যাও—এ সব ট্যাক্‌টিক্‌স আমরা জানি। আমায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কলে বালতি বসালে। ট্যাক্‌টিক্‌স মানে কী বাবা ?

অন্তরীক্ষ থেকে মেয়েলি গলায় মন্তব্য আসে—সকলকে শোনানোর মতো জোর গলায় মন্তব্য : টিপটিপ জল পড়ে কলে, বালতি ভরতে আধঘণ্টা লাগে, উনি নিজেদের কল ছেড়ে আধঘণ্টা ধরে নাইতে এসেছেন। এ সব মতলব আমরা যেন বুঝি নে !

বীরেন সখেদে বলে, বাড়ি বলুন, জমি বলুন, ভাড়া দেওয়া ঝকমারি মশায় ! দেশের আইন হয়েছে তেমনি। যে দখল করেছে তারই দখলিস্বত্ব !

রাখাল হেসে বলে, না মশাই, না। তা হলে তো সত্যিকারের রামরাজ্য হয়ে যেত। জমিটমি সব জমিদার জোতদারেরই আছে—যারা চাষ-আবাদ করে, তারা কি আর দখলিস্বত্ব পেয়েছে জমিতে ? বাড়ি ভাড়ার আইন তো আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে মশায়।

বীরেন দত্ত কথাটা বুঝতে একটু সময় নিতে চায়। তার মোটাসোটা মেয়েটা এতক্ষণ ভিজে কাপড়টা টেনেটুনে লজ্জা করার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করতে করতে ফোঁস করে বলে, আমাদের বাড়ি, বাবা গাঁটের পয়সা খরচ করে বাড়ি করেছে, দূর হয়ে যেতে বললে যায় না কেন ইয়ের ব্যাটাব্যাটিরা ?

কেন যাবে ? ভাড়া তো দিচ্ছে।

ভাড়া চাইনে। দয়া করে দূর হয়ে যাক।

বীরেন দত্ত এতক্ষণে মুখ খোলে, খক্‌খক্‌ করে কাশতে কাশতে হাত তুলে তাদেব বাজে তর্ক থামাতে বলতে বলতে দিশেহারার মতো হঠাৎ উঠে গিয়ে রঙিন কাঁচের আলমারি খুলে কী একটা ওষুধ মুখে পুরে দেয়। আস্তে আস্তে কাশিটা থামে।

কী বলছিলেন কথাটা ? বাড়িভাড়া আইনটা না হলে আমরা বাড়িওয়ালারাই মারা পড়তাম ?

পড়তেন বইকী ! আপনাদের লোভের সীমা নেই, লিমিট রাখতেন না, বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করে ছাড়তেন। ফলটা হত উলটো।

কী রকম ?

মানুষ খেপে যেত। যতটা শোষণ করতে পারছেন তাও পারতেন না। শোষণ করারও রীতিনীতি আছে তো ? একটা সীমা বজায় রাখতে হয়। আপনাদের লাভ ঠেকাবার জন্য নয়, অসম্ভব লোভ করতে গিয়ে আপনারা পাছে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে দেন, সেটা ঠেকাবার জন্য আইন হয়েছে।

বীরেন দত্ত বাঁকা হাসি হাসে।

আপনাদের কী আর বলব মশাই, আপনারা নাকের ডগাটি শুধু দেখতে পান। বলি, লিমিটি বজায় রাখার জন্যই যদি আইন, শুধু বাড়িভাড়ার বেলা এত কড়াকড়ি কেন ? চোরাকারবারের লাভে বুঝি লিমিট লাগে না ? কাপড়ের লাভে ? চিনির লাভে ?

ও সব অব্যবস্থা—

ও সব অব্যবস্থা থাকতে পারে—বাড়িভাড়ার বেলাতেই ব্যবস্থাটা জরুরি হয়ে উঠল। ওই যে বললাম, নাকের ডগা ছেড়ে আপনাদের চোখ চলে না ! বাড়িওলারা যদি লাখপতি কোটিপতি হত, তাহলে আর এ আইনের বালাই থাকত না। মুনাফা যারা লুটছে তারা বাড়িভাড়ার পিত্যেশ করে না। ইয়া বড়ো বড়ো বিল্ডিংয়ে ক-টা প্রাণী বাস করে, ইচ্ছে করলে পঞ্চাশটা ভাড়াটে বসাতে পারে—বসায় ?

লতিকা ফোড়ন কাটে, কেন ওঁর সঙ্গে তর্ক করছ বাবা ? উনিও ভাড়াটে—বাড়িওলাদের খারাপ ছাড়া ভালো ভাবতেই পারবেন না। উনি ভাড়াটাই দেখবেন—বাড়ি করতে কত খরচ হয় সে হিসেব তো ধরবেন না !

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না রাখাল। কলোনির দিকে চলতে চলতে ভাবে, বাড়িওলারা কি মাঝারি আর ছোটো ব্যবসায়ীদের দশায় পড়েছে ? এদিকটা চিন্তাই করা হয়নি একেবারে !

সাধনাকে ঘিরে বৈঠক গড়ে উঠেছে কলোনির অধিকাংশ লোকের আর সাধনার অদম্য সাধ জাগছে রাখালের কিছু করার আগেই প্রভাত আর বামাচরণের চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়ে সকলকে সতর্ক করে দিতে।

কিন্তু মুশকিল এই, চক্রান্তটা কী সে ঠিক জানে না।

সকলে যখন প্রশ্ন করবে সে জবাব দেবে কী ?

রাখালের সঙ্গে প্রভাতদের পরামর্শের কথা উল্লেখ না করে সে তাই ভাসাভাসাভাবে তাদের সতর্ক করে দেয়, সবাই সাবধান থাকবেন কিন্তু। ভাববেন না শুধু গায়ের জোরে আপনাদের ভাগাবার চেষ্টা করবে। নানারকম ফন্দিফিকিরও করবে, ভালোমানুষ সেজে এসে ভাঁওতা দেবে ?

বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করে, শুনেছেন কিছু ?

স্পষ্ট কিছু শুনিনি। ভাসাভাসাভাবে কানে আসছে।

ভুবন বলে, আমরা সাবধান আছি। তবে জানেন তো আমাগো কপাল !

অঘোর বলে, আপনেরা যদি সহায় থাকেন, দুষ্ট লোকের সাধ্য কী কিছু করে ?

রাজু বলে, আপনাগোই ভরসা করি। সরকার কন বড়োলোক কন, কেউ আমাগো পক্ষে নাই।

সাধনা বলে, আপনারা শক্ত থাকবেন, নইলে আমরাই বা কী করব ? এখানকার লোকদের সঙ্গে কোনো কারণে যেন ঝগড়া না হয় খেয়াল রাখবেন। কেউ কেউ ভাবে, আপনারা এসে দুর্দশা বাড়িয়েছেন। না বুঝে অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। ক্ষতি এবা করবে না বিশেষ, তবে মুখে একটু খোঁচা-টোচা দিলে সয়ে যাবেন, এড়িয়ে চলবেন।

হ, ঠিক কথা।

হে রাখাল, একবার তোমার সেই সাধনার রকম-সকম দ্যাখো, এতগুলি লোককে সে কেমন উপদেশ দিচ্ছে শোনো। কোথায় ছিলে কোথায় আছ একবার খেয়াল হোক !

সুমতি, বীরেন আর বিনয়ের সঙ্গে রাখাল এসে সাধনাকে এই অবস্থায় দেখতে পায় কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলকে নিয়ে সে কী রকম জমিয়ে বসেছে এটুকুই তাব নজরে পড়ে, তাব কথাগুলি শুনতে সে পায় না।

রাখাল বিরক্ত হয়েছে বোঝা যায়।

তুমি আবার এখানে কী করছ ?

এঁদের সঙ্গে কথা কইছি।

চটাং করে জবাবটা দেওয়া হয়। রাখালের বিরক্ত হবার জবাবে। এবং সকলেই সেটা টের পায়।

রাখাল অনির্দিষ্টভাবে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে। এখানকার সকলকে একটু ডেকে আনুন, একটা দরকারি কথা আছে।

কয়েকজন যারা বাকি ছিল তারা এলে রাখাল প্রভাত সরকারের বক্তব্যটা তাদের কাছে পেশ করে এবং তারই জের টেনে আপশোশের সুরে শেষ করে, আপনারা নাকি প্রভাতবাবুর মাথা ফাটিয়ে দেবেন বলেছেন ? দেখুন, আমরা আপনাদের হয়ে প্রভাতবাবুকে বলে দিলাম তিনি যেন কোনো হাঙ্গামা না করেন, কিন্তু আপনারা যদি—

তার কথা শেষ হবার আগেই সাধনা মুখ খোলে।

প্রভাতবাবু এঁদের মেরে তাড়াবেন বলেছিলেন, এঁরাও তাই তার মাথা ফাটাবার কথা বলেছিলেন। এঁরা যেচে তাঁকে শাসাতে যাননি।

বিনয় সেন বলে, থাকগে রাখালবাবু, ও কথা আর তুলবেন না।

রাখাল কথাটার জের টানে না। বিস্ময় আর অস্বস্তি মেশানো দৃষ্টিতে সাধনার দিকে চেয়ে থাকে।

সুমতি বলে, আমরা একটা মিটিং ডাকব। প্রভাতবাবু সকলের সামনে তাঁর প্ল্যানের কথা বলবেন, লিখিত প্রতিশ্রুতি দেবেন যে কারখানা আর ব্যারাক তৈরি হলে আপনাদের ফিরিয়ে আনবেন, কাজ দেবেন। আপনারা কী বলেন ?

সহজে কেউ মুখ খুলতে চায় না। খানিক আগেই সাধনা তাদের সতর্ক করে দিয়েছে। প্রভাত হঠাৎ এ রকম ভালো মানুষ হয়ে যাবে এ বিষয়ে এমনিতেই তাদের যথেষ্ট সংশয় জাগত, সাধনা সাবধান করে দেওয়ার ফলে সেটা আরও জোরালো হয়েছে।

ভুবন সাধনাকেই জিজ্ঞাসা করে, আপনে কী কন ?

শুধু তার একার প্রশ্ন হলে কথা ছিল না, সাধনা কী বলে শুনবার জন্য এমন আগ্রহের সঙ্গেই সকলে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে যে রাখালেরা সত্যই থ বনে যায়।

এদের উপর এত প্রভাব সাধনার !

আর সাধনা নিজেকে বোধ করে অত্যন্ত অসহায়।

আমি কী বলব বলুন ? আপনারা ভেবেচিন্তে ঠিক করুন।

সে যে তাদের মঙ্গল করতে চাওয়ায় ফিকিরে নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধি করতে চায় না এটা সকলে বুঝতে পারে, বুঝতে পারে কর্তালি করার সুযোগ দিলেও সেটা সে ঝপ্ করে নিয়ে নেয় না বলে।

তাদের অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিয়ে তাদের উপর কর্তালি করার জন্য কত রকমের কত লোক যে চেষ্টা করছে দিনরাত। দরদি সেজে মাভৈঃ মাভৈঃ বুলি আওড়াচ্ছে !

কাজেই তার মতামত শোনার আগ্রহ সকলের আরও বেড়ে যায়।

বিষ্ণু বলে, আপনে কী মনে করেন কন, তারপর আমরা পরামর্শ করুম।

সাধনা বলে, আমার মনে খটকা আছে। প্রভাতবাবুর কী মতলব জানি না, তবে গোলমাল নিশ্চয় করবেন। এদের একবার তুলে দিতে পারলে আবার ফিরে আসতে দেবেন মনে হয় না।

ঘরের কোণে তর্ক-বিতর্ক নয়, ভেবেচিন্তে রাখাল যা করবে স্থির করেছে এখানে প্রকাশ্যে দশজনের সামনে সাধনা করছে তার বিরোধিতা !

বীরেন বলে, না না, ও রকম মতলব থাকলে প্ল্যানের কথা ঘোষণা করতেন না, লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হতেন না ! তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতেন।

বিনয় আমতা আমতা করে বলে, আমারও তাই মনে হয়। আইনের প্যাঁচে একটু ঠেকেছেন কিন্তু সে জন্য আটকাবে না, শেষ পর্যন্ত পুলিশ এনে উনি আপনাদের তুলে দিতে পারবেন।

বিষ্ণু বলে, না, তা পারবেন না। উকিলের পরামর্শ নিছি।

সাধনা বলে, পুলিশ দিয়ে তাড়াতে পারলে কি প্রভাতবাবু এত প্ল্যান ভাঁজতেন ?

রাখাল বলে, তোমার এ সব কথা বলার দরকার কী ?

সাধনা বলে, আমার যা মনে হয় বললাম।

সুমতি বলে, আমরা খবর নিয়েছি, কারখানা উনি সত্যই করবেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আপনাদের বিষয়ে কথা ঠিক রাখবেন কিনা বলতে পারি না, তবে এখানে কারখানা হবে এটা মিথ্যা নয়।

রাখাল বলে, তাহলে আর কথা কী ? ঝগড়া করে আপনারা টিকতে পারবেন না। প্রভাতবাবুর প্ল্যান আপনারা যদি না মানেন, লোকে আপনাদেরই দোষী ভাববে। তখন প্রভাতবাবু যাই করুন, আপনাদের পক্ষ হয়ে কেউ কিছু বলবে না।

বিষ্ণু ভুবনেরা সাধনার দিকে তাকায়। সাধনা আবার অসহায় বোধ করে।

ভেবেচিন্তে সে বলে, ওটা হিসেব করেই অবশ্য প্রভাতবাবু প্ল্যানটা করেছেন। আপনাদের ভালো করতে চান অথচ আপনারা সেটা মানছেন না শুনলে কিছু লোক বিগড়ে যাবে সত্যি। তাই বলে সবাই যে আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে তার কোনো মানে নেই। প্রভাতবাবুকেও তো জানে সবাই ?

রাখাল আবার বিস্ময় ও অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

সাধনা ভেবেছিল, বাড়ি ফিরে একচোট বেঁধে যাবে রাখালের সঙ্গে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাখাল এ প্রসঙ্গই তোলে না। বোধ হয় সাধনাকে চটাতে সাহস পায় না ! বিরক্ত ও গম্ভীর ভাবটা তার বজায় থাকে।

দুদিন পরে মিটিংটা বসবার আগে সাধনাকে কাপড় বদলাতে দেখে রাখাল প্রশ্ন করে, মিটিংয়ে যাবে নাকি ?

যাব।

বক্তৃতা করবে তো ?

আমায় আবার কবে বক্তৃতা করতে দেখলে ?

আগে দেখিনি, এবার হয়তো দেখব। কোনো কথা পছন্দ না হলে উঠে বলতে আরম্ভ করবে।

দরকার মনে করলে যদি বলিই, তাতে দোষ আছে কিছু ? তুমি কি চাও না আমি বাইরে যাই, কুনোভাবটা কাটিয়ে উঠি ? অন্য মেয়ে যারা সভায় বক্তৃতা দিতে পারে তাদের তো খুব শ্রদ্ধা কর তুমি ! আমার বেলা বুঝি উলটো নিয়ম ?

রাখাল কাবু হয়ে বলে, তুমিও সভায় সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াও না, আমি কি বারণ করছি ? আমি বলছিলাম, পাড়ার দশজনের সামনে আমায় যেন অপদস্থ কোরো না !

সাধনা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, তোমার কথা শুনলে সত্যি রাগ হয় মানুষের। আমি অবশ্য খালি দেখতে যাচ্ছি কী হয়, কিন্তু তোমার মতে সায় না দিতে পারলে তুমি অপদস্থ হবে কেন ?

হব না ? এক সভায় এক ব্যাপারে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে বলছে—

স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে বলছে না ? স্ত্রী তাতে অপদস্থ হয় না ?

আহা, এ মিটিংয়ে তোমার তো বলার কথা নয় ! আমিই কথাটা তুলব।

তাতে কী এল গেল ? তুমি বলবে না আমি বলব সেটাই কি বড়ো কথা ? অতগুলি লোকের ভালোমন্দের কথাটা আসল নয় ?

রাখাল আর তর্ক করে না।

কিন্তু মিটিংয়ে কলোনির মেয়েদের কাছে তাকে বসতে দেখে তার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। সুমতি আর সাধনা ছাড়া পাড়ার মেয়েরা কেউ এ সভায় আসেনি, আসবার কথাও নয় তাদের। সুমতি তাদের কাছে বসতে পারল, কলোনির মেয়েদের গা ঘেঁষে ছাড়া সাধনা বসবার জায়গা খুঁজে পেল না।

ছোটো সভা। পাড়ার কিছু লোক, কলোনির লোক, আর নাগদের কলোনির সমিতির কয়েকজন সদস্য হাজির আছে। রাখাল প্রথমে সভার আলোচ্য বিষয়টি উপস্থিত করে। ছোটোখাটো যেমন হোক, প্রকাশ্য সভাতে দাঁড়িয়ে রাখাল জীবনে এই প্রথম বক্তৃতা দেয়।

নিরপেক্ষভাবে সব কথা বলে ভালোই গুছিয়ে মোটামুটি সে। কিন্তু সাধনার মনে হয়, নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা যেন সে করছে বাড়াবাড়ি রকম। প্রভাতের পক্ষেই যেন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তার অতিরিক্ত নিরপেক্ষতা।

প্রভাত আর তার পরিকল্পনাকে একেবারে আকাশে তুলে দিয়ে বামাচরণ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করে।

শুনে বড়োই রাগ হয় সাধনার।

কে কী ভাববে না ভাববে সে সব কথা তার মনেও আসে না, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে বলে, আমরা প্রভাতবাবুর গুণকীর্তন শুনতে আসিনি। প্রভাতবাবু যে নিজের কথা রাখবেন, পরে গোলমাল করবেন না, তার গ্যারান্টি কী সভায় আগে স্পষ্ট করে বলা হোক। সেটাই আসল কথা।

সভা থমথম করে। রাখালের মুখ লাল হয়ে যায়। আমরা ! শুধু কলোনির লোকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেনি সাধনা, তাদের সঙ্গে যেন এক হয়ে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে দাঁড়িয়েছে !

কোনো লিখিত প্রতিশ্রুতি না দিতে পারলেই প্রভাত খুশি হত, কিন্তু সাধনার জন্যই শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয় না।

প্রভাত বলে, এতগুলি ভদ্রলোকের সামনে আমি কথা দিচ্ছি, তাই কি যথেষ্ট গ্যারান্টি নয় ?

সাধনা বলে, না। মুখের কথা দুদিন বাদে অদলবদল করা যায়। আপনি নিজেই হয়তো ভুলে যাবেন কী বলেছিলেন, বলবেন, আমি এ রকম বলিনি, ও রকম বলেছিলাম। লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে আপত্তি হচ্ছে কেন ?

বামাচরণ লাফিয়ে উঠে বলে, কিছু না, কিছু না ! আপত্তি কীসের ?

পরদিন সকালে দেখা যায় তাদের বাড়ির সদর দরজায় এবং পাড়ার অনেকগুলি দেয়ালে সাধনাব নামে ছড়া কেটে পোস্টার আঁটা হয়েছে রাতারাতি !

বাড়ির কাছে কলোনিতে সুন্দর ছোঁড়া থাকে,
সাধনাদিদি পোষ মেনেছেন, পিরিতের দড়ি নাকে।
রাখাল দাদার আক্কেল গুড়ুম
বাকিটা অশ্লীল !

বাসন্তী বলে, সত্যি আক্কেল গুড়ুম করেছিস ভাই ! কী ধিঙ্গি হচ্ছিস দিন দিন ? পাড়া তোলপাড় হচ্ছে তোর কথা নিয়ে !

কেন ? সুমতি তো হরদম সভা করে বেড়াচ্ছে। আমি একদিন একটা সভায় একটু বলেছি, সবার তাতে টনক নড়ল কেন ?

তুই কী সুমতি ? ওর বিয়ে হয়নি, কলেজে পড়ে, অনেককাল মিটিং করছে, ওরটা সয়ে গেছে সবার। সবাই জানে, ও ওই রকম। তুই ছিলি ঘরের বউ, হঠাৎ একদিন সভায় দাঁড়িয়ে কোমর বেঁধে স্বামীর সঙ্গে লড়াই করলি—চাদ্দিকে হইচই পড়বে না ?

স্বামীর সাথে লড়াই ? আমি তো ঝগড়া করলাম প্রভাতবাবুদের সাথে ?

লোকে বুঝি জানে না রাখালবাবু ওদের দলে ? তাই তো বলছে সবাই যে কাণ্ড দ্যাখো ! দুপক্ষের ঝগড়া, স্বামী নিয়েছে এ পক্ষ বউ গিয়েছে অন্য পক্ষে ! রাখালবাবু চটেননি ?

কথা বন্ধ করেছে।

করবেন না ? তেমন সোয়ামি হলে চুলের মুঠি ধরে পিটিয়ে দিত !

ইশ ! সে দিন আর নেই !

নেই ? তুই হাসালি ভাই। এ পাড়াতেই দু-চারজন মাঝে মাঝে পিটোয় !

এ কথা সে কথার পর বাসন্তী হঠাৎ একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, কলোনির সুন্দর ছোঁড়াটা কে ভাই ?

সাধনাও হেসে বলে, কে জানে ! ওরাও জানে না, তাহলে নামটা বসিয়ে দিত।

কী বজ্জাত, অ্যাঁ ? ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিবি না ?

কেন ছিঁড়ব ? দশজনের পড়তে ভালো লাগলে পড়ুক !

ছড়া পড়ে লোকে যে হাসাহাসি করে না এমন নয়, কিন্তু বেলা নটা নাগাদ দেখা যায় পাড়ার লোকেই একে একে পোস্টারগুলি সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সাধনাদের দরজায় লাগানো পোস্টারটাই বরং ছেঁড়া হয় সবার শেষে !

কয়েকদিনের মধ্যে কুঁড়েগুলি সরে গিয়ে কলোনির জমিটা শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে।

সাধনার মনে হয়, শূন্যতা লেপে যেন মুছে দেওয়া হয়েছে একটা ছবিকে।

কিছুদিন পরে ফাঁকা জমিটাতে তোড়জোড়ের সঙ্গে কারখানা তৈরির কাজ আরম্ভ হলে সে স্বস্তি বোধ করে।

প্রভাত সত্যই কারখানা গড়ছে বলে শুধু নয়। জায়গাটার শূন্যতা ঘুচে গেছে বলেও !

রাখাল কথা বন্ধ করুক, তার নামে ছড়া কেটে পোস্টার লাগানো হোক, পাড়ার মেয়েরা তাকে নিয়ে ঘোঁট পাকাক, একটা প্রায় বৈঠকের মতো ছোটোখাটো সভায় উদ্‌বাস্তুদের পক্ষ নিয়ে তেজের সঙ্গে একটু তর্ক করায় সাধনার কপাল একদিকে গেছে খুলে।

সভাসমিতির পক্ষে তার মূল্য টের পেয়ে গিয়েছে আশেপাশের সভাসমিতির উদ্যোক্তারা।

কয়েকদিন বাদেই প্রকাশ্য সভায় যোগদানের জন্য তাকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়। শ্রোতা হিসাবে নয়, কিছু বলার জন্য।

সুমতির সঙ্গে আসে মধ্য-যৌবনা একটি মহিলা। সাদাসিধে চেহারা, সাদাসিধে বেশ, চোখদুটির শান্তভাবেব জন্য দৃষ্টি ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ধরা পড়ে না।

গলার আওয়াজ ও কথা মার্জিত ও সুস্পষ্ট বলে মিষ্টতাটাও হঠাৎ খেয়াল হয় না।

সুমতি পরিচয় করিয়ে দেয়, ইনি প্রমীলা বসু, আপনার সাথে আলাপ করতে এসেছেন।

নামটা ভালোভাবেই শোনা ছিল। সাধনা রীতিমতো নার্ভাস হয়ে পড়ে। জীবনে সে কখনও নামকরা মানুষের সংস্রবে আসেনি, পুরুষ বা নারী।

নার্ভাস হয়ে সে শুধু বলে, আসুন, বসুন।

সাধারণ আলাপ পরিচয় হতে হতেই সে অবশ্য ধাত ফিরে পায়। এ রকম নেতৃস্থানীয়া মহিলাকে বিনা নোটিশে একেবারে ঘরের মধ্যে পাওয়া অভ্যাস ছিল না বলেই প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিল।

খানিক আলাপ করে প্রমীলা বলে, সামনের রোববার আমরা একটা মিটিং ডাকছি—হাইস্কুলের হলটাতে হবে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখেছেন তো ? এমনিতেই এ দেশে শিশুমৃত্যুর হার কীরকম, একটু দুধটুধ না পেয়ে ছোটো ছেলেমেয়েদের কী অবস্থা এ সব তো আপনার জানাই আছে। তার উপরে আরও কতগুলি বাড়তি কারণ ঘটে একেবারে শেষ করে দিচ্ছে ওদের। যেমন ধরুন, বাঙালি ছেলেমেয়ের রুটি সয় না। কিন্তু চাল কমিয়ে দিয়েছে, বাধ্য হয়ে খেতে হয়। চীন থেকে বিনা শর্তে চাল দিতে চায়, সে চাল নেবে না। দুধ যেটুকু জোটে তাতেও ভেজাল—

প্রায় জানা কথাই সব বলে প্রমীলা। অবস্থা যে কী ভয়ানক বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই কারও জানতে আর বাকি নেই। কিন্তু বিশেষভাবে ছেলেমেয়েদের দিক থেকে সমস্যাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে সামনে ধরে বলে প্রমীলার কথা শুনতে শুনতে সাধনার মনে হয় সব জানা থাকলেও সে অবস্থাটা একেবারেই ধরতে পারেনি।

প্রমীলা বলে, সাধারণভাবে শিশুকল্যাণ আন্দোলন তো চলছেই। এই মিটিংয়ে আমরা বিশেষভাবে জোর দেব—সহজে অবিলম্বে যে সব বিষয়ে প্রতিকার করা যায়। যেমন ওই চালের কথাটা। খাদ্য-সমস্যা নিয়ে দুর্ভিক্ষ ঠেকানো নিয়ে সাধারণ আন্দোলন চলছে—আমরা ও দিকে যাব না। আমরা শুধু দাবি করব, ছোটোদের কার্ডে চালের পরিমাণ বড়োদের সমান করা হোক। এই ধরনের সব আলোচনা। আপনাকে যেতে হবে।

সাধনা জানে তা'ক শুধু মিটিংয়ে যেতেই বলা হচ্ছে, সে তাই সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, নিশ্চয় যাব। শুধু মেয়েদের মিটিং ?

না, পাবলিক মিটিং। তবে মেয়েরা যাতে বেশি সংখ্যায় যান সে চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনাকে কিছু বলতে হবে।

মিটিংয়ে ? কী যে বলেন ! আমি কি বক্তৃতা দিতে জানি ?

বক্তৃতা কেন দেবেন ? শুধু বক্তৃতায় আসর জমিয়ে ঘরে ফিরে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোর দিন কি আছে ? আপনি সোজা ভাষায় আপনার মনের কথা বলবেন।

তাও কোনোদিন বলিনি !

তাতে কী ? আপনি তো বোবা নন, কথা বলতে জানেন !

প্রমীলা হাসে—এই সেদিন একটা সভাতে সদ্য সদ্য গাঁ থেকে এসে গেরস্ত চাষি ঘরের বউ-দশ-বারোমিনিট একটানা বলে গেল। কী চোখা চোখা ধারালো সব কথা ! নাম করা বড়ো বড়ো বক্তার চেয়ে বেশি কাজ হল বউটির কথায়। প্রাণে যখন জ্বালা ধরে যায় সোজা স্পষ্ট কথা বলতে কি আর ট্রেনিং দরকার হয় ?

সাধনা আজকাল চালাক হয়েছে। সে একটু ভেবে বলে, ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

রাখালবাবু ? ওঁকেও যেতে হবে—কিছু বলতে হবে। আমরা ওঁকেও বলেছি।

সাধনা খুশি হয়। রাখাল নিশ্চয় আজ ভালোভাবে তার সঙ্গে কথা কইবে। তাকে আর তুচ্ছ করতে পারবে না। কলোনির ব্যাপার নিয়ে যেচে কথা কইতে গিয়ে সে রাখালের বিরোধিতা করে বসেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তো রাখালের সঙ্গে তার কোনো মতের অমিল নেই। ছোটো ছেলেমেয়েরা ভাত না পেয়ে ভেজাল খেয়ে বিনা চিকিৎসায় অব্যবস্থায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেও চায় রাখালও চায় এর প্রতিকার।

তাছাড়া সে যেচে সভায় যাবে না। তাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে সভায় গিয়ে কিছু বলার জন্য—শুধু সুমতিকে পাঠিয়ে দায়সারা হিসাবে নয়, স্বয়ং প্রমীলা বসু বাড়ি বয়ে এসে তাকে অনুরোধ করে গেছে !

স্ত্রীর এ সম্মানে কি খুশি না হয়ে পারবে রাখাল ?

রাখাল কথা বন্ধ করেছে।

তার মানে এই নয় যে বাড়িতে সে একেবারে বোবা হয়ে থাকে ! সে বাজার করবে সাধনা রাঁধবে, সে ওষুধ এনে দিলে সাধনা সময়মতো ছেলেকে খাওয়াবে, ডাক্তার তাকে নির্দেশগুলি জানিয়ে দিলেও সাধনাই সেগুলি পালন করবে, দু-ঘণ্টা অন্তর থার্মোমিটার দিয়ে ছেলের টেম্পারেচারের চার্ট রাখবে, এক বিছানায় না হলেও এক ঘরে শুয়ে রাত কাটাবে, জ্বরো ছেলেটার কান্নায় বহুবার দুজনের ঘুম ভেঙে যাবে,—একেবারে বোবা হয়ে থেকে কি আর এ সব চালানো যায় !

কথা বন্ধ করেছে মানে একান্ত দরকারি সংসারি কথা ছাড়া একটা কথাও সে বলে না। মিষ্টিকথা দূরে থাক, কড়া কথাও নয় !

সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা, সাধনাকে সে পনেরো দিন ছোঁয়নি !

এটা সংযম নয়। সংঘাতের সাংঘাতিক অঘটন।

ভয়ানক কলহ আগেও হয়েছে। চিরতরে যেন সম্পর্ক ঘুচে যাবে এমন কুৎসিত নিষ্ঠুর কলহ। তখন কেঁদে মুখ ফোলায়নি সাধনা, ঘৃণা আর বিদ্বেষেই মুখ তার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থেকেছে, গম্ভীর নিস্পৃহভাবে নীরবে সে রাতে রুটি বেড়ে খেতে দিয়েছে শ্রান্ত ক্ষুধার্ত রাখালকে। রাখালও তীব্র বিতৃষ্ণায় নিঃশব্দে খেয়ে উঠে খাটে বসে একটা সিগারেট টেনে মশারি ফেলে শুয়ে পড়েছে এবং হয়তো বা ঘুমিয়েও পড়েছে।

এ রকম কলহের পর সাধনা কিছু খেত না, জোরালো খিদে পেলেও খেত না। কারণ দুর্ভিক্ষ এসে গেলেও সে তো আর সত্যিসত্যি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েনি—রাত্রে অনশন ধর্মঘট করবে ভেবেই কি বিকালে রাখাল ফিরবার অনেক আগেই রুটি সেঁকতে সেঁকতে সে তিন-চারখানা রুটি বিনা উপাদানে খেয়ে নিত ?

না খেয়ে হেঁশেল গুছিয়ে সে ঘরে গিয়ে মেঝেটা আরেকবার ঝাঁট দিয়ে শুয়ে পড়ত। এবং বিশ্বাস করা কঠিন হলেও সত্যসত্যই ঘুমিয়ে পড়ত !

মাঝরাত্রে রাখাল এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে বলত, মেঝেতে শুয়েছ যে ? ঠান্ডা লাগবে না ? অসুখ করবে না ? বিছানায় এসে শোও।

রাখাল তাকে ডেকেছে বিছানায় গিয়ে শুতে এবং সেও বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়েছে। এবং তারপর কল্পনা করাও অসম্ভব হয়ে গিয়েছে যে রাখাল নামক পুরুষ এবং সাধনা নামক নারীটির মধ্যে সেইদিন কোনো কারণে মনোমালিন্য হয়েছিল !

দুজনে যেন চিরদিনই একদেহ একপ্রাণ !

সকালে অবশ্য তারা স্বীকার করেনি রাত্রে দুজনের কোনো বিবাদ ছিল না। গম্ভীর মুখেই রাখাল বাজার এনে দিয়েছে এবং ঘৃণায় বিদ্বেষে বিকৃত মুখ নিয়েই সাধনা রান্না করেছে।

তবু তখন তাদের ঘৃণা রাগ বিতৃষ্ণা যেমন সত্য ছিল তেমনি সত্য ছিল ও সব নিয়েও সারাদিন ঘরসংসার চালিয়ে যাওয়া এবং রাত্রে সব সমস্যা পরদিনের জন্য ধামাচাপা দিয়ে রেখে অভ্যস্ত মিলনে একাত্ম হওয়া।

এবার প্রায় পনেরো দিন দিনের বেলা তারা বিবাদ এবং পরস্পরকে ঘৃণা করার পাটটা বজায় রেখে এসেছে বেশ খানিকটা নিয়মতান্ত্রিক ভদ্রতা ও উদারতার ঠাট দিয়ে, কিন্তু রাত্রে তারা জেগেছে ঘুমিয়েছে পরস্পরকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে !

খোকার জ্বর বলেই সাধনা যেন সেই অজুহাতে নতুন একটি শয্যা সৃষ্টি করেছে যুদ্ধের এমার্জেন্সিকে প্রাধান্য দিয়ে। মেঝেতে মশারি সমেত সে শয্যায় রাখালের যেন প্রবেশ নিষেধ।

রাখালও যেন তাদের বহু বছরের পুরানো বাসরশয্যার খাটে শুয়ে সাধনার প্রবেশ নিষেধ ঘোষণা করে গাঢ় ঘুমের দুর্ভেদ্য বাঁধ রচনা করেছে প্রতিরাত্রে।

শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। জ্বরে কাতর ছেলেটা কেঁদে ঘর ফাটিয়ে দিলেও তার ঘুম ভাঙে না !

আগে ছেলের কান্নায় যে বারবার জেগে যেত, সাধনার সামান্য কাশির শব্দে যার ঘুম ভেঙে যেত, সে আজ চৌদ্দ-পনেরোটা রাত যেন বোমা ঠেকানো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে।

এ সংযম সে পেল কোথায় ?

শুধু তাই নয়।

তার সম্পর্কে অদ্ভুত বৈরাগ্য আর গাঢ় ঘুম ছাড়াও আরেকটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে।

মাঝে মাঝে রাত্রের খাওয়াটা বাদ যাচ্ছে রাখালের !

আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর কখনও ঘটেনি। বাইরে নেমন্তন্ন থাকলেই কেবল রাত্রে বাড়িতে খাওয়াটা বাদ যেত রাখালের, তার জন্য রান্নাই হত না। আগে থেকে কিছু জানা নেই, হঠাৎ কোনো যোগাযোগ ঘটে রাত্রির ভোজনটা জুটে গেল—এটা ঘটত কদাচিৎ।

এবারকার মনান্তরের পনেরো-ষোলোটা দিনের মধ্যে এটা ঘটেছে সাতবার। গোনা গাঁথা হিসাব আছে সাধনার।

রান্না হয়েছে তার জন্য। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে সে জানিয়েছে যে খাবে না।

আজও ফিরে এসে জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সে বলে, আমি খেয়ে এসেছি।

ঘুমে আর শ্রান্তিতে তার ঢুলুঢুলু চোখ দেখে সাধনার মনটা হঠাৎ কেমন করে ওঠে, মমতার যেন বন্যা বয়ে যায় তার হৃদয়ে।

প্রমীলার কথা শুনে আজ সে মিটমাটের আশা পোষণ করছিল কিনা, বোধ হয় সেই জন্য !

সব ভুলে যায় সাধনা। হাসিমুখে বলে, জানো রোববারের সভায় আমাকেও যেতে বলেছে। প্রমীলা বসু নিজে—

বলতে বলতে একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় রাখালের। রাখাল মুখ ফিরিয়ে নেয়। খানিকটা তফাতে সরে যায়।

পক্ষাঘাতে সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে যায় সাধনার। যেভাবে দোল খায় পায়ের নীচের পৃথিবী, কী করে যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে ভেবে পায় না।

তবু জোর করে সাধনা নিজের মনকে বলে, সে নিশ্চয় ভুল করেছে ! রাখালের মুখে সে গন্ধ নয়। নিজে সে ঠিক বুঝতে পারেনি।

কিংবা রাখাল হয়তো কোনো ওষুধ খেয়েছে—ডাক্তারের নির্দেশমতো। কথা বন্ধ, অসুখ হলেও রাখাল তো তাকে জানাবে না। ওষুধটার জন্যই গাঢ় ঘুমও হচ্ছে রাখালের।

যন্ত্রের মতো রান্নাঘরে গিয়ে রুটি নিয়ে দুখানা কোনোরকমে খায়, হেঁশেল তুলে রান্নাঘর বন্ধ করে উঠানে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের মতোই জ্যোৎস্নায় ভাসানো আকাশের দিকেও চোখ তুলে তাকায়।

তারপর ঘরে যায়।

রাখালের তখন নাক ডাকছে।

রুগ্ণ ছেলেটা ক্ষীণস্বরে কাঁদছিল। তাকে উপেক্ষা করে সাধনা খাটের দিকে এগিয়ে যায়।

তখনও সে ভাবছে, সন্দেহ মিটিয়ে নেব ? না, সংশয়টুকু আঁকড়ে থাকব ?

কিন্তু তা তো আর হয় না। স্বামীর মুখে মদের গন্ধ পেয়ে নিজে ভুল করেছি মনে করে কতক্ষণ আর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যায় ?

যেন আত্মহত্যা করছে এমনিভাবে সে ঝুঁকে পড়ে রাখালের মুখের উপর !

এতখানি প্রত্যক্ষ নির্ভুল পরীক্ষার অবশ্য কোনোই দরকার ছিল না। মশারি তুলতেই রাখালের নিশ্বাসের গন্ধ বেশ ভালোভাবেই তার নাকে গিয়েছিল।

গা গুলিয়ে বমি আসে। বাইরে ছুটে গিয়ে সাধনা যা কিছু খেয়েছিল সব বমি করে ফেলে।

অনভ্যস্ত পদার্থটা একটু বেশি পান করে ফেলায় রাখালেরও আজ বমি আসছিল। তার নিশ্বাসে পদার্থটার গন্ধ শুঁকেই সাধনা বমি করে ফেলে।

আশা ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলে, কী হয়েছে ভাই ? বমি করছ কেন ?

সঞ্জীবও উঠে এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছে দেখা যায়। ওর নেশা ভালো ভালো জিনিস খেয়ে দামি দামি জামা পরে সিনেমা থিয়েটার দেখে সুখে থাকার জন্য ঋণ করে গোল্লায় যাওয়া।

আর সংঘাতের জাঁতাকল থেকে ত্রাণ পাবার আশায় রাখাল ধরেছে নতুন নেশা।

বমি করেছে। কাজেই দু-একমিনিট কথা না বলাটা বেখাপ্পা হবে না। তাকে দম নিতে হবে তো।

সেই অবসরে সাধনা একটু ভেবে নেয়।

আশার ব্যাকুল প্রশ্নের জবাব তার ঠোঁটের ডগায় ঠেলে এসেছিল : তোমার মতো আমারও বরাত খুলেছে ভাই !

কিন্তু জবাবটা সে ঠেকিয়ে রাখে। এইমাত্র টের পেল রাখাল মদ খেয়েছে। যা ছিল অসম্ভব তাই সম্ভব হয়েছে। যা ছিল কল্পনাতীত তাই বাস্তব হয়েছে। আরও হয়তো কত কিছু জানবার বুঝবার ভাববার থাকতে পারে এ বিষয়ে।

হয়তো রোজ খায় না, আজ কোনো বিশেষ কারণে রাখাল মদ খেয়েছে।

মদ মেশানো ওষুধও তো থাকে। খোকা হবার পর সেও টনিক খেয়েছিল মদ মেশানো।

এ রকম একটা ধাক্কা খেয়ে তার তো এই অবস্থা। এখন তার এমন কিছু বলা উচিত কী আশার পরে দরকার হলেও যা ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না ?

অসম্ভব যখন সম্ভবই হয়েছে, তার কি উচিত নয় আগে ভেবে দেখা কী করে এটা হয় ?

রাখালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সভায় দাঁড়িয়ে সে কথা বলেছে, তার মতের বিরোধিতা করেছে, প্রভাতকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেছে, আরেক সভায় কিছু বলার নিমন্ত্রণ জানাতে প্রমীলার মতো মানুষ বাড়ি বয়ে এসেছে, রাখাল মদ খেয়েছে বলেই তাব কি আত্মহারা হওয়া উচিত ?

মদ খেয়েছে কিন্তু মাতাল তো রাখাল হয়নি ?

মুখের গন্ধ ছাড়া তো টেরও পাওয়া যায়নি সে মদ খেয়েছে !

আশা ব্যাকুল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে না এলে আজ রাত্রেই সাধনা কত কী পাগলামি করত কে জানে। আশাকে সব বলে ফেলার ঝোঁকটা সামলাতে গিয়ে সে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা খুঁজে পায়।

ভিতরে তার যাই হোক, বাইরে নিজেকে সংযত রাখে অনায়াসে।

আশাও অবশ্য শুধু প্রশ্ন করেই দাঁড়িয়ে থাকেনি, ছুটে গিয়ে এক ঘটি জলও এনেছিল।

আশা আবার জিজ্ঞাসা করে, কী হল ভাই ?

মুখ ধুয়ে একটু জল খেয়ে সাধনা শান্তভাবে বলে, কী জানি, গা-টা কেমন গুলিয়ে উঠল।

রাখালবাবু ফেরেননি ?

খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে।

খুব শক্ত ঘুম তো রাখালবাবুর !

কানের কাছে মুখ এনে আশা চুপিসারে প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার ? আবার নাকি ?

সাধনা বলে, যাঃ ! অত বারবার খায় না !

গলা একটু উঁচু করে সঞ্জীবকেও শুনিয়ে কৈফিয়ত দিয়ে বলে, কৃমির জন্য বোধ হয়।

সঞ্জীব এগিয়ে এসে বলে, কৃমিই হবে। বেশি রুটি খেলে ভীষণ কৃমি হয়। শ্যামবাবু বলেছিলেন, রুটি খেতে আরম্ভ করার পর বাড়িসুদ্ধ সকলে মাসে দুবার করে কৃমির ওষুধ খাচ্ছেন।

সাধনা প্রশ্ন করে, আচ্ছা সঞ্জীববাবু, অ্যালকোহল খেলে নাকি কৃমি মরে যায় ?

সঞ্জীব বলে, কী জানি, বলতে পারছি না। কৃমির জন্য ভিন্ন ওষুধ আছে জানি।

রুটি খেয়ে খেয়ে আমারই বমি হল। ছোটো ছেলেমেয়েরা কী করে রুটি খেয়ে সহ্য করে মাগো !

রাত্রি প্রভাত হবেই। যেমন রাত্রিই হোক।

সকালে প্রথামতো সাধনা রাখালকে চা আর খাবার দেয়—মুখ হাত ধুয়ে রাখালও প্রথামতো রান্নাঘরে একটা আস্ত ইঁটকে পিড়ি করে প্রাতরাশ খেতে বসে।

প্রথায় একটু তারতম্য করেছে সাধনা। রাখাল ঘুম ভেঙে উঠবার আগে পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে এগারো পয়সার এক ছটাক নিরামিষ গাছগাছড়াগত ঘি মুদি দোকান থেকে আনিয়ে বাসি রুটির বদলে দুখানা পরোটা ভেজে দিয়েছে রাখালকে।

রাত্রে রাখাল খায়নি। তার ডিমটাও গরম করে দিয়েছে—ঝোলটা নিজেই চেখে পরীক্ষা করে দেখেছে টক হয়ে গিয়েছে কি না।

রাখাল ডিম আলু ঝোল সব কিছু দিয়ে পরোটা খেতে খেতে বলে, ডিমে আবার আলু দাও কেন ? আলুর সের কত হয়েছে জান ?

সাধনা চুপ করে থাকে। রাখাল দোকানে চলে যাবার পর নিজের ধৈর্যশক্তির জন্য সে গর্ব বোধ করে।

শেষ বোঝাপড়া করে ফেলার অদম্য সাধকে সে আজ অসীম সংযম দিয়ে দমন করেছে !

মন সে ঠিক করে ফেলেছে রাত্রেই। রাখালের সঙ্গে আর নয়। এবার চুকেবুকে যাওয়াই ভালো !

কোথায় যাবে কী করবে তাও সে ঠিক করে ফেলেছে রাত্রেই। কলোনির লোকেরা যেখানে সরে গিয়ে নতুন কুঁড়ে তুলেছে সেখানে ওদের সাহায্যে একটি কুঁড়ে বেঁধে বাস করবে। মান অভিমান বিসর্জন দেবে। পেট চালাবার জন্য একমাত্র দেহ বিক্রির উপায়টা ছাড়া যে কোনো উপায় মাথা পেতে নেবে।

সকালে সে তার সিদ্ধান্ত বাতিল করেনি। বোঝাপড়াটা শুধু কয়েকদিনের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে।

রাখাল যে কী করে মদ ধরতে পারে এই অবিশ্বাস্য দুর্বোধ্য ব্যাপারটা সে কয়েকদিন একটু বুঝবার চেষ্টা করবে।

হয়তো এটা নিছক দুদিনের একটা পরীক্ষা রাখালের, —খাপছাড়া হলেও হয়তো বাখাল খেয়ালের বশেই নেশা করার অভিজ্ঞতাটা যাচাই করে দেখছে। হয়তো ব্যাবসার জন্য—লাখ টাকা করার নতুন স্বপ্নটা সফল করার জন্য—অনিচ্ছা সত্ত্বেও কারও সঙ্গে মদটা দু-চারদিন বাধ্য হয়ে গিলতে হচ্ছে রাখালের।

কিংবা হয়তো তার জন্যই মদ খাচ্ছে রাখাল ! তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েও এক বাড়িতে পরের মতো বাস করার চাপটা হয়তো অসহ্য হয়ে উঠেছে রাখালের পক্ষে, তাকে বাতিল করে এক ঘরে রাতের পর রাত কাটানো অসাধ্য ও অসম্ভব হয়ে পড়ায় উন্মাদের মতো হয়তো সে এই উপায় অবলম্বন করেছে। মদ খেয়ে এসে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমানো যায়, সাধনার অদম্য আকর্ষণ ঠেকানো যায়, তার কাছে নত হতে হয় না !

এটাই যদি কারণ হয় রাখালের মদ খাওয়ার, তাহলে অবশ্য শেষ বোঝাপড়ার সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দিতেই হবে সাধনাকে।

পুরুষ মানুষ দু-একদিন মদ খেলে তার জাত যায় না। সোজাসুজি খোলাখুলিভাবে বাইরেই হোক বা বাড়িতে তার সামনেই হোক—রাখাল দু-একদিন মদ খেলে সেটা তুচ্ছ করার মতো উদারতা সাধনার আছে।

কিন্তু তার জন্যই যদি রাখাল মদ ধরে থাকে, তবে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্যরকম। দু-একদিন নয়, নিয়মিতভাবে নেশারই বিকৃত তৃষ্ণায় রাখাল যদি মদ খেতে শুরু করে থাকে—তবু তাকে ক্ষমা না করে উপায় থাকবে না সাধনার।

শোধরাতে পারবে কী পারবে না সে ভিন্ন কথা। তারই জন্য মাতাল হয়ে থাকলে মাতাল স্বামীর ঘর সাধনাকে করতেই হবে !

অবশ্য, তারই জন্য রাখাল এই মারাত্মক কাণ্ড শুরু করেছে কিনা সাধনা তা জানে না। রাখালের মদ খাওয়ার কোনো সঠিক মানেই ঢুকছে না তার মগজে। কয়েকদিন ধৈর্য ধরে রাখালের এই নতুন ব্যাধির মানেটা বুঝবার চেষ্টা তো অন্তত করতে হবে সাধনাকে।

মশা রক্ত শোষণ করে রক্তে রেখে যায় ম্যালেরিয়া—শোষক সমাজকে শুষে রেখে দেয় বেকারত্ব ইত্যাদির অভিশাপ। এই তো সেদিন সাধনা রাখালের বেকারত্বকে ব্যাধি বলে ভুল করেছে, অনেক অন্যায় করেছে। পরে নিজের ভুল বুঝে নিজেকে অনেক ধিক্কার দিয়েছে সে জন্য।

রাখালের বেকারত্বের ব্যাধিটাও ছিল তার কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার। রাখাল বেকার হয়েছে এটা যেন ছিল রাখালেরই অপরাধ, এত লোকে চাকরিবাকরি করছে তবু রাখাল কোন যুক্তিতে বেকার হয়—এই ছিল তার বিচার !

পাড়ার অনেকেই মদ খায় না রাখাল কেন মদ খাবে—এ রকম সিধে বিচাব করে শেষ সিদ্ধান্ত কবা আজ অসম্ভব হয়ে গেছে সাধনার পক্ষে।

বাসন্তীকেও ক-দিন খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

সাধনা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, মেয়েমানুষের যন্ত্রণার কি অন্ত আছে ? মানুষটার রকম-সকম সুবিধে লাগছে না ক-দিন ধরে—কিন্তু কিছু বলছে না মুখ ফুটে। নিজে থেকেই বলবে ভেবে চুপ করে আছি, কিন্তু এবার শুধোতে হবে।

রকম-সকম সুবিধে লাগছে না মানে ?

মানে একটু বেখাপ্পা চালচলন হয়েছে। বাইরে মুশকিলে পড়লে ব্যাটাছেলের যেমন হয়। দোকানে কিছু গোলমাল হয়েছে জানো ? তোমার কত্তা কিছু বলেছে ?

সাধনার মনে একটা প্রশ্ন ঝিলিক মেরে যায়—তাই কি তবে কারণ রাখালের মদ খাওয়ার ? বাইরে কোনো মুশকিলে পড়েছে—কারবারে কাজেকর্মে গন্ডগোল ঘটেছে ? তার জন্য নয় !

কিছু তো বলেনি আমায়। রাজীববাবুর কী বেখাপ্পা চালচলন হয়েছে ?

মন মেজাজ ভালো থাকছে না।

ভাসাভাসা জবাব দিয়ে বাসন্তী যেন কথাটা চাপা দিয়ে দেয়।

নেশা করে রাখাল মরার মতো ঘুমায়। রাজীবের ধাত অন্যরকম, তার জাগে ফুর্তির ঝোঁক। তার ফুর্তির ঠেলা সামলাতে হয় বাসন্তীকে—হাসিমুখে। নেশার খেয়াল সব স্বীকার করে নিতে হয়। নইলে যে কোনো লাভ নেই বাসন্তী তা জানে। রাগারাগি করলে নেশার ঝোঁক ব্যাহত হলে, মদ গিলে রাজীব আর বাড়ি আসবে না—একজনের ঘরে গিয়ে উঠবে যেখানে পয়সা দিয়ে অবাধে ফুর্তি করা যায় !

ও সব বদ খেয়াল রাজীবের কোনোদিন নেই। কিন্তু নেশা করলে কতগুলি পাগলামি তার আসবেই। ঘরে তাকে নিয়ে পাগলামি করতে পেলেই তার চলে।

সে সুযোগ না দিয়ে তাকে নেশা করে বাজারের মেয়েলোকের ঘরে যেতে বাধ্য করার মতো বোকা বাসন্তী নয়।

কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে তো একটা বোঝাপড়া চাই। চুপ করে থাকলে চলবে কেন ?

বাসন্তী বলে, তোমার মুখে রোজ গন্ধ পাচ্ছি। এত বাড়াচ্ছ কেন ? রোজ তুমি মাতাল হয়ে এসে দাপট চালাবে—আমার শরীরটা কি লোহা দিয়ে গড়া ?

সকালে বেলা বাড়লে রাজীবকে খেতে দিয়ে বলে।

রাজীবের কৃত্রিম উন্মত্ততার কোনো সমালোচনাই বাসন্তী করে না। রাজীব নেশার ঘোরে যা বলেছে যা চেয়েছে তাই সই !

মাথা হেঁট করে খায় রাজীব। বিবেক তার এখন অনুতাপে গলে যেতে চাইছে। রাত্রে কীভাবে নির্যাতন করেছে বাসন্তীকে কিছুই সে ভুলে যায়নি। রাত্রে সব সয়ে গেছে বাসন্তী। সকালে তাকে চা খাবার দিয়েছে। কে জানে কাকে দিয়ে কীভাবে মাছ আনিয়ে ঝোল রেঁধে ভাত বেড়ে দিয়েছে দোকানে যাবার আগে।

আপিসি বাবুর বউ নয়। বিড়িপাতার দোকানদারের বউ। তবু যেন আপিসি বাবুদের বউদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে তাকে বাবুর মতো আরামে রাখতে চায়। আঁধার থাকতে উঠে উনানে আঁচ দেয় !

চালতার টক অদ্ভুতরকম ভালোবাসে রাজীব—টক-পাগল মেয়েদের চেয়েও।

চালতার টক পর্যন্ত বাসন্তী রেঁধেছে তার জন্য !

রাজীব বলে, না, টক খাব না।

বাসন্তী বলে, বকলাম বলে ?

না, দাঁত ব্যথা করছে। মাড়ির সেই দাঁতটা।

আজ তবে না গেলে দোকানে ? পুষ্পের মাকে দিয়ে একটা পাঁট আনিয়ে রেখো। রাতে ব্যথা বাড়লে খেয়ো।

রাজীব হেসে বলে, সে জন্য নয় গো—দাঁতের ব্যথার জন্য নয়। তোমার কাছে লুকোই নাকি আমি কিছু ? ভদ্দরলোকের ছেলের সঙ্গে ভিড়ে মোর দফারফা হতে বসেছে। ঝোঁকের মাথায় ক-দিন যা মাল গিলছে রাখালবাবু—

ওমা ! এই ব্যাপার ? রাখালবাবুর সঙ্গে খাচ্ছ !

আর বল কেন। কোনোদিন খেত না, হঠাৎ জোরসে চালিয়েছে। একদিন কামাই নেই।

একটু সামলাতে পারো না ?

হাঃ, ওকে সামলাবে ! বিদ্যেওলি বউ নিয়ে হয়েছে বেচারার মুশকিল ! মাল টানতে টানতে বলে কী জানো ? বলে বউ তো নয়, যেন মাস্টার ! যেন থানার মেয়ে দারোগা। কত লেখাপড়া শিখেছে, কী জ্ঞানবুদ্ধি—তবু কোনো দিক সামলাতে পারছে না। মানুষটা ভেঙে যাচ্ছে দিন দিন।

লেখাপড়া জানা বাবুদের বড্ড বেশি মান অভিমান। একটু ছুঁলেই যেন ফোসকা পড়ে। একটু বুঝিয়ে বলতে পার না ?

কী করে বুঝাই বলো ? এত জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা, সব জানে বোঝে। মুখ্যু মানুষের কথা শুনবে কেন ?

বাসন্তী তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, মুখ্যু মানুষ ? আমার বাবা মুখ্যু মানুষই ভালো ! বইয়ের জ্ঞান না থাক, কাণ্ডজ্ঞান তো আছে !

রাজীব দাঁতের ব্যথা নিয়েই দোকানে যায়। বাসন্তীও জানে যে দাঁতের ব্যথা তেমন মারাত্মক না হলে দোকানে না যাওয়ার বিলাসিতার মানে হয় না—তাদের পোষায় না ও সব। দোকানে না গিয়ে বাড়ি বসে থাকলে কী দাঁতের ব্যথা রেহাই দেবে, কমে যাবে !

দাঁত যা ব্যথা দেবার দেবেই। ঘরেও দেবে দোকানেও দেবে। দোকানে গেলে বরং রোজগার হবে দুটো পয়সা !

রাখাল দোকানে যাবে বটে। রাজীব না গেলে যে দোকান একেবারে খোলা হবে না এমন নয়। কিন্তু রাখালের উপর অন্য হিসাবে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা এখনও বজায় থাকলেও তার দোকান চালানোর ক্ষমতায় রাজীব বিশ্বাস হারিয়েছে।

সে শুধু যেন নীতি খাটায়। নীতি খাটিয়ে দোকান ভালো চললে খুশিই হত রাজীব। কিন্তু বিড়িপাতা শুখা তামাকের দোকান ! চালানোর নীতির সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না রাখালের বইয়ে-পড়া উচিত-অনুচিতের জটিল অঙ্ক কষে বার করা নীতির !

বামাচরণকে সত্যই কী আর ভক্তি করত রাজীব। লোকটাকে সে বজ্জাত বলেই জানত। কিন্তু তার মুশকিল হল এই যে লোকটা কবিতা লিখতে পারত—কবিতার একটা বই লিখে ফেলা শুধু নয়, সেটা ছাপিয়ে একখানা উপহার দিয়েছিল রাজীবকে।

অগত্যা তাকে ভক্তি করতে হয়েছিল। কবি—ছাপার অক্ষরে ছাপানো বইয়ের কবি ! সে কেমন মানুষ জানবার অধিকার তো নেই বিড়িপাতা শুখার দোকানদার অল্প শিক্ষিত রাজীবের। সাধু সন্ন্যাসী যোগীর মতো কবিও হল আলাদা জগতের মানুষ, উঁচু জগতের মানুষ—লাখপতি কোটিপতি রাজা জমিদারদের বড়োলোকামি উঁচু জাতটার কাছে ঘেঁষা ভিন্ন আরেকটা জগতের মানুষ।

কবিতা লিখে এবং ছাপানো কবিতার পাঁচসিকে দামের একখানি বই তাকে উপহার দিয়ে বামাচরণ বোধ হয় কয়েক বছরে তিন-চারশোটাকার সিগারেট ধারে খেয়েছে তাব দোকান থেকে। 'বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না' কথাগুলি সোনালি অক্ষরে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার কোনো অর্থই রাজীব বুঝতে পারেনি দশ বছরে। বাকি যারা নেবার তারা নেবেই। তাদের ঠেকানো যায় না।

চোরা কাববার চলছে দেশে। একটু সবকারি সুবিধা পেলেই একজন ব্যাবসা বাণিজ্যের নিয়ম-নীতি উলটে দিয়ে মোটা লাভ বাগাচ্ছে। কিন্তু সে ভেবে পাচ্ছে না লাভ টানবে কোথা দিয়ে কীভাবে।

তখন যদি নতুনভাবে লাভ করার কায়দা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য স্বয়ং একজন কবি ছাপানো কবিতার বই দিয়ে তাকে শিক্ষিত মার্জিত কাব্যরসিকের মতন খাতির করে, সে কি ভড়কে না গিয়ে পারে ?

কে জানে। হয়তো তার বিড়িপাতা শুখা তামাকের দোকান করাই ভুল। কালোবাজারি বড়ো ব্যাপারীদের দাপট সইতে হয়েছে বলেই হয়তো সে তেজি কালোবাজারি বাঘের তুলনায় স্রেফ ছুঁচো বনে গেছে !

এই গভীর আত্মগ্লানি বোধ করার সময় এসেছিল কবি বামাচবণ। কবি কি কখনও ছুঁচোকে কবিতার বই উপহার দেয়—এত বড়ো বড়ো মানুষ থাকতে ?

কবির খাতির হতাশার গ্লানি দূর করে সতাই জোর এনে দিয়েছিল রাজীবের মনে। নিজেকে ছোটো মনে করার আপশোশ কেটে গিয়েছিল।

কে বলে সে বাজে মানুষ ?

বামাচরণ ধারে সিগারেট নিতে আরম্ভ করলে সে গোড়ায় বোধ করেছিল আনন্দ !

গুরুদেবকে কিছু দান করার সুযোগ পেলে তার বাবার যেমন আনন্দ হত !

ক্রমে ক্রমে জানা গিয়েছিল বামাচরণের ধারে জিনিস নেবার কৌশলটা। মাঝে মাঝে নগদ দিয়েও সিগারেট কিনত, মাঝে মাঝে পুরানো ধার দু-পাঁচটাকা শোধও দিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যেত বাকির পরিমাণটা তার বেড়েই চলেছে।

কবির কাছে সম্মান লাভের ও আধ্যাত্মিক কথাবার্তা শোনার জন্য কয়েক বছর ধরে এই খেসারত দিয়ে আসতে হয়েছিল রাজীবকে।

রাখালের সঙ্গে নতুন দোকান খোলার পর সে বাদ না সাধলে কবিকে যোগী ভাবার দাম সে আরও কতকাল দিয়ে চলত কে জানে ! তবে বামাচরণ আর নতুন কবিতার বইটই বার না করায়

এবং মোট বাকির পরিমাণটা অত্যধিক হয়ে দাঁড়ানোয়, ভক্তিতে একটু ভাটা পড়তে আরম্ভ করেছিল রাজীবের।

সন্ন্যাসী নতুন নতুন ক্ষমতার পরিচয় না দিলে পুরানো ম্যাজিকে মুগ্ধ ভক্তের মোহ যেমন ক্রমে ক্রমে কেটে যেতে থাকে !

বামাচরণকে সোজাসুজি ধারে সিগারেট দিতে অস্বীকার করায় রাজীব রাখালকেই প্রায় ভক্তি করে বসেছিল !

দীর্ঘদিনের একটা আধ্যাত্মিক বাঁধনের ফাঁস থেকে এমন অনায়াসে যে তাকে মুক্তি দিতে পারে সে তো সহজ সাধারণ মানুষ নয় !

কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই ভক্তি ও আস্থা নষ্ট হয়েছে রাজীবের।

রাখালের বাস্তব-বুদ্ধি কেমন যেন খাপছাড়া। কখনও লোহার মতো শক্ত আর কখনও মাখনের মতো নরম হয়ে সে তার বাস্তববুদ্ধি খাটায়। দু-একবার ঠিকমতো লেগে যায় না এমন নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিক উলটোরকম হয়। যখন শক্ত হওয়া দরকার—যেমন বামাচরণের বেলা সে হয়েছিল—তখন সে হয় নরম আর যখন নরম হওয়া উচিত, যেমন সরকারের লোক নরেশবাবু দোকানে এলে একটু ভদ্রতা করা দরকার—তখন সে হয় শক্ত আর গরম !

লুকনো গাঁজার খোঁজে তাই না সেদিন দোকানে তার খানাতল্লাশি হয়ে গেল !

গাঁজা অবশ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু নরেশবাবুর সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার না করলে পরেরবার গাঁজা যে তার দোকানে পাওয়া যাবে না তার স্থিরতা কী ?

বিনা দোষে লোক ছাঁটাই হয় বলে, দেশে ভাতকাপড়ের অভাব বলে, চোরা কারবার আর দুর্নীতি চলে বলে সরকারের উপর তার ভীষণ রাগ। নরেশ ঘুষ খায় বলে গায়ে তার ভীষণ জ্বালা। বেশ তো—এ সবের প্রতিকার যে ভাবে হয় করবে যাও। একটা দোকান দিয়ে আর দশটা দোকানের মতো চালাবে না, গোঁয়ারতুমি করে দফা শেষ করবে দোকানের, তা বলে দোকান করার দরকারটা কী ছিল ?

মুদিখানা হোক বিড়ির দোকান হোক কিছু লোকের সঙ্গে বাকিতে কারবার করতেই হবে। চাকরেবাবু মাসের শেষভাগে ধার নিয়ে মাসকাবারে শোধ দেয়। এক দোকানে না দিলে অন্য দোকান তাকে বাকি দেবে। পুরানো চেনা খদ্দেরের হাতে কোনো সময়ে টাকা নেই—কয়েকদিনের জন্য বাকিতে চাল চাইলে তাকেও দিতেই হবে।

বাকি দিলে সবটা আদায় হবে না, কিছু টাকা মারা যাবে, এটা হিসাবে ধরে নিয়েই বাকিতে কারবার করতে হয়। এটা সাধারণ চলতি নিয়ম।

নইলে খদ্দের মারা যাবে। অন্য দোকানি বাগিয়ে নেবে।

কিন্তু রাখাল এ নিয়ম বুঝতে চায় না, মানতে চায় না ! কী হওয়া উচিত আর কী হওয়া উচিত নয় শুধু এই হিসাব কষে সে বাস্তব নিয়ম-নীতি উলটে দিতে চায় !

রাখালের জন্য কয়েকজন ভালো ভালো খদ্দের তারা হারিয়েছে।

এদিকে কারবার বাড়াবার জন্য তার মনগড়া অবাস্তব পরিকল্পনা এবং অবাস্তব ঝোঁকটাও ক্রমাগত সামলে চলতে হচ্ছে রাজীবকে।

শুধু চাইলেই যে কারবার হু হু করে বাড়ানো যায় না, সেটাও বাস্তব নিয়মে নির্দিষ্ট রেটে ঘটে, এই সহজ সাধারণ কথাটাও যেন বুঝতে চায় না রাখাল। রাজীবকে ভীরু কাপুরুষ জড়ধর্মী মানুষ মনে করে।

সেটা টের পায় রাজীব। সাধারণ দোকানদার বলে অশ্রদ্ধা টের না পাবার মতো ভোঁতা সে নয় !

রাখাল বলে, আপনি অতিরিক্ত সাবধান। একটু রিস্ক না নিলে উন্নতি করা যায় ?

রাজীব বলে, বাজারটা দেখছেন না রাখালবাবু ? এ বাজারে টিকে থাকা দায়, রিস্ক নেবেন কোন ভরসায় ?

একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে যে !

এই সেদিন তো রিস্ক নিয়েছিলেন, আগের পার্টনারের সঙ্গে। সে একবাব ডুবিয়ে দিয়েছে বলে বুঝি আর সাহস পাচ্ছেন না ?

আপনি বুঝছেন না রাখালবাবু। বিস্ক আমি নিতে যাইনি। সে ব্যাটা কতগুলি ভাঁওতা দিয়েছিল, আমি সেটা ধরতে পারিনি। কেন পারিনি জানেন ? আমার ঘাড় ভাঙবার মতলবে ভাঁওতা দিয়েছিল, কিন্তু মিছে কথা বলেনি। যা বলেছিল সব ও ব্যাটা করতে পারত—আমরা দুজনেই আজ কোথায় উঠে যেতাম। আমাকে ঠকিয়ে সস্তায় কিছু মেরে দেবার কোনো দরকার ছিল না। কত আর মারলি তুই ? প্ল্যানটা খাটালে যে দুজনেই ফেঁপে যেতাম দু-তিনবছরে—হাজারগুণ বেশি জুটত তোর ! কিন্তু মানুষের দুর্মতি হলে সে কি বাঁকা পথ ছাড়া চলে ?

রাখাল সাগ্রহে বলে, ও রকম একটা প্ল্যান করুন না ?

রাজীব মনে মনে বলে, এই রোগেই তো ঘোড়া মরে ! রাতারাতি বড়োলোক হতে না চাইলে বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষটা তুমি এমন বোকার মতো কথা বলো !

মুখে বলে, কী নিয়ে প্ল্যান করব বলুন ? ওর সুযোগ-সুবিধা ছিল—ক্ষমতাওলা লোকের সাথে পর্যন্ত যোগাযোগ ঘটেছিল। সম্ভব অসম্ভব অবস্থা বিবেচনা করে তবে তো প্ল্যান করা চলে ? আমাদের না আছে টাকার সম্বল, না আছে অন্য সম্বল। কী দিয়ে প্ল্যান করবেন ?

বাখালেব মুখে হতাশা ঘনাতে দেখে বাজীবও দমে যায়।

রাখালের সাহায্যেই নতুন দোকানটা খোলা সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু ইতিমধ্যেই রাখালকে সে ভয় করতে শুরু করেছে !

ধাতটা হল ভদ্দবলোকের, চাকরে মানুষেব। খেয়ালের বশে দোকানটাকে সেই আবাব ডুবিযে না দেয় !

বাসন্তী বলে, এ আবার কী ধিঙ্গিপনা লো ? এ সব কী শুনছি ? খুব নাকি কর্তালি শুরু করে কর্তাকে নেশায় ডুবোচ্ছ ?

কার কাছে শুনলি ?

আমি আবাব কার কাছে শুনব, গেবস্ত ঘরের বউ ? যাব কাছে শোনার কথা তাব কাছেই শুনেছি।

কী বললেন তিনি ?

বললেন আপনার গুণপনার কথা—আপনার কর্তাটির কাছে যেমন শুনেছেন তাই বললেন।

সাধনা অধীর হয়ে বলে, কী বলেছে বল না শুনি ভাই ?

বাসন্তী চোখ পাকিয়ে তাকায়, কড়া সুরে বলে, আমার কাছে ন্যাকামি করিস নে ভাই। আমি তো জানি তুই কেমন ব্যবহার জুড়েছিস মানুষটার সঙ্গে ? এই দিনকাল, বাইরে হাজাররকম ঠেলা সামলাতে প্রাণ যায় যায় হয়েছে, ঘরে তুই একটু শান্তি দিস না মানুষটাকে। তোর জন্য আমার ওই মানুষটাকে পর্যন্ত বেশি মাল টানতে হচ্ছে।

মাল মানে মদ, না ? উনিও খান ?

বাসন্তী ছাদের দিকে মুখ উঁচু করে বলে, ভগবান !

মুখ নামিয়ে বলে, সত্যি ন্যাকামি করছিস, না সত্যিসত্যি কথা কইছিস বুঝতে পারছি না ভাই। নইলে আজ তোতে আমাতে শেষ ঝগড়া হয়ে সম্পর্ক চুকে যেত।

সাধনা উদাসভাবে বলে, চুকিয়ে দিলেই হয় সম্পর্ক !

তার এই ভাবান্তর বাসন্তীকে সতর্ক করে দেয়। মনপ্রাণ দিয়ে সখী হয়ে সে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল যে তারা দুজনে একস্তরের জীব নয়। একেবারে উপরতলার মানুষের পদাঘাতে প্রায় তাদের স্তরে নেমে এলেও সাধনা এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে নিছক একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ার বেশি আত্মীয়তা করতে চায়নি।

তাহলেই তো বাসন্তীর মুশকিল। আপন ভেবে যার মঙ্গল করতে সে ছুটে এসেছে, কয়েকটা সহজ বাস্তব কথা যাকে বোনের মতো বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, সে যদি না আপন ভাবে তাকে, তাব প্রাণখোলা সহজ সরল কথা না শুনতে চায়, যুক্তি দিয়ে তর্ক-বিতর্কের ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে মনের কথা বুঝিয়ে বলার শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা-ভব্যতা তো তার নেই !

ওভাবে মনের কথা খুলে বলার চেষ্টা ত্যাগ করে সে অগত্যা ঘটনাটা খবরের কাগজে বিপোর্ট দেওয়ার মতো সোজাসুজি বাসন্তীকে জানাবার চেষ্টা করে, বলে, সন্ধ্যা হতে না হতে তোমার কর্তা ওনাকে মাল খেতে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। উনি তো দশটার আগে দোকান ছেড়ে বেরোবেন না, মিছিমিছি রোজ মালও উনি খান না—তোমার কর্তাটি তাই দোকানে মাল আনিয়ে খান। গোড়ার দিকে গুম খেয়ে চুপচাপ একলাটি খান। তারপর ওনাকে দু-একপাত্র চুমুক দিতে এগিয়ে দেন। এমনি উনি খেতেন না, কিন্তু এভাবে একজন এগিযে দিলে মানুষ না খেয়ে পারে ? তোমার কর্তার মান রাখতে ওনাকেও গিলতে হয়।

সাধনা বলে, সে তো বুঝলাম। আসল কথা বলো।

আসল কথা মানে তোমার কথা তো ? রোজ নাকি তোমার কথা ওঠে। কিছুক্ষণ চুপচাপ মাল টেনে নেশা হলে রাখালবাবু তোমার কথা পাড়েন। কতরকম যে গুণকীর্তন করেন তার নাকি ঠিক ঠিকানা নেই। সে সব যাক, আসল কথা বলেন, তুমি নাকি আর বউ নেই, ও সব পাট তুলে দিয়েছ। তোমার কর্তার মুখে শুনে আমার কর্তাটি যা বলেছে আমি কিন্তু তোমাকে তাই বলছি ভাই !

হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি বলে যাও।

ওই তো বললাম ? তোমার কর্তা নালিশ করেন, তুমি নাকি বউ নেই, একদম স্বাধীন কলেজে-পড়া কুমারী মেয়ে হয়ে গেছ—ছেলেটার দিকেও নাকি তুমি তাকিয়ে দেখ না। তুমি নাকি ইস্তিরি-ধর্ম পালন কর না, একমাসের ওপর কাছে ঘেঁষতে দেওনি বেচারাকে।

সাধনা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, বাঁচালি ভাই !

কী রকম ?

আমিও তাই ভাবছিলাম। আমার জন্যেই কি মদ ধরেছে ? বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তুই আমাকে বুঝিয়ে দিলি, আমারই দোষে বেচারা ছাইপাঁশ খেয়ে গোল্লায় যাচ্ছে !

বাসন্তী গালে হাত দিয়ে পলকহীন বড়ো বড়ো চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে। এতদিন সে যেন একেবারেই চিনতে পারেনি সাধনাকে।

সত্যি অবাক করলি ভাই। তোর বিদ্যাবুদ্ধিকেও বলিহারি যাই। কী দিয়ে মানুষটাকে এতদিন বশে রাখলি তাই আমি ভাবি। তোর গুণে নয়, মানুষটা নিজের গুণে তোর বশ হয়ে ছিল। তোর সত্যিকার চেহারা ধরা পড়েছে, তাই আজ বেচারা মদ খায়।

তার মানে ?

তোর সঙ্গে অমিল হয়েছে বলে মাল খাচ্ছে ভাবছিস ? পুরুষ মানুষের গরজ পড়েছে বঁউয়ের খাতিরে মদ খাবার ! তোর জন্যেই যদি মদ খাবার মতো অবস্থা হয়ে থাকে—অনেক আগে তোকে

লাথি মেরে দূর করে দিয়ে মনের মতো আরেকটা বউ সে আনতে পারত না ? বউ যেন এতই দামি যে ব্যাটাছেলে আরও দু-চারটে বউ পোষার মতো টাকা খরচ করবে, শরীর নষ্ট করবে, একটা বউয়ের জন্য ! কেন নিজেকে বাড়াস ভাই, নিজেকে ভাঁড়াস ? সোজা কথা বাঁকা করে নিয়ে কেন মিছে অশান্তি সৃষ্টি করিস ?

সাধনা মৃদুস্বরে বলে, সোজা কথাটা কী ?

সোজা কথাটা হল, রাখালবাবুর মতো লোক যখন হঠাৎ মদ ধরেছে, এমনিতে নিশ্চয় কিছু হয়েছে মানুষটার, ধাক্কা সামলাতে প্রাণান্ত হচ্ছে। ঘরে কোথায় একটু শান্তি দিবি, ঠিক উলটোটা করছিস—শত্রুতা জুড়েছিস !

কিছু হয়ে থাকলে বলবে না আমায় ?

তেমন ব্যবহার করলে হয়তো বলত। ভালোবাসা থাকলেই পুরুষমানুষ সব সময় সব কথা কি বউকে বলে ? বউকে ভয়ভাবনার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেও অনেক সময় অনেক কথা চেপে যায়। জানার সাধ থাকলে অবিশ্যি পেটের কথা বার করতে কতক্ষণ ?

সাধনা তিক্ত সুরে বলে, সে তুমি পার। তোমাদের সে সম্পর্ক বজায় আছে। আমরা বিগড়ে গিয়েছি একেবারে।

তোমরা বিগড়ে যাওনি। তোমাদের সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটাই হয়েছে মুশকিল। রাখালবাবু আপিস করছেন বিড়ির দোকানে, ঘরসংসার ফেলে বউ মানুষ তুমি বাইরে করছ ধিঙ্গিপনা—এ সব কি আর মিছিমিছি ঘটেছে ? দিনকালটাই গেছে বিগড়ে, তোমরা খাপ খাচ্ছ না। তোমরাও বিগড়ে গেলে তো ভাবনাই ছিল না, দিব্যি খাপ খেয়ে যেতে !

অবস্থা বদলে গেছে। নতুন অবস্থার সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছে না।

এই কথা তাকে শুনিয়ে গেল বাসন্তী।

তার এই অনেকদিনের জানা কথাটা !

এমনভাবে শুনিয়ে গেল যেন আসল অপরাধটা অবস্থার, সব কিছুর জন্য দায়ি পরিবর্তনটা, তাদের খাপ খাওয়াবার অক্ষমতা নয়।

কথাটা সত্য এবং সহজ। বাসন্তী পর্যন্ত এটা ধরতে পেরেছে। মধ্যবিত্ত হিসাবে তাদের জীবনে ভাঙনটা অবশ্যম্ভাবী, নীচের স্তরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাকার তাদের হতেই হবে, কিন্তু সেটা এমন কদর্য কুৎসিত প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই ঘটতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই !

ভাঙনের বাস্তবতা সুখকর হয় না, হতে পারে না, তা জানে সাধনা। মধ্যবিত্তের অনেক মিথ্যা স্বপ্ন ও কল্পনা, বিশ্বাস ও ধারণা, অবাস্তব আবাম বিলাস ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া রীতিমতো যন্ত্রণাদায়ক হবেই।

যদিও ভাঙার সঙ্গে গড়াও চলে, নতুন সম্পর্কের মধ্যে জীবন আরও ছড়ানো ও জমাট হয়, নতুন আশা জীবনের আনন্দ ও সার্থকতার নতুন রূপ চিনিয়ে দেয়।

কিন্তু এতো তা নয়। এ ভাঙনে মিশেছে অকথ্য মিথ্যা ও ফাঁকি, অকারণ কুৎসিত বিড়ম্বনা ! দেশ জুড়ে গায়ের জোরে যেভাবে বিষাক্ত করা হয়েছে জীবনকে, তারাও তার ভাগীদার হয়েছে বইকী !

এই বিকৃত অমানুষিক অবস্থাটা তাদের ভদ্র জীবনে রূপান্তর ঘটাবার জন্য অপরিহার্য ছিল না এবং তাদের ভেঙে নতুন মানুষ করার প্রয়োজনেও এ অবস্থা সৃষ্টি হয়নি !

ভাঙন নয়। এই অবস্থাটাই অসহ্য হয়েছে তাদের। রাখাল শুধু বেকার হয়নি বিনা দোষে, শুধু অর্থাভাবই ঘটেনি তাদের—রাখাল আজ শুধু অনভ্যস্ত উপায়ে জীবিকাই অর্জন করছে না—তখন

যেমন আজও তেমনি ফাঁকি আর ধাপ্পাবাজি দিয়ে টিকিয়ে রাখা বিকারের বিরাট বেড়াজালে তাদের আটক রাখা হয়েছে !

রাখালদের বেকার হয়ে না খেয়ে মরার দশা হয় কিন্তু বেকারত্বের প্রতিকারের বদলে বিরাট তোড়জোড়ের সঙ্গে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলে ভদ্রজীবনের কৃত্রিমতা অবাস্তবতা সম্পর্কে মিথ্যা মোহ। রাখালের মতো ভদ্রলোকদের জীবনের বাস্তবতা যেমনই দাঁড়াক, ভদ্র থাকাই অসম্ভব হয়ে যাক, ভদ্রজীবনের নিছক সাজানো-গোছানো খোলসগুলি, কৃত্রিমতাগুলি, অবাস্তব ভাবাবেগগুলি জীবনের সেরা সম্পদ হিসাবে মহাসমারোহে বাঁচিয়ে রাখা হয় !

তলিয়ে সব না বুঝুক, বাসন্তী জীবনের সহজ নিয়ম মানে। সে তাই টের পেয়েছে জীবনে কত অনিয়ম আমদানি হওয়ায় তাদের আজ কী দশা ! নীচের তলার সাধারণ গরিব মানুষের সবরকম দুর্দশাই আছে, একেবারে না খেয়ে মরা পর্যন্ত চরম দুর্দশা,—কিন্তু মৃত জীবনের ভূতের বোঝা তাদের সইতে হয় না।

তারা যতই পিছিয়ে থাক, সংস্কার ও বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাক, তারা নিজের জগতেই আছে, রুক্ষ কঠোর বাস্তবতা নিয়েই আছে।

সেখান থেকে শিশুর মতো হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোলেও প্রতিদিন এগোচ্ছে।

রাখাল সাধনাদের মতো জরি চুমকি বসানো লাল নীল বাতি দিয়ে সাজানো হাতির দাঁতের কারুকার্য করা কৃত্রিম অবাস্তব মিনার ঘাড়ে বয়ে বেড়ানোর ঝঞ্ঝাট তাদের নেই।

ভদ্রঘরের ছেলে বাধ্য হয়ে কারখানায় খাটছে কন্ডাক্টরি করছে, ফেরিওয়ালা হয়েছে—কিন্তু সেটা যেন জীবনটাকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বাঁচার জন্য নয়, ভদ্রজীবনটাকে কোনোরকমে বাঁচাবার জন্য !

এ দায় নেই বাসন্তীদের। ছলনা চাতুরি নিয়ে নয়, হিসাব করা পলিসি নিয়ে নয়, রাজীবের জ্বর হলে সালসা খাওয়ানোর মতো প্রয়োজনীয় মনে করেই অন্যভাবে তার শরীর মন অসুস্থ দেখলে বাসন্তী অনায়াসে তাকে বলতে পারে : শরীর খারাপ লাগছে ? একটা পাঁট এনে খেয়ে সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ো না !

সোজা কথাটা সে বোঝে। দরকার হলে পাঁট রাখাল খাবেই। মৃত্যুপণ করে চেষ্টা করলে একদিন কী দুদিন হয়তো সে ঠেকাতে পারবে রাজীবকে—তার পরদিন তার মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে রাজীব বাইরে পাঁট খেয়ে আসবে !

অসুখের মতোই এ রকম একটা অবস্থা আসে শরীর মনের। পাঁট না খেয়েও অবশ্য সে অবস্থার প্রতিকার করা যায়। কিন্তু যে অবস্থায় তারা আছে তাতে সেটা সম্ভবপর কোনো প্রতিকার নয়—অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা।

সোভিয়েটে নাকি এভাবে এই কারণে কারও মদ খাবার দরকার হয় না। এ সব উদ্ভট রোগের নাকি মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে সে দেশে।

ভাগ্যবান দেশ। ধন্য দেশ।

কিন্তু বাস্তব জীবন পিষে দমিয়ে দিয়েছে রাজীবকে। এটা কোনও বীজাণু-ঘটিত রোগ নয়, সমগ্র জীবনের মাস-বছর-ঘটিত বাস্তবতার সৃষ্টি করা রোগ।

পাঁট না খেলে রাজীব তিন-ভাগ রাত ছটফট করবে। মদ না খেয়েও মাতালের চেয়ে বেশি আবোল-তাবোল বকবে—শ্যামাসংগীত উলটে-পালটে গাইবে, কপাল চাপড়াবে—শরীর মনের যন্ত্রণায় যেন মদমাতালের চেয়েও কষ্ট পাবে।

পরদিন হয়ে থাকবে নির্জীব প্রাণহীন মানুষ।

তার চেয়ে কী আসে যায় এ সময় একটু খেলে ? শরীর মনের কষ্টটা ভুলে বেলা পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে অনেকটা তাজা বোধ করলে ?

মাসে দু-তিনদিনের বেশি তো আর দরকার হয় না !

যারা নেশার জন্য নিয়মিত খায় তাদের কথা আলাদা। তাদের সাংঘাতিক রোগ। সব দিক দিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনে।

ডেকে আনে কিন্তু সেও তো রোগী ? নীতি কথায় কি রোগ সারে ? বাস্তব লাগসই চিকিৎসা ছাড়া ?

তাই বটে। নইলে কারখানায় প্রাণপাত করে যারা খাটে তাদেরও অনেকে রক্ত জল করা পয়সা দিয়ে কয়েক আউন্স জলমেশানো আধ্যাত্মিক দাওয়াই খেতে যাবে কেন ?

জীবনের বাস্তবতাই এ রোগের জন্য দায়ি।

কী করবে ভেবে পায় না সাধনা।

বেকার রাখাল তাকে ভাইয়ের কাছে পাঠাতে চেয়েছিল। চরম দুরবস্থা বলে সে যেতে রাজি হয়নি। এবার কিছুদিন ঘুরে আসবে ?

কিন্তু কী লাভ হবে তাতে ? তাকে নিয়ে যখন আসল সমস্যা নয় রাখালের, তার জন্য যখন মদ খাওয়া নয়, সে সরে গেলে কী আসবে যাবে রাখালের !

ঘরের অশান্তি থেকে রেহাই পাবে ? আগে হলে এভাবে উভয় পক্ষের অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব মনে করত সাধনা। সেদিন আর নেই। তফাতে সরে গেলে দুজনে যে ধরনের শান্তি পাবে তার দাম খুবই সামান্য হয়ে গেছে তার কাছে।

সে জানে, সম্পর্ক বজায় রেখে দূরে সরে গেলে তুচ্ছ খুঁটিনাটি সংঘাতগুলিই শুধু বাতিল হবে, রাগ দুঃখ অভিমান আর দুশ্চিন্তায় যা পুষিয়ে যাবে শতগুণ !

রবিবার রাখাল জানায়, সে সভায় যাবে না।

আমি যাব বলে ?

রাখাল চুপ করে থাকে।

আমার বাইরে যাওয়া তুমি পছন্দ করছ না কেন ?

পছন্দ অপছন্দের কথা নয়। এক মিটিংয়ে দুজনের যাওয়া উচিত নয়।

কেন ?

তোমার আমার মত মেলে না বলে। আবার একটা কেলেঙ্কারি হবে।

আগেকার সভায় সংঘর্ষ ঘটাবার পর আজ প্রথম তাদের মধ্যে সংক্ষেপে সংসারের দরকারি কথা ছাড়া বোঝাপড়ার কথা হয় কয়েকটা।

সাধনা থেমে না গিয়ে বলে, একটা বিষয়ে মত মেলেনি বলে কি সব বিষয়ে অমিল হবে ?

কোনো বিষয়ে আমাদের মতের মিল দেখতে পাচ্ছি না। তুমি এক রকম ভাব, আমি আরেক রকম ভাবি।

আগে মিল ছিল, নতুন কথা কী এমন ভাবতে আরম্ভ করেছি যে সব দিক দিয়ে অমিল হয়ে গেল ?

ভাবছ বইকী। আসল কথাটাই অন্যভাবে ভাবছ। স্ত্রীর যেটা সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য হওয়া আমি উচিত মনে করি, তুমি তার উলটোটা উচিত মনে করছ। আমার সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক দাঁড় করিয়েছ—

আমি করেছি ? তুমিই কথা বন্ধ করেছ, আমায় এড়িয়ে চলছ, মদ খাচ্ছ। তুমি যা বলবে তাই আমাকে শুনতে হবে, যেমন চাইবে তেমনিভাবে চলতে হবে, এটাই যদি আমার সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য মনে কর—

রাখাল চুপ করে খানিকক্ষণ তার মুখের দিয়ে চেয়ে থাকে।

তুমি বুঝবে আশা করি না। কতগুলি বাঁধা বুলি আর ছাঁকা নীতি শিখেছ, তুমি আর কিছু শুনতেও চাও না, বুঝতেও চাও না। আমার হুকুম মেনে চলবে কী চলবে না, সে প্রশ্নই আলাদা। আগে কি হুকুম মেনে চলতে ? আমি বলছি স্ত্রী হিসাবে তোমার যেটা করা উচিত, নিজে থেকেই করা উচিত। তোমার আমার স্বার্থ এক, এই সোজা কথাটা মানার সঙ্গে আমার হুকুমে চলার সম্পর্ক কী ? আমি বড়ো হলে, টাকা করলে, নাম কিনলে তুমিও সে সব ভোগ করবে, আমি পথের ভিখারি হলে তুমিও পথে বসবে, উপোস করবে। এটা তো অতি সহজ সরল কথা। আমি সুখী না হলে তোমার সুখী হবার সাধ্য আছে ? তুমি বলবে এটা ভাবী অন্যায়, সমাজেব এটা বিশ্রী অনিয়ম, এ রকম ব্যবস্থার জন্যই স্ত্রীকে স্বামীর দাসী হয়ে থাকতে হয। বেশ কথা, আন্দোলন চালাও, অন্যায় অবিচাবেব প্রতিকার কর। কিন্তু স্ত্রী হয়ে থেকে স্বামীর স্বার্থ দেখবে না কোন যুক্তিতে ?

তোমার কোনো স্বার্থের হানি করেছি ? সেদিন সভায় বলেছিলাম বলে তোমার কোনো ক্ষতি হয়েছে ? বরং দেখতেই পাচ্ছ, দশজনের কাছে তোমার আমার দুজনেরই মর্যাদা বেড়েছে।

তোমার বেড়েছে—আমার নয়। লোকে বলছে রাখালবাবুব স্ত্রী না থাকলে প্রভাত ওদের ঠকাত। অর্থাৎ রাখালবাবু ছিলেন বটে কিন্তু তিনি বাজে লোক, তাঁর দ্বারা কিছু হত না।

তুমি উলটো মানে করছ। আমায় ভালো বললে তোমায় বাজে লোক বলা হয না। আসলে, তুমি ভুল করতে যাচ্ছিলে, আমি ঠিক করেছি, তাই তোমার রাগ। তোমায় না বলে লোকে আমায় কেন ভালো বলবে !

তীব্র বিরক্তি আর হতাশা ফোটে রাখালেব মুখে। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে সে বলে, তোমায কিছু বলা বৃথা। তুমি নিজের ভাবনাতেই মশগুল। তোমায় হিংসা কবব আমি ? তুমি যাও না দশটা সভায়, নাম কেনো মর্যাদা বাড়াও। অমি বারণ করছি ? আমি যাব মধ্যে আছি সেখানে মাথা গলিয়ে আমার বিরোধিতা করবে কেন ? দেশে কি আর আন্দোলন নেই, সমিতি নেই, সভা হয় না ? দেশেব লোককে কি অন্যভাবে কেউ ঠকাচ্ছে না ? তোমার মতামতেব স্বাধীনতা আছে, সেটা প্রকাশ কবাব স্বাধীনতা আছে—কিন্তু যেখানে তোমাব স্বামীর মর্যাদার প্রশ্ন সেখানে স্বামীর স্বার্থটাই তুমি দেখবে আগে। সেদিনের সভায় আমার জন্য তোমার মাথাব্যথা দেখা যায়নি, এটাই আসল কথা। আমার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ার বদলে কমে যাক, আমি ছোটো হই দশজনেব কাছে, সে জন্য তোমার এতটুকু মাথাব্যথা নেই।

রাখাল একটু থেমে যোগ দেয়, তুমি ভাবছ একদিনের একটা সামান্য ব্যাপার নিযে বাড়াবাড়ি করছি। সামান্য ব্যাপার নয়। সেদিন আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আমার সমস্ত স্বার্থই তুচ্ছ হয়ে গেছে তোমার কাছে। আমি নাম করব, টাকা করব শুধু এই স্বার্থ নয়—তাহলেও একটু ভরসা থাকত ! আমার বদনাম হলে যে তোমারও লজ্জা, আমি পয়সা না কামালে যে তুমিও উপোস করবে, তাও তুচ্ছ হয়ে গেছে তোমার কাছে। আমি আর স্বামী নই তোমার কাছে। একটা অভ্যাস টেনে চলছ। নিয়ম রক্ষা করছ, এইমাত্র।

সাধনা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তুমি আর স্বামী নেই মানে তোমার জন্য আমার ভালোবাসা নেই ?

ভালোবাসা ? ভালোবাসা আছে কী নেই সে আলাদা কথা, স্বামী-স্ত্রী না হয়েও ভালোবাসা নিয়ে মানুষ একসাথে থাকে। তাদের কথাও আলাদা। আমি বলছি, আমরা স্বামী-স্ত্রী একটা বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক আছে আমাদের। সমাজটা খারাপ হোক, এ সমাজে স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ সম্পর্ক না থাক—সম্পর্কটা তো আছে। এ সম্পর্কের মূল নিয়ম হল—স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থ এক হবে। ছোটোখাটো খুঁটিনাটি স্বার্থ নিয়ে দুজনে হাজার বিরোধ থাক—মূল স্বার্থে তফাত থাকবে না। হাতের বাড়তি টাকাটা দিয়ে

স্ত্রীর একখানা গয়না হবে না স্বামীর একটা শখ মিটবে তা নিয়ে মারামারি হোক—স্বামীর রোজগার বাড়ুক এটা হবে দুজনেরই স্বার্থ।

সাধনা নতমুখে ভাবে।

মনের কথাটা বলবে রাখালকে ? রাখাল আরও বেশি রাগ করতে পারে, আরও বেশি ত্যাগ করতে পারে তাকে, এ আশঙ্কা থাকলেও বলবে ?

রাখাল হয়তো বুঝতেও পারে তার কথাটা। একেবারে তো মূর্খ নয় মানুষটা।

ভেবেচিন্তে বলাই ঠিক করে সাধনা। যে অবস্থায় তারা এসে পৌঁছেছে, খোলাখুলি কথা বলাই ভালো।

টাকার চেয়ে নামের চেয়ে স্বামী মানুষ হিসাবে বড়ো হোক এই স্বার্থটা যদি বড়ো হয় স্ত্রীর কাছে ?

আমি অমানুষ হয়ে যাচ্ছি ? ক-দিন মদ খাচ্ছি বলে ? তোমার জন্যই আমি মদ খাচ্ছি। এ অবস্থা মানুষের সহ্য হয় না।

বাসন্তীর কাছে সাধনা কৃতজ্ঞতা বোধ করে। সহজ মোটা একটা কথা সেদিন সে বুঝিয়ে না দিলে আজ নিজের ভাব-প্রবণতার ফাঁকি নিয়ে সে ফাঁপড়ে পড়ে যেত।

তুমি তাই ভাবছ—কিন্তু স্ত্রীর জন্য কেউ মদ খায় না। তোমার কী হয়েছে আমি জানি না—কিন্তু মদ খাওয়ার জন্য আমায় দায়ি কোরো না।

রাখাল অপলক চোখে চেয়ে থাকে।

সাধনা বলে, তোমায় অমানুষ বলিনি। মানুষ হিসাবে বড়ো হও মানে বলছি না যে গান্ধিজির মতো সাধুপুরুষ হতে হবে। টাকা-পয়সা নাম-যশের চেয়ে দশজনের স্বার্থ তোমার কাছে বড়ো হবে—আমি শুধু এইটুকু চাই।

টাকা করব না ? দেশের লোক খেতে পরতে পায় না, তাই বলে টাকা করে নিজে সুখে থাকার চেষ্টা করা আমার পক্ষে অপরাধ ?

নিশ্চয় না। মানুষের ঘাড় না ভাঙলেই হল। তুমি আমি দশজনের মতো সাধারণ মানুষ—তোমায় অসাধারণ মানুষ হতে বলব কেন ? সব ছেড়ে দিয়ে তুমি শুধু দেশোদ্ধার করতে নামলে ভালো হত, এমন কথা আমি ভাবিও না। আমিও কি ঘরসংসার ফেলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব ভাবছি ? তুমি ভালো জিনিসটি আনলে তৃপ্তির সঙ্গে খাই না ? ভালো কাপড় পরি না ? তবে কিনা দশজনের জন্য যতটা সাধ্য করতে হবে। আগের মতো শুধু নিজেদের নিয়ে থাকলে আমাদের চলবে না।

আমিও তো তাই বলছি। আমি কি নামের কাঙাল, না নেতা হবার শখ আছে আমার ? গা বাঁচিয়ে না থেকে যতটা পারি দশজনের লড়ায়ে এগিয়ে যাব,—তাতেই দশজন আপন ভাববে। সুমথেরা ভুল বুঝে সব গণ্ডগোল করে দেবে টের পেয়েছিলাম বলেই না এগিয়েছিলাম ? অতগুলি লোকের সর্বনাশ হবে বলে ? আগে অনায়াসে এড়িয়ে যেতাম—আজকাল চেষ্টা করেও পারব না। রাতে ঘুম হবে না।

সাধনা জোর দিয়ে বলে, তা হলে তোমার আমার মতের অমিলটা হচ্ছে কোথায় ?

রাখালও সঙ্গে সঙ্গে জোরের সঙ্গে জবাব দেয়, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কেমন হবে তাই নিয়ে।

সাধনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

রাখাল বলে, বাস্তব জগৎ বদলে যাচ্ছে, আমাদের জীবনটা বদলাচ্ছে, তুমি আমি দুজনেও বদলাচ্ছি। আমি চেষ্টা করছি এ পরিবর্তনটার সঙ্গে অন্য সব কিছুর সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলবার,

বাস্তব যতটা বদলেছে, আমি যতটা বদলেছি তার সঙ্গে। যে রেটে বদলেছি তার সঙ্গেও। যেন বাড়াবাড়ি করে না বসি, যেন না ভাবি যে সব কিছু বদলে নতুন হয়ে গেছে বা দু-চারদিনের মধ্যে হল বলে, যেন না ভাবি যে আমিও আর সেই রাখাল নেই—একেবারে অন্য একটা মানুষ হয়ে গেছি। কিন্তু তুমি গা ছেড়ে দিয়েছ, ধরে নিয়েছ যে তুমিও আর সে সাধনা নেই, তোমার জীবনটাও একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। যতটা পরিবর্তন সত্যি ঘটেছে, তুমি সেটাকে কল্পনায় বাড়িয়ে নিয়েছ হাজার গুণ।

একটু ইতস্তত করে রাখাল যোগ দেয়, রাঁধছ বাড়ছ ছেলে মানুষ করছ আমার সেবা করছ কিন্তু ভাবছ যে তোমার আমার যে সম্পর্কটা ছিল সেটা শেষ হয়ে গিয়ে একেবারে নতুন রকম একটা সম্পর্ক হয়েছে। নিজেকে তুমি আমার স্ত্রী ভাবছ না, আমাকে তোমার স্বামী ভাবছ না। মানুষ হিসাবে আমি তোমার অধিকার মানছি না, শুধু অন্যায় আর অবিচার করছি। আমি তোমায় স্ত্রী হিসাবে চাই—সেটা আমার ভীষণ অপরাধ ! তোমায় আগে মানুষ ভাবতে হবে—তারপর তোমার স্ত্রী ভাবা চলবে। আমি যেন তোমায় মানুষ ভাবি না—তোমায় গোরু ছাগল ভেবে এতদিন তোমায় সঙ্গে ঘরসংসার করেছি।

সাধনা চুপ করে থাকে।

সে আরও শুনতে চায় বুঝতে পেরে রাখাল বলে, আমি তোমার মালিক, তুমি আমার সম্পত্তি এটা কি তুমি অস্বীকার করছ ? আমি কি এটা জানি না ? আমি কি কালা যে যারা এই সত্যটা আবিষ্কার করে পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছেন, আমি তাদের কথা শুনতে পাব না ? আমি কি নতুন মার্কিনি দর্শন প্রচারের দালাল যে এ সত্যটা অস্বীকার করব ? আমি রোজগার করে তোমায় খাওয়াই পরাই, আমার ভাড়া করা ঘরে থাকতে দিই—আমি তোমার মালিক বইকী ! খোকনকে খাঁটি দুধ খাওয়ানোর জন্য একটা গোরু কিনে পুষলে আমি তারও মালিক হতাম। তাই বলে আমি কি তোমাকে আর গোরুটাকে সমান করে দিতাম ? আমার সম্পত্তি হলেও তোমাকে মানুষ ভাবতাম না ? মানুষ বলেই তোমায় আমি বিয়ে করেছি, তোমার স্বামী বা মালিক হয়েছি।

রাখাল একটু থামে। সাধনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছে দেখেও তার সংশয় জাগে যে সে তার কথার মর্ম বুঝবে কিনা ! তার নিজের সম্পত্তি, নিজের স্ত্রী—শাস্ত্র এবং আইন যাকে যথেচ্ছভাবে ভোগ করার অধিকার তাকে দিয়েছে—অথচ প্রায় তিন সপ্তাহ সে তাকে স্পর্শ করেনি ! তাকে মানুষ ভাবে বলেই যে তার এই প্রাণান্তকর সংযম—এটুকু কি মাথায় ঢুকবে সাধনার ?

এ যে তার রাগ অভিমান নয়, এতে যে তার বাহাদুরি নেই, সত্যই তাকে মানুষ মনে করে বলে তাকে বাধ্য হয়ে এ সংযম পালন করতে হচ্ছে, এই সহজ সরল কথাটা ?

সাধারণ কলহ বিবাদ হলে আলাদা কথা ছিল। এখনকার অচল অবস্থায় সাধনাকে অপমান করার সাহস তার নেই। সে মানুষ বলেই নেই !

কোন দিক দিয়ে কীভাবে তার প্রতিক্রিয়া আসবে সে জানে না। কিন্তু সাধনা মানুষ বলেই প্রতিক্রিয়াটা যে সাংঘাতিক হবে এটুকু জানে।

ধীরে ধীরে সে বলে, মনুষ্যত্বের দাবি নিয়ে সেন্টিমেন্টাল হলে, ঝোঁকের মাথায় যন্ত্রের মতো বিচার করলে, ফলটা মারাত্মক হয়। আসল কথাটাই গুলিয়ে যায়। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। একটা মানুষেরই কীর্তি—একদল মানুষের। এই দলের সঙ্গে বাকি মানুষের একটানা বিবাদ। পৃথিবীতে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ বিক্ষোভ বিদ্রোহ সব কিছুর গোড়ায় ওই সংঘাত। সোভিয়েটে চীনে বিপ্লব ঘটেছে এই কারণে—পৃথিবীর বঞ্চিত মানুষেরা ক্রমে ক্রমে জয়ী হচ্ছে। এ সব মোটামুটি তুমিও জানো আমিও জানি। এখন কথাটা হল এই। তুমি আমি চাইলেই মানুষের সব অধিকার পেয়ে যাব না। আমাদের ক্ষোভ আছে, দাবি আছে, লড়াই চলছে নানাভাবে—

এ একটা প্রক্রিয়া। ক্ষোভ আছে—কিন্তু বাস্তবকে ভুলে শুধু ক্ষোভটা ফেনিয়ে পাগল হলে তো চলবে না আমাদের। আমাদের বাঁচতেও হবে—যতই বঞ্চিত হই আর অপমান সই, জীবনটা আমাদেব ফেলনা নয়। এটুকু বুঝে, লড়াই চলছে জেনে, ধৈর্য আমাদের ধরতেই হবে, বাস্তবকে মানতেই হবে। তা না হলে, হতাশা আসবে, বৈরাগ্য জাগবে, মন বিগড়ে যাবে, জ্বালাটা অসহ্য হয়ে খুন করার কিংবা আত্মহত্যার ঝোঁক আসবে।

আমার কী হয়েছে ?

তোমার মন বিগড়ে গেছে, জীবনে বিতৃষ্ণা এসেছে। চব্বিশ ঘণ্টা তুমি শুধু ভাবছ স্ত্রী হওয়ার জন্য তোমার জীবনে কত অপমান পরাধীনতা অসম্পূর্ণতা। জ্বালাটা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে তুমি একটা অবাস্তব অসম্ভব জীবন চাইছ—এ জীবনটা ভালো লাগছে না। জীবনটা মায়া, জগৎটা মায়া, সব কিছু বাজে, ক্রমাগত এ সব ভাবতে ভাবতে যেমন বৈরাগ্যের বিকার আসে, চোখ বুজে একটা আধ্যাত্মিক জগতে বাস করতে সাধ হয়—তোমারও তাই হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে আড়ি করলে এই বিপদ হয়। আমি যে চাকরি করতাম—কতগুলি অন্যায় অবিচাব অপমান মেনে নিয়েই করতাম। আজ ব্যাবসা করি বলেই কি আমি স্বাধীন হয়ে গেছি ? আরও দশজনের মতো মানুষ হিসাবে অনেক অপমান সইতে হয়। আমার কি জ্বালা ছিল না, এখন জ্বালা বোধ করি না ? কিন্তু অনেক অন্যায় অবিচার সংকীর্ণতা ব্যর্থতা আছে বলে নিজের জীবনটা খারিজ করিনি। প্রতিকার চেয়ে লড়াই করব, বাস্তবকে বদলে দেব—কিন্তু প্রাণের জ্বালায় বেঁচে থাকার ওপরেই বিতৃষ্ণা আনব কেন ? তাহলে তো সব ফুরিয়ে যাবে। নিজের জীবনকে ভালো না বাসলে কীসের জন্য আমি লড়াই করব ? আমার লড়াই তা হলে একটা ফাঁকা আদর্শের জন্য লড়াই দাঁড়িয়ে যাবে !

যিনি সব কিছু ছেড়ে সারা জীবন শুধু লড়াই করছেন, শুধু আন্দোলন নিয়ে আছেন, তাঁর কি ফাঁকা আদর্শের লড়াই ?

নিশ্চয় না। তিনিও নিজের জীবনকে ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁর ধাতটা বিশেষ রকমের বলে সৈনিকের জীবনটাই তার ভালো লাগে। নিজেব জীবনটা যদি কেউ তুচ্ছ ভাবে, জীবনটা বিস্বাদ লাগে—দশজনের জন্য সে লড়াই করতে যায় না, বনে গিয়ে তপস্যা কবে।

সাধনা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

আমি যে সভা-সমিতিতে যাব, কিছু কিছু আন্দোলনে যোগ দেব ভাবছি—

তুমি মুক্তি চাইছ, একটু বৈচিত্র্য আর উত্তেজনা চাইছ। নইলে আমি মানুষ ভাবি না বলে তোমার প্রাণে এত জ্বালা, জীবনে ঘেন্না ধরে গেল—তুমি একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে না লড়ায়ে ? কিন্তু তোমার গোড়া আলগা হয়ে গেছে—তুমি জোর পাবে কোথায় ? তুমি সাধারণ মানুষ, ক্রমে ক্রমে তুমি তৈরি হবে—বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তোমার লড়ায়ের ঝোঁক আসেনি, এসেছে বৈরাগ্য। তোমার সাধারণ স্বামীটা প্রাণপাত করছে তোমায় সুখী করার জন্য, সাধারণ একঘেয়ে জীবনটা কোথায় তুমি—

সাধনা আচমকা জিজ্ঞাসা করে, তুমি মদ খাচ্ছ কেন ?

রাখাল বলে, তোমার জন্য। তবে তুমি যেভাবে ভাবছ, সেভাবে তোমার জন্য নয়। তুমি সত্যি দায়ি নও। আমি সন্ন্যাসীও নই, আদর্শ নিয়ে আমার দিন কাটে না, জীবনটা আমি ভোগ করতে চাই। কিন্তু এ জীবনটার ওপরেই তোমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। প্রাণ দিয়ে এত চেষ্টা করলাম—সব গেল ভেস্তে। মনের দুঃখে অবশ্য মদ খাচ্ছি না—ক-দিন থেকে ভাবছি একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব। কিন্তু মনস্থির করতে পারছিলাম না। এ ভাবে চলে না, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—তবু মনটা ঠিক করতে পারছিলাম না। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। রাজীবের সঙ্গে একদিন খানিকটা গিলে দেখলাম—প্রাণটা ঠান্ডা করা যায়। রাত্রে তোমার কথা ভুলে গিয়ে ঘুমানো যায়।

কিন্তু মদ খেলে শুনেছি—

না, নেশা চড়লে ও সব ঝিমিয়ে যায়। বেশি খেলে বউকে মারধোর করার ঝোঁক আসে। অন্যের কাছে তোমায় গালাগালি করেই আমার সাধ মিটে যেত। ঘুম পেলে বাড়ি আসতাম।

মন ঠিক করেছ ?

করেছি।

আমায় তাড়িয়ে দেবে ?

তাড়িয়ে দেব কেন ? আমরা ভিন্ন থাকব।

ও ! ত্যাগ করবে ! মনস্থির করেছ, আর খাবে না তো ?

আবার কেন খাবো ?

এত কথার পরেও সভায় যাওয়ার সময় হলে সাধনা বলে, চলো না দুজনেই যাই ? যে ক-দিন একসাথে আছি ঝগড়া করে লাভ কী ? সভায় তোমার আমার মত মিলবে।

রাখাল থতোমতো খেয়ে বলে, চলো।

পাওনাদারের তাগিদে বাড়িতে টেঁকা দায়।

সঞ্জীবের পাওনাদার।

দোকানে দোকানে দেনা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে দেনা, বাড়িওলার কাছে দেনা। চক্ষুলজ্জার বালাই এখনও শেষ হয়ে যায়নি সঞ্জীবের, সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। শেষরাত্রে উঠে রান্না করে, ভোর ভোর খেয়ে সঞ্জীব বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফেরে অনেক রাত্রে।

পাওনাদার তাগিদ দিতে এলে সে প্রথমে আশাকে বলেছিল, বলে দাও বাড়ি নেই।

আমি বলতে পারব না।

তারপর সঞ্জীব সকাল থেকে মাঝরাত্রি পর্যন্ত বাইরে কাটাবার ব্যবস্থা করেছে।

বাড়িভাড়া নিয়ে মুশকিলে পড়েছে রাখাল। নিজে বাড়িওলা না হয়েও সে দাঁড়িয়ে গেছে সঞ্জীবের পাওনাদারে। বাড়িটা সে ভাড়া নিয়েছিল নিজের নামে, সঞ্জীবকে ঘর ভাড়া দিয়েছে সে। বাড়িওলা মাসে মাসে সমস্ত অংশের ভাড়া তার কাছে আদায় করে নেয়, সঞ্জীবের টাকাটা সে পায় না।

তিন মাসের টাকা বাকি পড়েছে। চারিদিকে তার যেমন ঋণের বহর, ভাড়া পাবার আশা রাখাল রাখে না।

নতুন মাসের পয়লা তারিখে অনেক রাত্রে সঞ্জীব বাড়ি ফিরতেই রাখাল রাগারাগি করে, কড়া সুরে বলে, মাইনে পেয়েছেন, আমার টাকাটা এখুনি দিয়ে দিন।

আজ বেতন পাইনি। কাল পেলেই আপনাকে দিয়ে দেব।

পরদিন দুপুরে রাখাল বাড়ি নেই, সঞ্জীব একটা লরি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। তাড়াহুড়ো করে মালপত্র যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই গাড়িতে তুলতে আরম্ভ করে।

আশা এসে মাথা হেঁট করে দাঁড়ায়।

আমরা চল্লাম।

কী ব্যাপার ?

ব্যাপার আর কী পালিয়ে যাচ্ছি। আমায় কিছু জানায়নি, একেবারে গাড়ি নিয়ে এসেছে। বলছে পাওনাদারের জ্বালায় টেঁকা যাবে না, কিছুদিন সময় নিয়ে সামলে নিই, তারপর সকলের টাকা শোধ দিয়ে দেব।

কিন্তু আপিসে গিয়ে সবাই ধরবে না ?

আপিস কোথা—আপিস নেই। চাকরি থেকে ক-মাস আগে ছাঁটাই হয়েছে। কাল টের পেলাম।

তার শীর্ণ বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সাধনার ভিতরটা শিরশির করে ওঠে। আজকালের মধ্যে যার প্রসববেদনা জাগার সম্ভাবনা, নিঃসম্বল নিরুপায় স্বামীর সঙ্গে সে কোথায় চলেছে কে জানে !

খাওয়া পরার কষ্ট সইতে পারে না বলে চাকরি থাকতে ধার করতে শিখেছিল। চাকরি যাবার পর সেই উপায়ে কয়েক মাস চালিয়েছে। পালিয়ে গিয়ে সে নয় পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচবে—কিন্তু এবার আশাকে সে বাঁচাবে কী করে, নিজে বাঁচবে কী দিয়ে ? ঋণ করার অফুরন্ত উৎস তো মানুষের থাকে না !

আমার কাছে থেকে যাও। আমি যেভাবে পারি—

শীর্ণ বিবর্ণ মুখে অদ্ভুত এক হাসি ফোটে আশার।

সে তো বাপের বাড়ি গিয়েও থাকতে পারি। না ভাই, মরতে হয় ওর কাছে থেকেই মরব, ভাড়ার টাকাটা বাকি রয়ে গেল—

হাসিটুকু মিলিয়ে যায় আশার।

জীবনে আর কারও সঙ্গে ভাব করব না। আমার কী মনে হচ্ছে জানো ? তোমার সঙ্গে ভাব করে তোমাদের ঠকিয়ে পালাচ্ছি, ঠকাবার জন্যই যেন ভাব করেছিলাম।

তোমার কী দোষ ?

দোষ বইকী। অনেক আগেই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল। আমি কি ওর সঙ্গে পালাতাম ভেবেছ ? কী করব, দায়ে ঠেকেছি। অনেক পাপ করে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি।

বাড়ি ফিরে সব শুনে রাখাল রেগে টং হয়ে বলে, আমার এতগুলি টাকা মেরে দিলে !

একলা তোমার নয়। অনেকের মেরেছে।

এ সব মানুষকে ধরে চাবকানো উচিত !

বাসন্তী বলে, আহা বেচারা। কী করবে ? যা দিনকাল। ভদ্রঘরের ছেলে, নরম ধাত নিয়ে গড়ে উঠেছে। ঠেলায় পড়লে কী সামলাতে পারে ? জিনিসপত্রের দামে যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের পুড়িয়ে মারা উচিত ! মাইনেতে কুলিয়ে গেলে কি বেচারা ধার শুরু করত, এভাবে ডুবত ?

রাখাল সঞ্জীবকেই চাবকাতে চেয়েছিল। বাসন্তী তাকে দোষী করতে রাজি নয় !

সাধনা বলে, ধারের জন্য কিন্তু চাকরিটা যায়নি। আপিসের কর্তার সঙ্গে তর্ক করেছিল।

বাসন্তী বলে, ওমা ! এত তেজও ছিল মানুষটার ? তবেই দ্যাখো, মানুষ কি আর ছাঁচে গড়া হয় ! একটা মানুষের মধ্যে কতরকমের ধাত মেশাল থাকে। এদিকে বেহায়ার মতো ধার করে, অন্যদিকে তেজ দেখাতে গিয়ে চাকরি খোয়ায় !

আনমনে কী যেন বলে বাসন্তী।

সাধনা বলে, খালি খালি লাগছে বাড়িটা।

বাসন্তী বলে, আমি আসব। বাড়িতে হাট বসিয়েছে, বাড়ি খুঁজতে বলে দিয়েছি—আর খুঁজতে হবে না। ভাড়াও কম লাগবে।

ওই একখানা ঘরে হবে ? মালপত্র আঁটবে তোর ?

আঁটালেই আঁটবে। গাদাগাদি ঘেঁষাঘেঁষি হবে।

ক-দিনের অসুখে শোভার দাদার বউ মারা যায়। বাঁচানো যেত, তবু মারা যায়।

চোখে জল আর মুখে রেহাই পাবার নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে শোভা এসে ধরা গলায় বলে, বউদিই শেষে আমায় বাঁচিয়ে দিলে গেল।

শোভা চোখ মোছে। আবার চোখে জল আসে। হাসবে বলে কাঁদে।

এবার একটা লোক রাখতেই হবে—তার বদলে আমি খাটব। এবার জোর গলায় বলতে পারব, বিয়ে ভেঙে দাও।

সাধনা চুপ করে থাকে।

শোভা বলে, আমি কিন্তু অন্য ব্যবস্থা করেছিলাম সাধনাদি। আপনারা তো কাজ-টাজ জুটিয়ে দিলেন না, আমি নিজেই জুটিয়েছিলাম।

কী কাজ ?

রাঁধুনির কাজ। আর কী কাজ জোটাব বলুন। আর কী শিখেছি রান্নাকরা বাসন মাজা ছাড়া ? ও বাবা, রাঁধুনির কাজ জোটানোও কী কঠিন ব্যাপার ! কেউ আমাকে রাখতে চায় না ! বিনয়বাবুর রাঁধুনি পালিয়েছে, আমি গিয়ে ধরে পড়লাম আমাকে রাখতেই হবে। বিনয়বাবু সুহাসিনীদি দুজনে কিছুতেই রাজি হল না। আমি যত জোর কবি, ওরা তত বলে, না বাবা, তোমায় রাখলে তোমার বাপদাদা গোলমাল করবে। প্রভাতবাবুর বামুনটা দেশে যাবে শুনে আমি গিয়ে ধরে পড়লাম, ওরাও কিছুতে রাজি হয় না। আমার বাপ-দাদা হাঙ্গামা করবে ! ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে জন্মানো কী ঝকমারি ভাবুন তো ? শেষকালে প্রভাতবাবুর বন্ধু বামাচরণবাবু বললেন, পাড়ায় এত কাছে রাঁধুনির কাজ নেওয়া তো উচিত নয়, বাপ-ভায়ের একটা সম্মান আছে তো ? দূরে এক বাড়িতে আমায় কাজ জুটিয়ে দেবেন। ভদ্রলোক আবার একটা কবিতার বই লিখেছেন।

সাধনা গম্ভীর হয়ে বলে, বউদি মরে গিয়ে সত্যি তোমায় বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। বুড়োর হাত থেকে শুধু নয়, আরেকটা সর্বনাশের হাত থেকে। বামাচরণ তোমায় রাঁধুনির কাজ দিত বিশ্বাস করলে তুমি ?

শোভাও গম্ভীর হয়ে বলে, না দিলে না দিত। যে কাজ দিত তাই করতাম !

তবু বাড়িতে বলতে না বিয়েতে তোমার মত নেই ?

আপনি বুঝছেন না। কোন মুখে বলতাম ? ওরা আমাকে খেতে পরতে দিতে পারবে না, স্পষ্ট কথা। ঝি রাঁধুনি হিসাবেও পুষতে পারবে না—ঠিকে ঝি শুধু বাসন মাজত, তাকেও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ে ঠিক হবার পর বাড়িতে আমায় কোনো কাজ করতে দিত না। রাঁধতে গেলে বাসন মাজতে গেলে বউদি বলত, থাক থাক, দুদিন বাদে আমাকেই তো সব করতে হবে। মাও সায় দিত বউদির কথায়। এবার উপায় নেই, লোক রাখতেই হবে। বউদি মারা যাবার ঠিক দুদিন পরে দাদা সুর পালটে মাকে বলেছে, বড্ড বুড়ো, শোভাকে ওর হাতে দিতে আমায় মন সরছে না ! ছেলেমেয়ে রাখছি রাঁধছি বাড়ছি—আমাকে ছাড়া তো এখন চলবে না। নিজেরাই এবার বিয়ে ভেঙে দেবে, আমার কিছু বলারও দরকার হবে না।

শোভা একটু হেসে খোঁচা দিয়ে বলে, আপনি বুঝবেন না সাধনাদি। রাখালবাবু বেশ রোজগার করছেন, স্বামীর আদরে একটি বাচ্চা নিয়ে সুখে আছেন—আমাদের ভদ্রঘরের ভেতরের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে আপনি ধারণাও করতে পারবেন না।

কথা হচ্ছিল রান্নাঘরে। রাখাল দাড়ি কামিয়ে তেল মাখতে এসে রান্নাঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা শুনছিল।

এবার দরকার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সে বলে, তুমিও কিন্তু ভদ্রঘরের ভেতরের অবস্থাটা ঠিক জানো না শোভা। তুমি শুধু তোমাদের একটা ঘর দেখেছ। স্বামী বেশ রোজগার করে আনলেও ভদ্রঘরে সুখশান্তি থাকছে না !

আগে হলে সাধনা চটে যেত। রাখালের আসল জ্বালাটা টের পেয়েছে বলে আজ সে একটু বিরক্তও হয় না।

শোভা চটপট জবাব দেয়, কী করে থাকবে ? দশটা ভদ্রলোকের ঘরে সুখশান্তি থাকবে না—একটা ঘরে শুধু খানিকটা রোজগার হচ্ছে বলে কখনও তা থাকে ?

রাখাল একটু ভড়কে যায়।

সরষের তেলের শিশিরটার দিকে চেয়ে দেখতে পায়, শুধু তার গায়ে মাখার মতোই একটু তেল অবশিষ্ট আছে। সে পাঁচ ছটাক করে তেল আনে—একবারে বেশি তেল আনলে সাধনা নাকি বেশি তেল খরচ করে !

তার বেশ রোজগারের এটাই তো বেশ একটা নমুনা !

কিন্তু হার রাখাল মানবে না কিছুতেই। অন্তত তর্কে তাব জেতা চাই, কথায় জেতা চাই।

সে বলে, কিন্তু শোভা, তোমার দাদা তো আবার বিয়ে করবে। বাড়ির চাকরি তখন তো থাকবে না তোমার ?

দাদা আবার বিয়ে করবে ? আগে চাকরে লোক বউ মরতে মরতে আবার বিয়ে করত। সেদিন আছে আজকে ? বউদির জন্য কাঁদতে কাঁদতে দাদা এ কথাও ভাবছে না যে বাঁচা গেছে, একটা বোঝা কমেছে, রেহাই পেয়েছি ? আবার একটা বউ এনে বোঝা বাড়াবে দাদা ? আপনারা শুধু আগের দিনের হিসেব কষছেন, ব্যাপার কিছু বুঝছেন না।

সাধনা ও রাখাল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

আগের দিনের হিসাবের জের টানছে তারা !

শুধুই কি পরের বেলা ? নিজেদের বেলা নয় ?

রাখাল তবু গোঁয়ারের মতো গায়ের জোরে মুখে হাসি ফুটিয়ে হালকা তামাশার সুরে বলে, আমায বিযে করবে শোভা ?

শোভা বলে, এক্ষুনি। সাধনাদির সতিন হব, সে তো আমার ভাগ্যি !

প্রভাতের কারখানা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। কবে কারখানায় কাজ শুরু হবে, কবে দুর্গা বিষ্ণুরা ফিরে আসবে, তারই প্রতীক্ষায অধীর হয়ে থাকে বলে মনে হয় খুবই যেন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে শেডটা।

বাসন্তী আসবে বলেও এ বাড়িতে উঠে আসেনি। বলেছে, থাকগে ভাই। এইটুকু ঘরে ওঁর অসুবিধা হবে সত্যি।

আসলে মায়া কাটাবার মানুষ তো নয় বাসন্তী ! উড়ে এসে যারা তার ঘরবাড়ি দখল করেছে, ভাড়াটে হয়ে তারাই তাকে বেঁধেছে নতুন মায়ায়। একপাল ছেলেমেযে সমেত চরণদাসের পরিবারটি বাড়িতে ভিড় করায় তার দম আটকে এলেও ইতিমধ্যেই তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বাসন্তীর।

তাড়াতাড়ি উঠে গেলে অন্যকথা ছিল। একবাড়িতে মানুষ বাস করলে তাদের বেশিদিন এড়িয়ে চলা একপাল ছেলেমেয়ে হইচই করে বলে খারাপ লাগা কি আর বাসন্তীর পক্ষে সম্ভব !

নিরীহ গোবেচারি রাধাকে হাসিমুখে চব্বিশ ঘণ্টা সংসার নিয়ে বিব্রত হয়ে থাকতে দেখে বেশ একটু গরম গরম মমতা বোধ করে বাসন্তী, নীচের তলায় গিয়ে তার সংসার করা দেখতে দেখতে তাকে মায়া করতে তার ক্রমেই যেন বেশি বেশি ভালো লাগে !

তার মেয়েটাকে প্রায় বেদখল করে ফেলেছে রাধার বড়ো তিনটি ছেলেমেয়ে। তাদের বাচ্চা ভাইটি বড়ো রোগা, খেলাধুলা করে না, হাসে না, আদর সইতে পারে না। বাসন্তীর নাদুস-নুদুস মেয়েটাকে ওরা তাই কাড়াকাড়ি করে কোলে নেয়, আদর করে, খেলা দেয়।

আর রাধার রোগা বাচ্চাটার বড়ো বড়ো চোখের করুণ চাউনি দেখে এমন মায়া হয় বাসন্তীর যে দিনে দশবার তাকে কোলে না নিয়ে সে পারে না !

কাজেই বাড়ি বদলের কথাটা এখনও মুখে বললেও কাজে আর সেটা হয়ে ওঠে না।

রাখাল বলে, ওর বাপের বাড়িতে নিশ্চয় অনেক লোক ?

সাধনা বলে, মস্ত সংসার।

বিয়ের পর শুধু একলাটি থাকা অভ্যাস। ভাড়াটের ভিড় আসতে প্রথমটা একটু খারাপ লেগেছিল, এখন আবার ভালো লাগছে।

তুমি দেখছি মনস্তত্ত্বে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠেছ !

রাখাল চেষ্টা করে একটু হাসে।

সাধনাও হাসে।

সিদ্ধান্ত তাদের বজায় আছে। রাখাল মন ঠিক করে ফেলেছে যে আব নয় এবার তারা ভিন্ন বাস করবে। সাধনাও সেটা মেনে নিয়েছে শান্তভাবেই।

সে জন্য দুজনেই তারা পরস্পরকে কী দিলাম আর কী পেলাম তার হিসাব, বিরোধ আর তিক্ততার হিসাব এ সব নিয়ে মাথা ঘামানো স্থগিত রেখেছে।

যে ক-দিন একসাথে আছে ঝগড়া করে লাভ কী ?

সব চাওয়া-পাওয়া কলহ-বিবাদের চরম মীমাংসা তো হয়েই গেছে, আর মিছে কেন কামড়াকামড়ি করা ?

স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকলেও তারা যেন আর স্বামী-স্ত্রী নেই। দুটি বন্ধু কিছুদিন একসাথে বাস করছে, যথাসময়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে দূরে চলে যাবে। প্রত্যাশা নেই, রোমাঞ্চ নেই, উন্মাদনা নেই, ভাবেব আকাশের ঝড় থেমে গেছে।

নতুন ভাড়াটে এসেছে আশাদের ঘরে।

চেনা ভাড়াটে। সুমতি আর তার স্বামী অশোক।

সুমতির বিয়ে হল হঠাৎ। বিয়েটা অবশ্য তাদের স্থির হয়েছিল অনেককাল আগে থেকেই।

অশোক মেসে থেকে চাকরি খুঁজছিল বহুদিন, একটা চাকরি পেয়ে যাওয়ায় সুমতিকে বিয়ে করেছে।

তার আপনজনেরা থাকে পশ্চিমে। বিযে উপলক্ষে তারা এসে আবার ফিরে গেছে। সুমতিকে নিয়ে অশোক নীড় বেঁধেছে আশাদের ঘরে।

গড়া নীড় ভেঙে পড়ায় এ ঘর থেকে পালিয়ে গেছে সঞ্জীব আর আশা, নতুন চাকরি নিয়ে সুমতি আর অশোক এসে উঠেছে সেই ঘরে।

সুমতি বলে, আমিও একটা চাকরি পেয়ে গেলাম, নইলে কী আর একজনের সামান্য মাইনের ভরসায় আমরা বিয়ে করতাম ? দুবছর অপেক্ষা করে আছি, আরও দু-একবছর অপেক্ষা করতাম।

বলে, এখনও কীরকম সব পচা ব্যবস্থা চালু আছে দেখুন। চাকরি পেলাম বলেই কি বিয়ে করলাম ? বিয়ে করলাম বলেই আবার চাকরিটা পেলাম ! ম্যারেড মেয়ে চাই—বিয়ে না হলে চাকরিটা পেতাম না ! সামান্য বেতন, একজনেরই ভালো চলবে না, সে জন্য আবার ম্যারেড হওয়া চাই !

নব-দম্পতি। ভালোবাসার বিয়ে—দুবছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পর !

সাধনা ভেবেছিল, কত কাণ্ডই না জানি করবে দুজনে। ভালোবাসার কত বিচিত্র লীলাখেলা দিয়ে রোমাঞ্চকর করে তুলবে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মিলনকে !

রাখালকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাবার দিনটির প্রতীক্ষা করতে করতে তার কী সহ্য হবে চোখের সামনে ওদের উদ্দাম উচ্ছল ভালোবাসা, সরস মধুর মিলন, পৃথিবীতে স্বপ্নজগৎ রচনা করা ?

দুজনের কাণ্ড দেখে সে থ বনে যায়। সে যেমন ভেবেছিল সে রকম কিছুই দুজনকে করতে না দেখে !

হাতে যেন স্বর্গ তারা পায়নি, সুখে আনন্দে অন্তত কিছুদিনের জন্য দিশেহারা হবার মতো কিছুই যেন ঘটেনি !

মিলনটা যেন তাদের একটা সাধারণ ঘটনা।

দুজনের আনন্দ টের পাওয়া যায় ! সুমতির মুখে কেমন একটু রুক্ষতার ছাপ ছিল, সেটা উপে গিয়ে নতুন লাবণ্যের সঞ্চারটা স্পষ্টই চোখে পড়ে।

দুজনে সুখী হয়েছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু দুজনের হাসি গল্প মেলামেশা ঘরকন্না সবই যেন শান্ত আর সংযত। হৃদয়োচ্ছ্বাসের উদ্দামতা নেই।

একদিন রাত্রে ওরা দুয়ার বন্ধ করলে সাধনা চেষ্টা করেও নিজেকে ঠেকাতে পারে না, খানিকক্ষণ চুপিচুপি দুয়ারের ফুটোয় চোখ পেতে উঁকি দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে মনে হয়, সে যেন নতুন রকম ম্যাজিক দেখে এল।

বিয়ের এতকাল পরে সংঘাতে সংঘাতে সম্পর্ক এক রকম ছিঁড়ে যাবার পর, ভিন্ন হয়ে শান্তিতে থাকা ঠিক করার পর, তার আর রাখালের সম্পর্ক যেমন দাঁড়িয়েছে, রুদ্ধঘরের গোপনতায় ওই নবাববাহিত মানুষ দুটির সম্পর্কও প্রায় সেই রকম—উচ্ছ্বাস নেই, গদগদ ভাব নেই।

তফাত শুধু এই যে তাদেব ঝিমানো নিস্তেজ ভাবের বদলে ওরা অনেক বেশি সতেজ, হাসিখুশি।

রাখালকে কয়েকদিন খুব চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

বাসন্তীর কাছেই কারণটা জানতে পারায় সাধনা তাকে আর কোনো প্রশ্ন করেনি।

কোথা থেকে সংগ্রহ করে রাখাল নাকি আরও দশ হাজার টাকা ব্যাবসায়ে লাগাবে।

তাদের দুজনের বর্তমান দোকানে নয়, নতুন একটা ব্যাবসায়ে।

দশ হাজার টাকা দিয়ে নতুন ব্যাবসা শুরু করবে রাখাল, কোথায় টাকা পাবে, কীসের ব্যাবসা করবে কোনও কথাই সে সাধনাকে জানায়নি !

আগে হলে সাধনা খেপে যেত, এখন নিশ্বাস ফেলে সে শুধু ভাবে, না জানাবারই কথা ! তার সঙ্গে আর সম্পর্ক কী ?

নাঃ, আর দেরি করা নয়। এবার সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে দাদার কাছে চলে যাবে।

কিন্তু পরদিন রাখাল নিজে থেকেই তাকে সব জানায়। বলে, ক-দিন ধরে কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলাম। তোমার কী মনে হয় বলো তো ?

সতীশের অসুখটা চাপা পড়েছে কিন্তু দেহের অনেককালের অনেকগুলি চাপা রোগ তাকে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে। আরও কিছুকাল বাঁচবে, কিন্তু বিছানাতেই কাটবে তার বেশির ভাগ সময়।

বিশুর মা অত্যন্ত উতলা হয়ে পড়েছে। কিছু আয়ের ব্যবস্থা না হলে এভাবে আর কতদিন চলবে ? পুঁজি কমছে—কিছুকাল পরে পুঁজি খাটিয়ে আয়ের ব্যবস্থা করার উপায়টাও হাতের বাইরে চলে যাবে।

একটা ব্যবস্থা রাখালকে করে দিতেই হবে এবার। ছেলের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে রাখাল তার। রাখাল নিজে কী অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় সামলে উঠেছে বিশুর মা তা জানে, রাখাল তার জন্য একটা উপায় করে দিক।

গয়না বেচে হাজার দশেক টাকা দেবেন। আমি ভাবছি দায়িত্বটা নেওয়া যাক। নতুন ব্যাবসায়ে খাটানো যাক টাকাটা। আমিও ওর কাছে ঋণী—

ঋণী—?

তোমার কাছে একটা কথা গোপন করেছিলাম। রাজীবের সঙ্গে দোকান করার টাকাটা বিশুর মার কাছেই পেয়েছিলাম।

ও !

সে উপকার ভোলা যায় না। প্রাণ দিয়ে খেটে নতুন ব্যাবসাটা দাঁড় করাতে পারি—আমার খাটুনির দামে ওই ঋণটাও শোধ হবে, পরে লাভের অংশও পাব।

কী ব্যাবসা করবে ?

ভাবছি, যে সব ব্যাবসার কিছুই জানি না তার কোনও একটার মধ্যে না গিয়ে এতদিন যে কারবারের খুঁটিনাটি জানলাম বুঝলাম সেটাই করব। দোকান আছে থাক, ওই সঙ্গে বিড়ি বানাবার ছোটো একটা ফ্যাক্টরি করব। শুধু ব্যাবসা নয়, এর আর একটা দিকও আছে। কতগুলি লোককে খেটে খাবার সুযোগ দিতে পারব।

না চললে, টাকাটা নষ্ট হলে, তোমার দায়িত্ব কী ?

এমনি কোনো দায়িত্বই থাকবে না। ইচ্ছা করলে টাকাটা আমি মেরেও দিতে পারব। আমাকে এতটা বিশ্বাস করছেন, এ সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার !

আশ্চর্য ব্যাপার আবার কী ? মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করবে না সংসারে, চেনাজানা মানুষকে ? এতদিন দেখছেন তোমায়, বুঝতে পেরেছেন বিশ্বাস করতে হলে তোমাকেই করা যায়। ওর বোন তো তোমাকে প্রায় দেবতার মতো ভক্তি করে।

শান্তভাবে সহজভাবে তারা কথা বলে।

কে বলতে পারে, ছোটোখাটো বিড়ি ফ্যাক্টরি থেকেই হয়তো বিশুর মা আর আমাদের কপাল ফিরে যাবে। হাজার বিড়িতে কিছু বেশি মজুরিও হয়তো দিতে পারব।

এ কথাটাও এমনভাবে বলে রাখাল যে বেশ বোঝা যায় আশা ও আবেগ উদ্দীপনা জাগিয়ে সাধনার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা সে সত্যিই ত্যাগ করেছে, সাধনাকে বিশ্বাস করানোয় প্রয়োজন যেন তার সত্যই ফুরিয়ে গেছে।

ইচ্ছা করলে সাধনা সোজাসুজি প্রতিবাদও করতে পারে। বলতে পারে, ছাই পারবে, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। ওভাবে কোনো কথা না বললেও সাধনা তাকে সাবধান করে দেয়, বলে, রাজীববাবুর পরামর্শ নিয়ো। উনি এ লাইনে অনেককাল আছেন !

নিজে উদ্যোগী হয়ে তাড়াতাড়ি দাদার কাছে যাবার ব্যবস্থা করার কথাটা এরপর সাধনা ভুলে যায় !

প্রভাতের কারখানার শেডটা উঠছিল ধীরে ধীরে, হঠাৎ একদিন খুব তাড়াতাড়ি কাজ এগোচ্ছে দেখা যায়।

চশমা-পরা প্রৌঢ় বয়সি মোটাসোটা অচেনা এক ভদ্রলোককে মোটরে চেপে প্রতিদিন কাজ পরিদর্শন করতে আসতে দেখা যায়।

বিড়ির কারখানা আরম্ভ করা নিয়ে রাখাল খুব ব্যস্ত ছিল, তবু পরদিন সে ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। তার মোটর এলে কথা বলতে যায়।

ফিরে আসে ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখে।

বলে, প্রভাত সত্যিই আমাদের ভাঁওতা দিয়েছে।

কী ব্যাপার ?

কারখানা করবার কোনো মতলব প্রভাতের ছিল না। সব এই ভদ্রলোককে বেচে দিয়েছে। ওদের উঠিয়ে না দিলে জমি বিক্রি হয় না, তাই ও সব ভাঁওতা দিয়েছিল। ফ্যাক্টরি করবে, সকলকে কাজ দেবে, থাকবার ঘর করে দেবে—সব বাজে কথা। বামাচরণ মাঝখানে ছিল, দুজনের কাছে কমিশন বাগিয়েছে।

রাগটা প্রভাতের উপর, কিন্তু সে তো আর সামনে নেই, সাধনার দিকে এমনভাবে চোখ পাকিয়ে চেয়ে থাকে যে মনে হয় এখুনি সাধনাকেই মেরে বসবে !

তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, তোমার কথাই ফলল। আমায় বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিল !

সাধনা শান্তভাবে বলে, তোমার একার দোষ নয়, আরও অনেকে তো ছিল। এঁকে সব কথা বললে না ?

বললাম বইকী ! ইনি বললেন, প্রভাত কী বলেছে না বলেছে তার দায়িত্ব ইনি নেবেন কেন ? কারখানায় আনাড়ি লোক দিয়ে কী করবেন ? তবে ছুটকো কাজের জন্য দরকার হলে দু-একজনকে নিতে পারেন—সে তখন দেখা যাবে !

সাধনা ফোঁস করে ওঠে !

ইস্, বললেই হল দেখা যাবে ! প্রভাতবাবু নিজের হাতে লিখে দিয়েছে, জমি যে কিনবে ওই চুক্তিটাও তাকে মানতেই হবে। অত আইন বাঁচিয়ে বজ্জাতি করা চলবে না। এতগুলি লোকের কাছে কথা দিয়েছে সেটা ঢের বড়ো আইন।

সাধনা সত্যি রেগেছে। এতকাল রাগ দেখাত শুধু তারই উপর, তাই বুঝি রাখালের চোখে পড়ত না তার রাগের ভঙ্গিটা কত সুন্দর। এক অন্যায় কারসাজির বিরুদ্ধে তাকে রাগতে দেখে রাখাল আজ মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

সে হেরে গিয়েছে। প্রভাত বজ্জাতি করবে কী করবে না এই নিয়ে কী তীব্র মন কষাকষি হয়ে গেছে তাদের—। প্রকাশ্য সভায় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কলোনির লোকেদের পক্ষ নেওয়ায় সাধনাকে সে প্রায় শত্রু মনে করে বসেছিল।

সাধনার কথাই ফলেছে শেষ পর্যন্ত কিন্তু সাধনার কাছে হেরে গিয়ে এতটুকু জ্বালা তো রাখাল বোধ করছে না ! বরং কীভাবে যেন জুড়িয়ে গেছে সাধনার উপর রাগ আর অভিমানের জের।

অন্যায়টা বড়ো হয়ে ওঠায় তাদের দুজনেরই এবার অন্যায়টার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে জেনে তারা যেন সরে এসেছে কাছাকাছি, তুচ্ছ হয়ে গেছে তাদের সংঘাত।

সাধনা বলে, কালকেই একটা মিটিং ডাকতে হবে। এ ভদ্রলোককে জানিয়ে দিতে হবে জমি আর কারখানা কেনার সঙ্গে উনি প্রভাতবাবুর চুক্তিটাও কিনেছেন।

রাখাল বলে, নিশ্চয়। কলোনির ওদের সঙ্গে আগে কথা বলা দরকার।

ঠিক বলেছ। ওরা প্রত্যাশা করে আছে, ব্যাপারটা ওদের জানাতে হবে। চলো না তুমি আমি এখুনি যাই ? আলু কুমড়োর তরকারি আর ডাল হয়েছে, এসে তোমায় বেগুন ভেজে দেব।

তাই চলো।

সাধনা শুধু একনজর তাকায় পরনের কাপড়টার দিকে, বদলায় না। শুধু চুলটা একবার আঁচড়ে নিয়ে স্যান্ডেলে পা গলায়।

বলে, পয়সা নিয়ো, মাখন আনতে হবে। এমনি মাখন খাবে, পাতে খাবার সময় একটু একটু গলিয়ে ঘি করে দেবখন।—এ আবার কী ? একেবারে চমকে গেছি।

অনেকদিন এভাবে রাখাল আচমকা তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেনি, সাধনার তাই সত্যই চমক লেগে খানিকক্ষণ বুকটা ধড়াস ধড়াস করে !

পথে নেমে চলতে চলতে রাখাল বলে, সেদিন তোমায় অনেক কথা শুনিয়েছিলাম। আমার হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল।

আমিও তাই ভাবছিলাম। ঠিক ধরতে পারিনি, কিন্তু একটু খাপছাড়া মনে হচ্ছিল কথাগুলি। ঠিক কথাই যেন বলছ কিন্তু কোনো একটা হিসাবে যেন গোলমাল হচ্ছে।

আসল হিসাবেই গোল হয়েছিল। আমি যে বলেছিলাম স্বামীর স্বার্থ সম্পর্কে তুমি উদাসীন হয়ে গেছ, সাধারণ স্ত্রীর জীবনে তোমার বিতৃষ্ণা এসেছে—ওটা ভুল বলেছিলাম।

জীবনে আমার বিতৃষ্ণা আসেনি মোটেই ! তবে তোমার সম্পর্কে মনটা বিগড়ে গেছে কিনা ঠিক জানি না। মিথ্যে বলব কেন, আগের মতো ভাবতে পারি না তোমাকে। তুমি আদর করবে আর আমি আহ্লাদি খুকির মতো গলে যাব ভাবলেও গা ঘিনঘিন করে।

আমারও করবে। আসলে আমিই মনে মনে চাইতাম আমরা আবার আগের মতোই হই, আগের জীবনটা ফিরে আসুক ! তুমি বিগড়ে গিয়েছ, তোমার জন্য সেটা হচ্ছে না ভেবে তোমায় দোষী করেছিলাম। দোষ হয়তো তোমার আছে খানিকটা, কিছু বাড়াবাড়ি সত্যি করেছ—কিন্তু সেটা তোমার একার দোষ নয়। আমিও বুঝতে না পেরে বাড়াবাড়ি করেছি। তোমার পক্ষে যেমন হওয়া বা দেওয়া আর সম্ভব নয়, তাই দাবি করেছি ! আসল কথা কী দাঁড়িয়েছে সেটাই হিসেব করিনি। আমাদের আগের জীবন আর ফিরে আসবে না। বাস্তব জগৎ যতটা পালটেছে আর আমরা যে অবস্থা আর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পার হয়ে এসেছি তাতে অনেক কিছু অবাস্তব অসম্ভব হয়ে গেছে—স্বামীভক্তি-টক্তি অনেক কিছু।

রাখাল একটা বিড়ি ধরায়।—অন্যরকম ভাবলেও আমি আসলে কিন্তু ভুল করে তোমার কাছে একটু স্বামীভক্তিই চাইছিলাম।

রাখাল হাসে।—তুমি ওটা দিতে পারলে আমার চৈতন্য হত নিশ্চয়, দেখতাম আমার কাছেও মিথ্যা হয়ে গেছে জিনিসটা, বিশ্রী লাগছে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনোরকম সম্পর্ক সম্ভব নয়। এটাই হবে শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ ভালোবাসার মূল কথা যে, তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। আমরা এক দেহ এক প্রাণ, আমি খেলে তোমার পেট ভরে, এ সব ফাঁকি আর চলবে না।

বাসের জন্য বড়ো রাস্তার মোড়ে সুমতি আর অশোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। দুজনে একসঙ্গেই চাকরি করতে বেরিয়েছে।

সাধনা বলে, ওদের কিছু বোলো না এখন। আপিসে লেট হয়ে যাবে। ফিরে এসে তো শুনবেই সব।

মোড়টা পেরিয়ে জোর দিয়ে রাখাল বলে, আমি রোজগার করি তুমি ঘরে বসে খাও এ জন্য কিছুটা ফাঁকি থাকবেই আমাদের সম্পর্কে—সব দিক দিয়ে তোমাকে আমার সমান মানুষ আমি কিছুতেই ভাবতে পারব না। সেটা হবে অবাস্তব স্বপ্ন দেখা—নিজেদের ফাঁকি দেওয়া। তবু মোটামুটি ওটাই হবে আমাদের নতুন সম্পর্কের ভিত্তি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এটা আমাদের ভালো লাগবে। মাসখানেক আমরা তো দিব্যি আছি।

সত্যি।

কত বিষয়ে আমাদের ভুল বোঝা রয়ে গেছে, ভিন্ন হব ভেবে মনমরা হয়ে আছি, কীরকম বিশ্রী বাধোবাধো ভাব রয়ে গেছে—তবু একটা মাস বেশ কাটল আমাদের। জঞ্জাল সাফ করে নিলে আমরা আরও ঢের বেশি সুখে দিন কাটাব—ঝগড়া করতেও আবার মজা লাগবে মাঝে মাঝে ঝাল খাওয়ার মতো।

সাধনা হাসে। বলে, খোকাকে বাসন্তীর কাছে রেখে এসেছি। কথা আমাদের সারাজীবনে ফুরোবে না, পা চালিয়ে এগিয়ে চলো।